ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান প্রকাশিত
ব্যাঙাচি
অষ্টম সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০২০। অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৭
প্রযুক্তি

ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান

বাঁচতে হলে ভাবতে হবে

ডিসেম্বর ২০২০, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৭

প্রথম বর্ষ • সংখ্যা ০৮

সম্পাদক
তানভীর রানা রাব্বি

সহ-সম্পাদক
টিম ব্যাঙাচি

ডিজাইন ও আইডিয়া
তানভীর রানা রাব্বি, সমুদ্র জিত সাহা

লেআউট
রিয়াদ

প্রচ্ছদ এঁকেছে: মেহরাব সাবিত সিদ্দিকী

প্রকাশক: নাঈম হোসেন ফারুকী, সমুদ্র জিত সাহা
তারিখ: ২/১/২১
টিম ব্যাঙাচি, ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান কর্তৃক

ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করতে লগইন করুনঃ
https://link.bcbiggan.com/group
ইমেইল: info@bangachi.com
ওয়েব: https://bangachi.com
ফেইসবুক: https://facebook.com/bcb.bangachi
ব্যাঙাচি ডাউনলোড: https://download.bangachi.com

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 'ফরচুন' ম্যাগাজিনের নির্বাচিত বিশ্বের বৃহত্তম ৫০০ কোম্পানির সিইওদের মধ্যে বিবিএ ডিগ্রিধারী সিইওদের থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং সিইও সফলভাবে কোম্পানি পরিচালনা করছে। আর সবার জন্যই সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ এখন প্রযুক্তি পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা। প্রযুক্তি খুব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এই পরিবর্তনের সঙ্গে যারা দ্রুত খাপ খাইয়ে নেবে তারাই এগিয়ে যাবে, আর যারা দেরি করবে তারা ছিটকে পড়বে।

প্রযুক্তি ব্যক্তি পর্যায়েও অনেকের জীবনে ক্ষমতায়নের সুযোগ এনে দিয়েছে। একইসঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনে নানা সমস্যার সমাধানেও প্রযুক্তির অবদান রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা ২০১৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দেওয়া ভাষণে বলেন, "প্রযুক্তির প্রচলন ছড়িয়ে পড়ার সুবাদে আজকের দিনে জন্ম নেওয়া শিশু তাদের আগের প্রজন্মের চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা ভোগ করছে।" প্রযুক্তির কল্যাণে আমাদের জীবনযাত্রার মান অনেক বেশি সহজ হয়ে গিয়েছে।

প্রযুক্তি যেমন আমাদের জীবনকে সুন্দর করে দিয়েছে অনেকাংশে তেমনই প্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান থাকাও অতীব জরুরি। প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উক্ত প্রযুক্তি সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকতে হবে। প্রযুক্তির কল্যানে ইন্টারনেট পেয়েছি আমরা। কিন্তু ইন্টারনেটের প্রতিটা বিষয় কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই জ্ঞান কম। এছাড়াও বিভিন্ন প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ যন্ত্র কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কেও আমাদের অনেকেরই ধারণা কম। কী করা যেতে পারে?

তো আমাদের এবারের ব্যাঙাচি সাজানো হয়েছে বিভিন্ন প্রযুক্তিকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে। প্রযুক্তি দুনিয়া সম্পর্কে ক্ষুদ্র জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়ে ফেলতে পারেন এবারের ব্যাঙাচি। প্রযুক্তি সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন করুন, প্রযুক্তির যথাযথ সঠিক ব্যবহার করুন। ব্যাঙাচি 'প্রযুক্তি'র সংখ্যা পাঠে আপনাদের জন্য শুভকামনা!

তানভীর রানা রাব্বি
সম্পাদক, **ব্যাঙাচি**

সংগ্রহ, নির্বাচন ও তথ্য যাচাই :

তানভীর রানা রাব্বি

রওনক শাহরিয়ার

প্রুফরিডিং-এ যাঁরা ছিলেন :

ফাইনাল চেকার:

১। আবু রায়হান

২। নাবিলা তাসনিম

৩। এ আর মুবিন

সহযোগী যোদ্ধাগণ:

১। জাহিদুর রহমান

২। আফীফাহ্ হক মীম

৩। মুশফিকুর রহমান

৪। রাশেদা নাসরিন সুমনা

৫। রিজুফা জামান শোভা

৬। নাফিউল ফেরদৌস অরণ্য

৭। রওনক শাহরিয়ার

৯। স্বপ্নীল জয়ধর

১০। নিবেদিতা রায় নিতু

১১। মুনতাসির রহমান তামিম

১২। রাজীব সূত্রধর

১৩। ফারিয়া আরেফিন মালিহা

১৪। আশরাফুল ইসলাম

১৫। রাকিন শাহরিয়ার

ফ্যাক্ট তথ্য সংগ্রহ:

রওনক শাহরিয়ার

মুস্তফা কামাল জাবেদ

সূচিপত্র

সোলার প্যানেল [৫]

হস্তচালিত নলকূপ [৭]

৫ডি অপটিক্যাল ডেটা স্টোরেজ [১১]

মেমোরি কার্ড বা এসডি কার্ড [১৬]

ওয়াই-ফাই: একবিংশ শতাব্দীর সেরা ইন্টারনেট অ্যাক্সেস গেটওয়ে [১৯]

ব্রাউজার কুকি কী এবং কেন? [২২]

২.৪ গিগাহার্টজ এবং ৫ গিগাহার্টজ ওয়াই-ফাই [২৪]

সার্চ ইঞ্জিন যেভাবে কাজ করে [২৬]

মোবাইলে থাকা সেন্সর [৩০]

আইপি অ্যাড্রেস: ওয়েব-জগতের ঠিকানা [৩৩]

VoIP কী এবং কেন? [৩৫]

দ্যা মিস্টিরিয়াস মেইল [৩৮]

বারকোড কী এবং কেন? [৪১]

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা [৪৬]

MAC Address কী এবং কেন? [৫০]

ফান্ডামেন্টাল অফ কোডিং অ্যান্ড প্রোগ্রামিং [৫৩]

গেম তৈরির যন্ত্র [৫৬]

ডিলিট হওয়া ডেটা কোথায় যায় [৫৮]

ডিলিটিং কিভাবে কাজ করে [৬০]

ফিচার: কারদাসেভ স্কেল এবং আমাদের ভবিষ্যৎ [৬২]

পিজোইলেক্ট্রিক গ্যাস স্টোভ লাইটার [৬৪]

মুভিংকয়েল গ্যালভানোমিটার, এমিটার ও ভোল্টমিটার [৬৭]

ব্লুটুথ [৭৪]

ERROR! [৭৭]

মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা [৭৯]

মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট [৮১]

শরতে লেখা চিঠি [৮৪]

নাইট ভিশন চশমা [৮৭]

এলডিআর (LDR) সেন্সর [৮৯]

SSD কী এবং কেন? [৯১]

ফেইসবুক আইডি সুরক্ষিত রাখবেন কীভাবে? [৯৫]

কোয়ান্টাম কম্পিউটিং: প্রযুক্তি খাতে নতুন জায়ান্ট [৯৭]

ডায়োড [১০০]

সিরিজঃ গ্রহাণুদের গল্প [১০৫]

আসছে নতুন ইন্টারনেট [১০৭]

মিয়াও! বিড়াল ও রসায়ন [১০৯]

হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ [১১২]

একটি তালার আত্মকথা [১১৬]

1^{∞} কেন অসংজ্ঞায়িত? [১২০]

বুলবুল আর সেরিনার বাচ্চা কী উড়ন্ত মাছ হবে? [১২২]

ডিবাগিং [১২৬]

ওরা আসছে [১২৮]

এক রহস্যময় অন্ধকার জগৎ [১৩০]

ফিঙ্গারপ্রিন্ট কী এবং কেন? [১৩৫]

অ্যালগরিদম [১৪০]

বিরক্তিকর “আমি রোবট নই” [১৪৫]

IMEI নম্বর কী এবং কেন? [১৪৮]

আইডর বাগ কী? [১৫২]

কোয়ান্টাম কম্পিউটার [১৫৪]

তথ্যসূত্র [১৫৬]

সোলার প্যানেল

মোহাম্মদ আফছার হোসাইন

আগে আমাদের বাড়িতে সোলারের বিদ্যুৎ ছাড়া আর কোনো বিদ্যুৎ ছিল না। তখন কিছুটা খারাপ লাগত, কারণ লাইট ও ফ্যান খুবই সচেতনভাবে চালানো লাগত। কিন্তু জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুৎ আসার ফলে এখন আর সে সমস্যা নেই। কিন্তু ছোটোবেলা থেকেই আমার নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ খুবই পছন্দের একটা জিনিস। তাই আমি আজ আলোচনা করব সোলার প্যানেল নিয়ে, যদিও এটা বর্তমানে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় কোনো জিনিস নয়। কিন্তু আমি মনে করি, আমাদের প্রত্যেকের বাসার ছাদে এরকম একটা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস থাকলে ভালোই হয়।
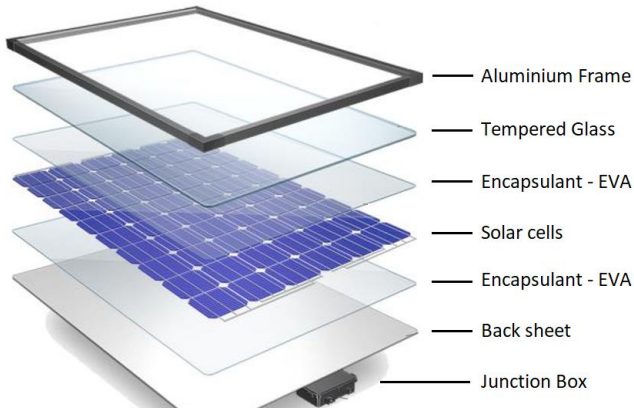
সোলার প্যানেল কী দিয়ে গঠিত?

সোলার প্যানেল মূলত সোলার সেল বা কোষ দিয়ে গঠিত। একে photovoltaic cell বলা হয়। মূলত অনেকগুলো সোলার সেল মিলে একটা সোলার মডিউল তৈরি করে। আবার অনেকগুলো মডিউল মিলে তৈরি করে সোলার প্যানেল। প্রতিটা সেল থেকে ০.৫ ভোল্টের শক্তি পাওয়া সম্ভব।
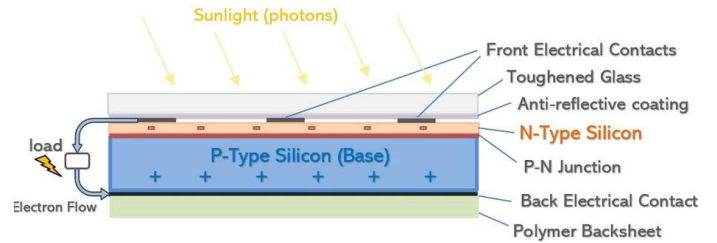
সোলার সেল তৈরি করার মৌলিক উপাদান কী?

সোলার প্যানেলের মূল উপাদান হলো সিলিকন; যেটা একটা সেমিকন্ডাক্টর। কিন্তু এখানে সরাসরি সিলিকন ব্যবহৃত হয় না। সিলিকনকে ডোপায়িত করে n-type আর p-type সেমিকন্ডাক্টর বানানো হয়। বোরনকে সিলিকনের সাথে যুক্ত করে তৈরি করা হয় p-type সেমিকন্ডাক্টর আর ফসফরাসকে সিলিকনের সাথে যুক্ত

করে তৈরি করা হয় n-type সেমিকন্ডাক্টর। যাঁরা জানেন না, তাঁদের জন্য বলে রাখা ভালো যে, n-type নামেই বোঝা যাচ্ছে এটি negative বা ইলেকট্রনের সাথে সম্পর্কিত আর p-type মূলত positive বা হোলের সাথে সম্পর্কিত। হোল বলতে এক কথায় ইলেকট্রনের অভাব বোঝানো হয়। সোলার সেলে এই দুই সেমিকন্ডাক্টরের জাঙ্কশন বা সংযোগ করা হয়; যার কারণে মাঝে একটা depletion layer তৈরি হয়। সেখানে ইলেকট্রন n-type সেমিকন্ডাক্টর থেকে p-type সেমিকন্ডাক্টরের হোলে গিয়ে বসে। এর ফলে n-type-এর দিকে positive potential আর p-type-এর দিকে negative potential সৃষ্টি হয়।
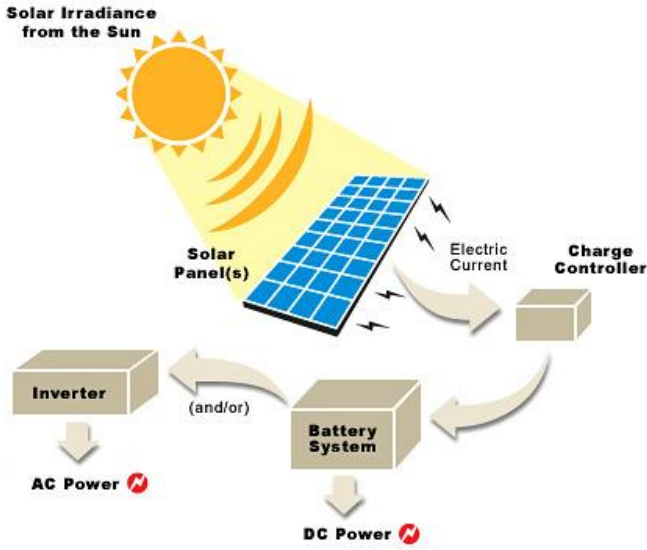
সোলার প্যানেল থেকে কীভাবে আমরা বিদ্যুৎ পাই?

সোলার প্যানেল সূর্যের আলোর ফোটন থেকে শক্তি পায়। একটা সোলার সেলের depletion layer-এ যখন একটা নির্দিষ্ট শক্তির ফোটন এসে পড়ে, তখন হোল আর মুক্ত ইলেকট্রন তৈরি হয়। হোলগুলো p-type-এর দিকে চলে যায়; কারণ সেখানে negative potential থাকে। মুক্ত ইলেকট্রন n-type-এর দিকে চলে যায়; কারণ সেখানে positive potential থাকে। এখন n-type আর p-type-এর দুই প্রান্তে যদি ইলেকট্রনিক তার লাগিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে n-type-এর মুক্ত ইলেকট্রনগুলো তারের মধ্য দিয়ে p-type-এর হোলের সাথে মিলিত হবে। এই ইলেকট্রনের প্রবাহের কারণেই আমরা বিদ্যুৎ পেয়ে যাব। তারের মাঝে একটা বাল্ব লাগিয়ে দিলেই কিন্তু আমরা নিরবচ্ছিন্ন আলো পাব না। কারণ সোলার প্যানেলে DC current তৈরি হয়; যাকে inverter দিয়ে AC current-এ পরিণত করা হয়। তবেই আমরা আলো পাব। ফ্যান, টিভি, ফ্রিজ সবই চালাতে পারব।

রাতে কি সোলার প্যানেল থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব?

সোলার প্যানেল ফোটনের শক্তিতে কাজ করে। তাই রাতে এর কাছ থেকে শক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের কাছে এখন ব্যাটারি আছে, যার মাধ্যমে আমরা এই শক্তি সংরক্ষণ করে রাতে কাজে লাগাতে পারব। বিভিন্ন দেশে তো বাসাবাড়ির সোলার প্যানেল সরাসরি জাতীয় গ্রিডের কারেন্টের সাথে যুক্ত থাকে; যার কারণে দিনে অতিরিক্ত শক্তি তারা সাপ্লাই দেয়, আর রাতে সোলার প্যানেল কাজ না করায় আবার জাতীয় গ্রিডের শক্তি ব্যবহার করে।

এই শক্তির সবচেয়ে ভালো দিক হলো সূর্যের শক্তিকে কাজে লাগানো যায়; যার কারণে পরিবেশ দূষণ কমানো সম্ভব। সিলিকন পৃথিবীতে পাওয়া দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উপাদান, তাই এটা খুবই সহজলভ্য একটা জিনিস। সোলার প্যানেলের দাম দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে আর এর ব্যবস্থাপনাতে তেমন খরচও হয় না। কিন্তু যেহেতু এটা আবহাওয়া নির্ভর, তাই এটাকে শক্তির মূল সোর্স হিসেবে ব্যবহার করা যায় না।

আমাদের বর্তমান সোলার প্যানেলগুলোর কার্যক্ষমতা খুবই কম। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এটা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমানেও এর যা কার্যক্ষমতা রয়েছে, তা দিয়ে আমাদের পুরো পৃথিবীর বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো সম্ভব। আশা করি, সোলার প্যানেল আমাদের ভবিষ্যৎ বাসা-বাড়ির নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস হবে।

হস্তচালিত নলকূপ

মুনতাসির রহমান তামিম

সুজলা-সুফলা বাংলাদেশে বিশুদ্ধ জলের সমস্যাটা কিন্তু বেশ প্রাচীন এবং বড়ো। বিভিন্ন পানিবাহিত রোগে আমাদের বেশ লম্বা সময় ধরে ভুগতে হয়েছে; এখনও হচ্ছে। শুধু আমাদের নয়, মধ্যপ্রাচ্য, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এসব পানিবাহিত রোগ ও মহামারিতে প্রতি বছর অনেক প্রাণ ঝরে। যেমন: বিশ্বব্যাপী শুধুমাত্র ডায়রিয়াতেই প্রতি বছর মৃত্যুবরণ করেন প্রায় ৮,২৯,০০০ জন। এই বছর এখন পর্যন্ত করোনা মহামারিতে মারা যাওয়া মানুষের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ পরিমাণ!

কলেরায় প্রায় ৯৫,০০০ এবং বাংলাদেশে এই সংখ্যাটা ৪,৫০০-এর মতো। (অনুধাবন করার চেষ্টা করুন, সংখ্যাগুলো অনেক বিশাল।) দুঃখের বিষয় হলো, এদের অধিকাংশেরই বয়স পাঁচের নিচে।

ভ্যাক্সিনেশন, স্যানিটেশন ইত্যাদি নানা প্রোগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশে এগুলো নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছি আমরা। কিন্তু বিশুদ্ধ

পানির ব্যবস্থা করতে না পারলে সব চেষ্টাই বৃথা। এখানেই একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নলকূপ। বিশুদ্ধ ও দূষণমুক্ত,

পানযোগ্য, ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের জন্যই তো এর ব্যবহার, নয় কি?

নলকূপ দেখেনি, এর পানি পান করেনি, এমন বাংলাদেশি খুঁজে পাওয়া কঠিন বটে! কিন্তু এর মেকানিজমটা কেমন? কীভাবে কাজ করে এটা?

নলকূপের এই শীতে উষ্ণ, গ্রীষ্মে শীতল; বিশুদ্ধ ও তৃপ্তিদায়ক পানি উত্তোলনের পেছনে একটা সরল, আবার কিছুটা জটিল প্রক্রিয়া কাজ করে। গভীর নলকূপের পানির ফিলট্রেশন, ভূ-গর্ভস্থ উৎস থেকে নলকূপের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছানো ইত্যাদিতে অনেক খাটা-খাটনি আছে। আবার নলকূপের গোঁড়া থেকে এর মুখ পর্যন্ত পানিটাকে পৌঁছাতেও অসাধারণ কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ করে। এখানে শুধু ওইটুকুনই বোঝানোর চেষ্টা করব। আশা করি, ধৈর্য ধরে রাখবেন।

একটি নলকূপ কীভাবে কাজ করে, তা জানার জন্য আগে এর পার্টগুলো চিনে নিই চলুন। বাহ্যিক কোন পার্টগুলো আমরা দেখতে পাই?—

১. সিলিন্ডার আকৃতির একটি মেটাল বডি। (বেশ মজবুত!)
২. একটি হাতল।
৩. হাতলের সাথে সংযুক্ত একটি রড; নলকূপের ভিতরে চলে যাচ্ছে। (এটাকে বলে পিস্টন রড।)
৪. পানি বের হওয়ার একটি মুখ।

এখানে একটা জিনিস খেয়াল করুন। আমরা যখন হাতলটি নিচে নামাই, তখন কিন্তু পিস্টন রডটি ওপরে ওঠে। ঠিক বিপরীতটি ঘটে হাতলটি ওপরে ওঠালে; রডটি নিচে নামে। অর্থাৎ, এরা সম্মিলিতভাবে একটা লিভার তৈরি করছে। এই লিভারটির মাধ্যমেই আমরা যান্ত্রিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারছি (এবং পানি উত্তোলন করছি)। এটুকু বুঝতে কারও বেগ পেতে হবে না।

আসল মাথা-নষ্ট ব্যাপারগুলো শুরু হবে এখন থেকে। চলুন আগে দেখে আসি, কলকারখানার ভেতরটিতে কী কী কলকব্জা আছে!—

১. একটা পিস্টন! (এজন্যই রডটির নাম হয়েছিল পিস্টন রড।) (পিস্টন না চিনলে ভয় নেই; শীঘ্রই চিনবো আমরা।)
২. পিস্টনের সাথে সংযুক্ত একটি ভাল্ব (Valve) বা কপাটিকা। এটাকে পিস্টন ভাল্ব বলে। আবার মুভিং ভাল্বও বলা হয় মাঝে মাঝে। কারণ, পিস্টনের সাথে এটা ওপরে-নিচে ওঠা-নামা করে।
৩. বডির একদম নিচে সংযুক্ত আরেকটি ভাল্ব। একে বলা হয় ফুট (foot) ভাল্ব। আগেরটাকে মুভিং ভাল্ব হলে, এটাকে বদ্ধ ভাল্বও বলতে পারেন। কারণ এটা ফুট বা নলকূপের গোড়ার সাথে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ থাকে।

এখন সময় হয়েছে ‘ভাল্ব’ ও ‘পিস্টন’-এর সাথে পরিচিত হওয়ার—

ভাল্ব (Valve):
ভাল্ব কী আসলে? শুদ্ধ বাংলায় একে আমরা বলি, কপাট বা কপাটিকা। আচ্ছা, কপাট তো আমরা সকলেই চিনি, ঠিক না? কপাটের একটা সহজ উদাহরণ হলো দরজা। এখন বলবেন না, দরজা দেখেননি! দরজাগুলো কেমন হয়? একটা অংশ দেওয়ালের সাথে শক্ত করে লাগানো থাকে। অপর অংশটি বন্ধ করে বা খুলে আমরা আসা-যাওয়া করি। আবার, এই বন্ধ হওয়া ও খোলা কিন্তু মোটামুটি দুই ধরনের। শুধু একদিকে ধাক্কা দিলেই খুলে যায়; অন্য দিকে বল প্রয়োগ করলে লেগে যায়। আমাদের দেখা অধিকাংশ দরজাই এরকম। কিন্তু এছাড়াও আরেক ধরনের দরজা আছে, যেগুলো দুদিক থেকে ধাক্কা দিয়েই খোলা যায় (বিভিন্ন অফিস ও মলের কাচের দরজা); মোটামুটি কেন্দ্রে থাকলে আমরা একে ‘বন্ধ’ বলি। এই সবকিছুই ভাল্বের উদাহরণ। নলকূপে যে ভাল্বগুলো থাকে, সেগুলো প্রথম টাইপের ভাল্ব। শুধুমাত্র উল্লম্ব বরাবর ওপর দিকে বল প্রয়োগ করলেই ভাল্বগুলো খোলে, অন্যথায় বন্ধ থাকে।

পিস্টন (Piston):
পিস্টন আমরা সকলেই দেখেছি; নানা আকৃতির, নানা আকারের, নানা কাজের; কিন্তু কেউ কেউ হয়তো চিনতে পারছি না। যান্ত্রিক শক্তি দিয়ে কাজ করা হলেই সেখানে পিস্টন জিনিসটাকে দেখা যেতে পারে। সবচেয়ে সরল পিস্টনের উদাহরণ কিন্তু নলকূপের পিস্টনটাই! সোজা কথায়, পিস্টন হলো বল প্রয়োগ করার যন্ত্র। বিশেষত, কোনো সিলিন্ডার আকৃতির ঘনবস্তুর গোলীয় তলটির সাথে সংযুক্ত থেকে পিস্টন ওপরে-নিচে ওঠা-নামা ও চাপ প্রয়োগ করতে পারে।
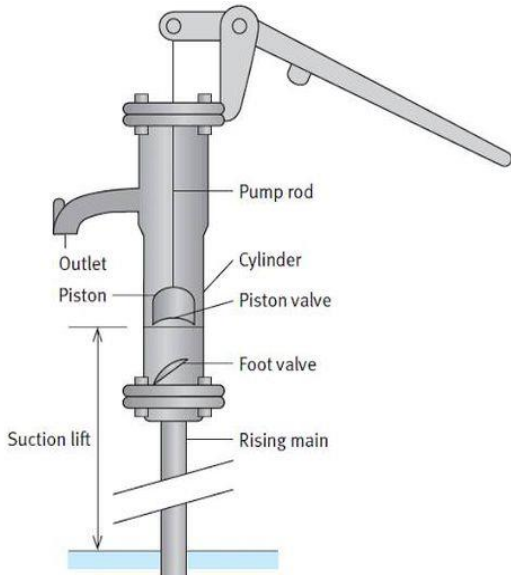
এবার, এই সবকিছু জোড়া লাগানোর পালা। জোড়া লাগালে যে 'এয়ার টাইট' বস্তুটি পাই সেটা মোটামুটি নিচের ছবির মতো দেখতে।
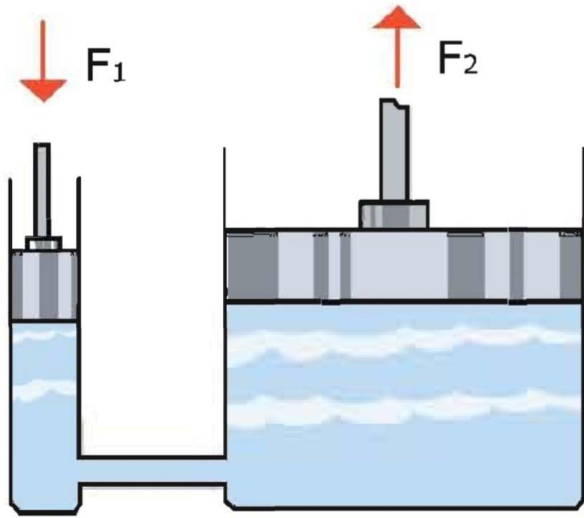
নলকূপের কার্যপদ্ধতি:

আমরা ধরে নিচ্ছি, পানির সাপ্লাই নলকূপের foot valve-এর নিচ পর্যন্ত এসে গেছে! ধরে নিই, foot valve থেকে piston valve পর্যন্ত জায়গাটুকুন বায়ুভর্তি। অর্থাৎ, গভীর নলকূপের নিচের অংশটা যথাযথভাবে তার কাজ সম্পন্ন করেছে।

পিস্টনটি একেবারে ওপরে থাকা অবস্থাটা যদি নলকূপের প্রাথমিক অবস্থা ধরে নিই, তাহলে কী হচ্ছে? আমরা যখন হাতলটি ওপরে ওঠাচ্ছি, তখন পিস্টনটা ভাল্বসহ নিচে নামতে চেষ্টা করছে। এখানে একটা মজার ঘটনা ঘটে। যেহেতু মাঝের জায়গাটুকু আবদ্ধ বা 'এয়ার টাইট', তাই বাইরের বায়ুর সাথে ভেতরের বায়ুর কোনো সংযোগ নেই। ভেতরের আবদ্ধ বায়ুটায় পিস্টনের মাধ্যমে আমরা যদি যান্ত্রিক শক্তি দিয়ে চাপ প্রয়োগ করি, তাহলে চাপটা প্যাসকেলের সূত্র ৩ অনুযায়ী পুরো আবদ্ধ জায়গার সার্ফেসের সবখানে সমানভাবে সঞ্চালিত হয়ে লম্বভাবে কাজ করতে চেষ্টা করবে। অর্থাৎ, মেটাল বডিটার ওপর-নিচের foot valve-টার ওপর, আবার ওপরের piston valve-টার ওপরেও সমানভাবে চাপ পড়বে। এখন বায়ু কর্তৃক সর্বত্র প্রয়োগকৃত এই চাপের ফলাফল কী? আগেই বলেছিলাম, মেটাল বডিটা বেশ মজবুত। তাই এই চাপ মেটাল বডির কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। নিচের foot valve-টায় উল্লম্বভাবে ওপর থেকে চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা জানি, নলকূপের একটি ভাল্বও উল্লম্বভাবে ওপর থেকে চাপ প্রয়োগ করলে খুলবে না; নিচ থেকে চাপ প্রয়োগ করতে হবে। তাই foot valve-টার অবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে না। বাকি থাকল শুধু piston valve-টা। খেয়াল করুন, piston valve-টার ওপর কিন্তু আবদ্ধ বায়ুটা, উল্লম্বভাবে নিচ থেকে চাপ প্রয়োগ করছে! বলুন তো এবার কী হবে? piston valve-টা খুলে যাবে!

এতক্ষণের সব বর্ণনা ছিল ঠিক যান্ত্রিক শক্তি প্রয়োগ করার মুহূর্তটার বর্ণনা। এখন আমরা পাচ্ছি, একটা নিচের দিকে গতিশীল পিস্টন, মুখ হা করে থাকা পিস্টনের সাথে সংযুক্ত একটি ভাল্ব এবং একদম গোড়ায়, বদ্ধ আরেকটি ভাল্ব।

যখন আপনি নলকূপের হাতলটিকে একেবারে ওপরে ওঠাবেন, অর্থাৎ পিস্টনটিকে একেবারে নিচে নামিয়ে আনবেন, তখন পিস্টন ও foot valve-এর মধ্যকার বায়ুর অনেকটাই খোলা ভাল্বের মুখ দিয়ে বাইরে উন্মুক্ত হবে। এবার পিস্টনটিকে ওপরে ওঠানোর পালা।

একটা জিনিস ভুলে গেলে চলবে না, পিস্টনের ওপরে একটা আস্ত বায়ুমণ্ডল রয়েছে। আর এই বায়ুমণ্ডলটা পিস্টনের ওপরে ক্রমাগত একটা চাপ প্রয়োগ করেই যাচ্ছে। কিন্তু এই চাপটা piston valve-টার অবস্থার কোনো পরিবর্তন করতে পারবে কি? একদমই না। উল্লম্ব বরাবর নিচের দিকে চাপ প্রয়োগ করলে তো আমাদের ভাল্বগুলোর কিছু হয় না! এখন পিস্টনটি যখন ওপরের দিকে ওঠা শুরু করছে, তখন ভাল্বদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটা 'আপেক্ষিক' শূন্যস্থান তৈরি হচ্ছে। এর ফলে এখানে অবস্থিত গ্যাসের আয়তন বেড়ে যাচ্ছে (ঘনত্ব কমে যাচ্ছে) এবং গ্যাস কর্তৃক foot valve-এর ওপর প্রয়োগকৃত চাপের মানটাও স্বভাবতই হ্রাস পাচ্ছে। এখানে কিন্তু সবার অগোচরে আরেকটা ঘটনা ঘটছে। foot valve-এর নিচে থাকা তরল (পানি) ও ওপরে থাকা গ্যাস উভয়ই ভাল্বের ওপর ক্রমাগত একটা সমান ও বিপরীতমুখী বল প্রয়োগ করে যাচ্ছে। ফলে ভাল্বটির অবস্থান নিউট্রাল থাকে। কিন্তু যখন গ্যাস কর্তৃক প্রয়োগকৃত বলের মান হ্রাস পাচ্ছে, তখন দুটো বলের লব্ধি

ভাল্বটির ওপর উল্লম্বভাবে ওপরের দিকে একটি বল প্রয়োগ করছে। আর নলকূপের কোনো ভাল্বের ওপর ভার্টিক্যালি ওপরের দিকে বল প্রয়োগ করলে কী হয়? ভাল্বটির মুখ খুলে যায়! এক্স্যাক্টলি! ভাল্বের এই খোলা মুখ দিয়ে পানি নলকূপের ভেতরে চলে আসে এবং আগে তৈরি হওয়া 'আপেক্ষিক' শূন্যস্থানটি পূরণ করে দেয়।

এভাবে পূর্ণ কয়েকটি পাম্প করলেই নলকূপের ভেতরের বায়ুপূর্ণ অবস্থাটা সম্পূর্ণ পানিপূর্ণ হয়ে যায়। আর নলকূপগুলো সবসময় এই পানিপূর্ণ অবস্থায়ই থাকে। এবার তাহলে পানিটা বাইরে বের করার পালা!
আপনি যদি ওপরের কথাগুলো বুঝে থাকেন, তাহলে এটা বোঝাও আপনার জন্য সহজ হবে। কেননা, কার্যত ওপরের প্রক্রিয়ার সাথে নলকূপের বডির ভেতর থেকে পানি বের করার পদ্ধতির কোনো পার্থক্য নেই। জাস্ট, আগের বায়ুকে পানি দ্বারা পরিবর্তিত করে চিন্তা করুন। (সংযুক্ত অ্যানিমেশনটি দেখুন।) ব্যস! পেয়ে যাচ্ছেন ভূ-গর্ভস্থ বিশুদ্ধ খাবার পানি।

পুরো প্রক্রিয়াটি মনশ্চক্ষুতে অনুধারণ করতে এই ইউটিউব ভিডিওটি দেখতে পারেন।

একটা মজার ফ্যাক্ট দিয়ে লেখাটা শেষ করি। কথায় কথায় "শীতে উষ্ণ, গ্রীষ্মে শীতল" পানির কথা বলেছিলাম। নলকূপে এমন হয় কেন? কী ভুতুড়ে ব্যাপার রে বাবা! এটা কি কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং জাদুর কারণে হয়? না কি প্রকৃতির কোনো খেয়ালিপনা? আসলে তেমন কিছুই নয়। শীত আর গ্রীষ্মে মূলত বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার তারতম্য ঘটে। ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা সারা বছরই মোটামুটি কনস্ট্যান্ট থাকে। ফলে গভীর নলকূপ থেকে উত্তোলিত এই পানির তাপমাত্রা সারাবছর মোটামুটি ১৮-২০°C-এর মতো থাকে। ফলে শীতকালে (পরিবেশের তাপমাত্রা তখন ১২-১৫°C) এই জলটাই গরম অনুভূত হয়। অন্য দিকে, গ্রীষ্মে মনে হয় ঠান্ডা!

টাইপ করার গতিকে ধীরগতি করার জন্য QWERTY কী-বোর্ডের উদ্ভাবন হয়েছিল। প্রথমদিকে টাইপিস্টদের দ্রুত টাইপ করার জন্য মেকানিক্যাল টাইপরাইটারগুলো জ্যাম হয়ে যেত। তাই এমন কী-বোর্ডের প্রচলন হয়। এখন ওই জ্যাম হওয়ার সমস্যা না থাকলেও আমরা অভ্যস্ত হওয়ায় ওইটাই ব্যবহার করি।
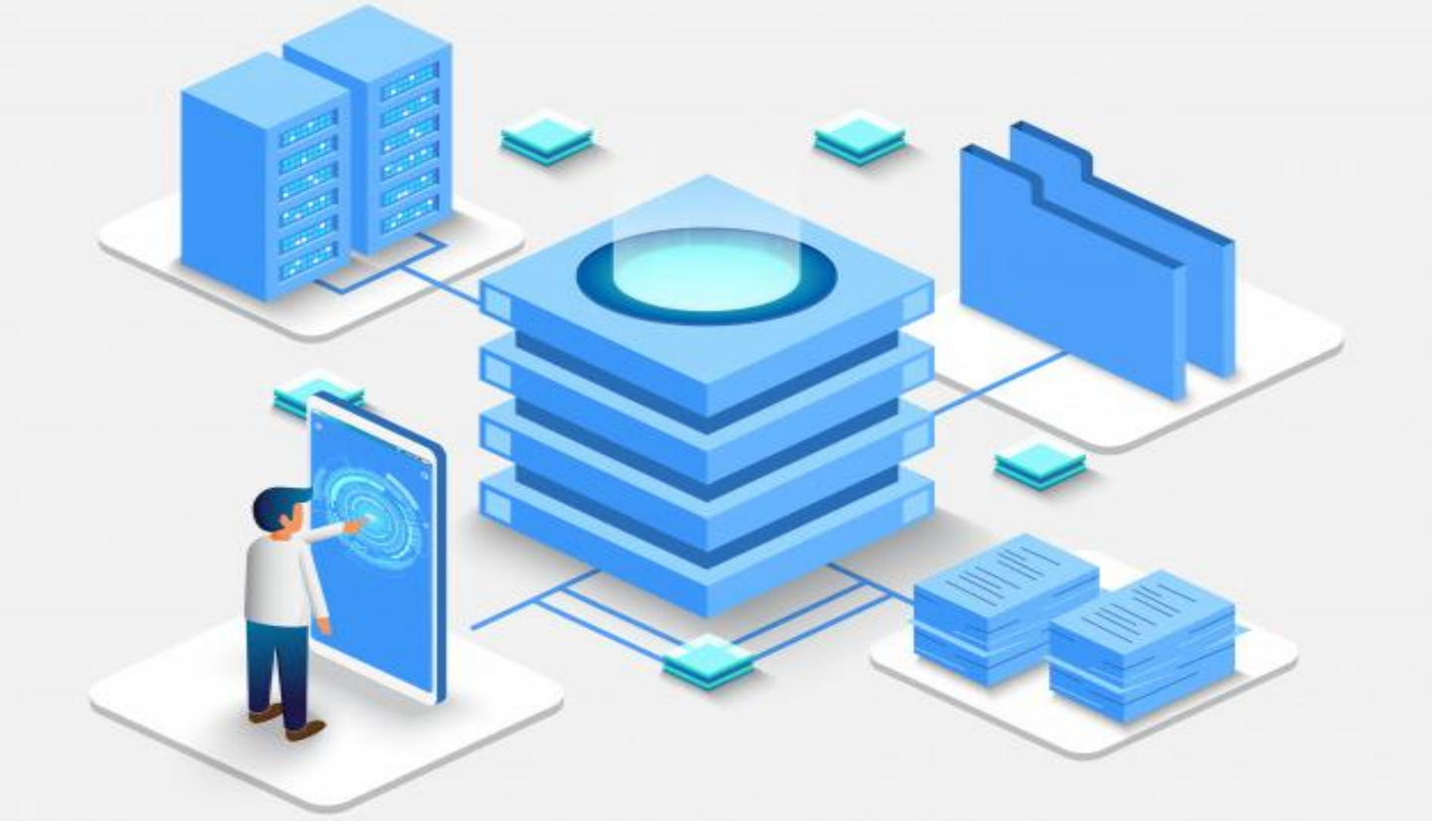
৫ডি অপটিক্যাল ডেটা স্টোরেজ

(কাচের মধ্যে তথ্য ধারণ হাজার বছর!)

ওমর খালিদ সোহাগ

আদিম যুগে মানুষ পাথরে খোদাই করে তাদের গল্প লিখে গিয়েছিল; হাজার বছর পরে আমরা সেগুলো উদ্ধার করে আমাদের ইতিহাস জানতে পেরেছি। প্রথম কাগজের আবিষ্কার, ছাপাখানার আবিষ্কার এগুলো সবই ছিল তথ্য সংরক্ষণে এক একটা নতুন মাইলস্টোন। একটু খেয়াল করলে দেখা যায়, প্রাচীন যুগ থেকেই মানুষ যেটা সবসময় করতে চেয়েছে, সেটা হলো তথ্য সংরক্ষণ, নিজেদের তথ্য পরবর্তী জেনারেশনে পৌঁছে দেওয়া। খ্রিষ্টের বাইবেল হোক অথবা প্রাচীন মিশরের পিরামিডে লেখা হায়ারোগ্লিফিক্স, সেই ইতিহাস আমরা পেয়েছি। জেনেছি কেবল তথ্য সংরক্ষণের জন্য কোনো না কোনোভাবে মানুষ তার সভ্যতা-সংস্কৃতির গল্প লিখে গেছে। আজকের যুগের কম্পিউটার হোক, মোবাইল হোক অথবা বইপত্র, খাতা, ছবি, সবক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিস, সেটা হলো সংরক্ষিত তথ্য। এই তথ্য হতে পারে কোনো দলিল, বই, সাহিত্য, কোনো কন্ট্রাক্ট, কোনো রেকর্ডিং অথবা ছবি-ভিডিয়ো আকারে আমাদের হাজার হাজার স্মৃতি। এসব তথ্যকে অবশ্যই আমরা কখনো হারাতে চাই না, চাই না নষ্ট করতে। আরও চাই, এসব যেন বেঁচে থাকুক শত শত বছর।

এক এস্টিমেশন অনুযায়ী বলা হয়, বর্তমানে ইন্টারনেটে ক্লাউড স্টোরেজের ধারণ ক্ষমতা ২,০০০ এক্সাবাইট (২ বিলিয়ন টেরাবাইট)। এভাবে শুনলে মনে হতে পারে, এটা এক বিশাল স্টোরেজ। কিন্তু বাস্তবে আসলে চিত্র ভিন্ন। শুধু ইউটিউবের কথাই চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রতি মিনিটে ইউটিউবে প্রায় ৫০০ ঘণ্টার কন্টেন্ট আপলোড করা হয়। প্রযুক্তির উন্নয়নের পথে এখন দিন দিন সবকিছু ক্লাউডভিত্তিক হয়ে যাচ্ছে। শুধু পারসোনাল ফাইল নয়, বিভিন্ন সিকিউরিটি ফাইল, মেডিকেল রেকর্ড, ক্রিমিনাল রেকর্ড, পাবলিক ড্যাটা ইত্যাদি সবকিছুরই ঠিকানা এখন ক্লাউড। আর তাই বিশ্বব্যাপী দীর্ঘমেয়াদী ড্যাটা ধারণকারী ডিভাইসের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। কারণ যদি নতুন কোনো স্টোরেজ

প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করা না হয়, তাহলে ধারণা করলে দেখা যায় একদিন না একদিন ইন্টারনেটের সকল স্পেইস শেষ হয়ে যাবে, তা হোক আরও শত বছর পরে বা তারও পরে। সেই সাথে আর্কাইভড ড্যাটার জন্য বর্তমানের কোনো ডিজিটাল সল্যুশনই উপযুক্ত নয়, তাদের জন্যও নতুন প্রযুক্তির দরকার হবে ভবিষ্যতে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৫ সালের মধ্যে বিভিন্ন ক্লাউড স্টোরেজে সংরক্ষিত ড্যাটার পরিমাণ ১০০ জেটাবাইট ছাড়িয়ে যাবে (১ জেটাবাইট = ১০০ কোটি টেরাবাইট)। এত বিশাল আকারের ড্যাটাকে সুরক্ষিতভাবে, দীর্ঘস্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করার জন্য স্টোরেজ ডিভাইস নিয়ে চিন্তার শেষ নেই বড়ো বড়ো টেক জায়ান্টগুলোর। অনেক কোম্পানি নতুন নতুন স্টোরেজ সল্যুশন নিয়ে রিসার্চ করে চলেছে। এমনই এক সল্যুশন হতে পারে কাচ।

জিনিসটা কী?

জিনিসটা আপাতদৃষ্টিতে সিম্পল। কাচের ফলকের ভেতরে লেজার দিয়ে খোদাই করে তথ্য সংরক্ষণ। বিভিন্ন গিফট শপে কাচের কিউবের ভেতরে খোদাই করা বিভিন্ন প্যাটার্ন (তাজমহল, আইফেল টাওয়ার ইত্যাদি) দেখেছেন নিশ্চয়ই। মোটা দাগে কিছুটা ওরকম। কিন্তু শুধু এতটুকু অংশই সরল, বাকি সম্পূর্ণ প্রযুক্তি যথেষ্ট জটিল এবং অবাক করার মতো। ২০১৩ সালে ইউনিভার্সিটি অব সাউথহ্যাম্পটনের একদল গবেষক এমন এক কাচের ডিস্ক উদ্ভাবন করেন, যার মধ্যে সংরক্ষিত তথ্যকে 5D তে রিড করা যায়। কনভেনশনাল স্টোরেজ মিডিয়াম 3D তে ড্যাটা স্টোর এবং প্রসেস করে। কাচে সংরক্ষিত ড্যাটা শুধু X,Y,Z এই ৩ অক্ষেই নয় বরং সেই কাচের ভেতরে আলো কীভাবে, কোন দিকে কতটা বেঁকে যায় সেই তথ্যের ওপরে ভিত্তি করেও ড্যাটা রাইট এবং রিড করতে পারে। খুব সরলভাবে এর ব্যাখ্যা দিলে এভাবে বলা যায় যে সাধারণ ডিস্কে লেজার দিয়ে ক্ষত সৃষ্টি করা হয়, ডিস্ক রিডার ক্ষতের স্থানগুলোকে ১ এবং যে-সব স্থানে ক্ষত নেই, সেগুলোকে ০(শূন্য) হিসেবে কাউন্ট করে, মানে বাইনারির হিসাব। কাচের ডিস্কেও উচ্চ ক্ষমতার লেজার দিয়ে ক্ষত সৃষ্টি করা হয়, একে বলে ন্যানোগ্রেটিং। এখানে পার্থক্য হলো, একটা গ্লাস ডিস্কের ভেতরে একাধিক লেয়ারে এসব এনগ্রেভিং তৈরি করা যায়। সেই সাথে নতুন প্রযুক্তির লেজার শুধু কোথায় ক্ষত আছে বা নেই সেটাই না, বরং সেই ক্ষত কতটা গভীর, কোন দিকে ঘোরানো, কত বড়ো বা ছোটো ইত্যাদি সব ধরনের তথ্য রিড করতে পারে। প্রত্যেকটা ডিস্ককে আবার বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে আলাদা আলাদা প্যাটার্ন পাওয়া যায়। বিভিন্ন দিক থেকে এই ক্ষতগুলোর আকার-আকৃতি, দিক, গভীরতা ইত্যাদির জন্য এগুলো থেকে বিভিন্নভাবে আলো প্রতিফলিত, প্রতিসরিত হয়। সেই তথ্যকেও রিড করার ক্ষমতা আছে বর্তমান প্রযুক্তিতে। এর ধারণক্ষমতার কথা বললে বলা যায়, এই একটি কাচের ডিস্ক বাজারে পাওয়া সাধারণ সিডি ডিস্কের ৩,০০০ গুণের সমান। একটি ব্লু-রে ডিস্কের ধারণক্ষমতা ১২৮ গিগাবাইট, একটি সিলিকন স্টোরেজ ডিস্কের ধারণক্ষমতা ৩৬০ টেরাবাইট!

সাউথহ্যাম্পটন ইউনিভার্সিটির গবেষকগণ ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ বাইবেল, নিউটনের অপটিক, জাতিসংঘের মানবাধিকার নীতিমালা ইত্যাদি তথ্য এসব ডিস্কে রাইট করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের ধারণা মতে, এসব ডিস্কের আয়ু হবে প্রায় ১৩.৮ বিলিয়ন বছর, যা প্রায় আমাদের মহাবিশ্বের বয়সের সমান!
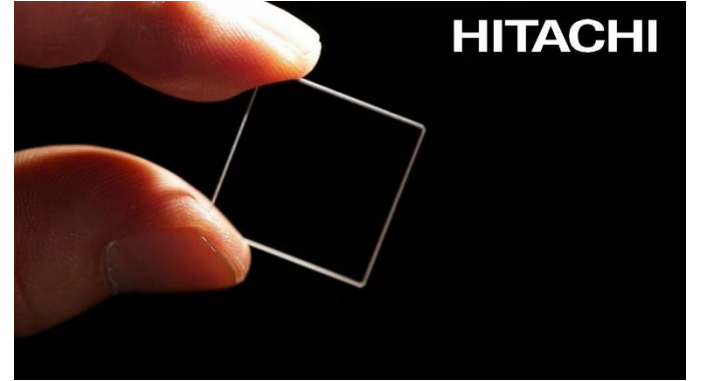
হিটাচির ফিউজড সিলিকা রেকর্ডিং টেকনোলজি

এতে সন্দেহ নেই যে বর্তমান যুগের স্টোরেজ সল্যুশন অসাধারণ গতি, ক্ষমতা এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদান করতে সক্ষম। কিন্তু এগুলোর কোনোটিই দীর্ঘ সময় অক্ষত থাকে না। উচ্চ ধারণ ক্ষমতার সাথে সাথে দীর্ঘমেয়াদী অক্ষত মাধ্যম এখন সময়ের প্রয়োজন। কাচের ভেতরে তথ্য সংরক্ষণের প্রযুক্তি নিয়ে হিটাচি গবেষণা করছে ২০০৮ সাল থেকে। হিটাচি পরীক্ষা করে দেখিয়েছে যে তাদের প্রযুক্তিতে কাচে সংরক্ষিত তথ্য ২ ঘণ্টা ধরে ১,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উত্তপ্ত করলেও নষ্ট হয় না। এই পরীক্ষা থেকে ধারণা করা যায় যে এই কাচের ফলকে রক্ষিত তথ্য ৩০০ মিলিয়ন বছর পর্যন্ত অক্ষত থাকতে সক্ষম। যদিও আমরা লক্ষ লক্ষ বছরের জন্য তথ্য সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছি, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যদি এই তথ্যকে পুনরুদ্ধার করতে না পারে, তাহলে এই প্রযুক্তি পুরোটাই বিফলে যাবে। তাই হিটাচির লক্ষ্য যেন এই কাচের ড্যাটাকে সহজ এবং সরল যন্ত্রপাতি দিয়েই রিড করা যায়। ড্যাটা রাইট করার জন্য ব্যবহার করা হয় ফেমটোসেকেন্ড পালস লেজার। এই লেজার এনগ্রেভিংয়ের বিস্তারিত পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে। জাপানের কিয়োটো

ইউনিভার্সিটির সাথে একত্রে কাজ করে এই ব্রেকথ্রু প্রযুক্তির বিকাশ ঘটে। ফেমটো লেজার দিয়ে কাচের মধ্যে ক্ষত সৃষ্টি করা হয়, যে-গুলো এক একটা 2D কোড হিসেবে কাজ করে। বাস্তব ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি আরও এফিশিয়েন্ট করার জন্য হিটাচি পুরু কাচের ফলকে একাধিক স্তরে এই লেজার এনগ্রেভিং করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত হিটাচি এক কাচের ফলকের ভেতরে ১০০ লেয়ারে তথ্য রাইট করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের এই রেকর্ডিং ডেনসিটি বর্তমান সময়ের একটা ব্লু-রে ডিস্কের ধারণক্ষমতার থেকেও বেশি। প্রায় অবিনশ্বর এই স্টোরেজ সল্যুশন দ্রুত সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং অন্যান্য আরও অনেক কোম্পানি একই রকম প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করা শুরু করে। ২০১৪ সালে শিন-এন-২ স্যাটেলাইটের পে-লোড হিটাচির এই ফিউজড সিলিকা কাচের ফলক নিয়ে মহাকাশে যাত্রা করে। এই ফলকে লক্ষ লক্ষ বছর পরের প্রজন্মের জন্য আমাদের শুভেচ্ছা বার্তা খোদাই করা আছে। সেই মেসেজ আমাদের মহাকাশে ভেসে চলবে বছরের পর বছর। হিটাচির এই ফলক ব্রিটিশ মিউজিয়ামের '১০০ জিনিসে পৃথিবীর ইতিহাস' নামক এক্সিবিশনেও স্থান পায়।
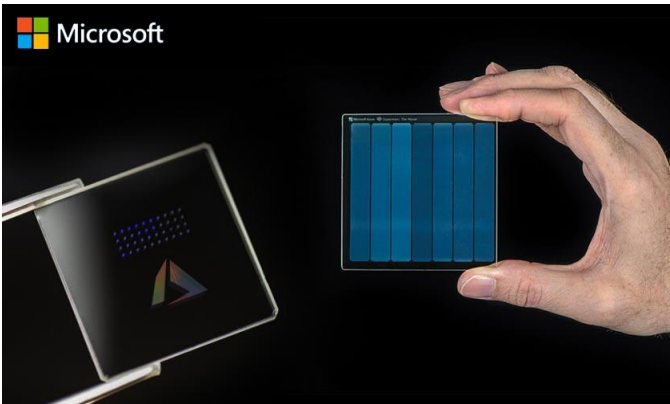
মাইক্রোসফট প্রজেক্ট সিলিকা

মাইক্রোসফট কাচে তথ্য সংরক্ষণের যে সল্যুশন নিয়ে কাজ করছে, তার নাম প্রজেক্ট সিলিকা। কেম্ব্রিজে মাইক্রোসফট রিসার্চ ল্যাবে চলছে এই প্রজেক্টের সকল গবেষণা।

প্রজেক্ট সিলিকা হলো কাচের মধ্যে তথ্য সংরক্ষণের একটি প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তিতে একটি কোয়ার্টজ গ্লাস শিটের ভেতরে ফেমটোসেকেন্ড পালস লেজার দিয়ে খোদাই করে ড্যাটা রাইট করা হয় (১ ফেমটোসেকেন্ড = ১ সেকেন্ডের ১০ লক্ষ কোটি ভাগের ১ ভাগ; ড্যাটা রাইট করার জন্য ১০০ ফেমটোসেকেন্ড পালস ব্যবহার করা হয়)। লেজার দিয়ে কাচের শিটের ভেতরে ফোকাস করা হয়, লেজার যেখানে ফোকাস করে। সেই স্থানে কাচে স্থায়ীভাবে একটি ভক্সেল তৈরি হয় বা সহজ কথায় বললে আঁচড় পড়ে যায়। এই প্রসেসকে ন্যানোগ্রেটিং বলে। আর এই ন্যানোগ্রেটিং-এ প্রত্যেক পালসে একটি করে ১ ন্যানোমিটার আকারের ভক্সেল তৈরি হয়। কম্পিউটারের ভাষায় ভক্সেল বলতে ত্রিমাত্রিক রেফারেন্স মডেলের সমবণ্টিত গ্রিডে একটি একক ড্যাটা পয়েন্ট বা স্যাম্পলকে বোঝায়, এই ড্যাটা পয়েন্টে এক বা একাধিক তথ্য সংরক্ষিত থাকতে পারে। কাচের ভেতর প্রত্যেক ভক্সেলের একটি নির্দিষ্ট দিক এবং নির্দিষ্ট গভীরতা আছে, যার উভয়ই লেজার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যার ফলে বিভিন্ন ভক্সেল বিভিন্ন গভীরতার এবং বিভিন্ন দিকে মুখ করে থাকতে পারে। এই দিক ও গভীরতার ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি ভক্সেলে একাধিক 'বিট' সংরক্ষণ করা যায়। অর্থাৎ, একটি ভক্সেল একাধিক তথ্য ধারণ করতে সক্ষম। কাচের ভেতরে অসংখ্য লেয়ারে এই ভক্সেলগুলো কলাম ও সারি আকারে সাজানো থাকে, সব মিলে যা একে একটি ত্রিমাত্রিক আকার দেয়। এর ফলে ছোটো স্থানেও অনেক বেশি পরিমাণ ড্যাটা রাইট করা যায়। সম্পূর্ণ সিস্টেমটি ত্রিমাত্রিক হবার কারণ শুধুমাত্র ভক্সেলের X, Y, Z অক্ষে অবস্থান। দিক ও গভীরতা নিয়ন্ত্রণ করে বহুমাত্রিক ড্যাটা সংরক্ষণ ডিভাইস তৈরি সম্ভব। একবার একটি শিটে ড্যাটা রাইট করা হয়ে গেলে সেটা সেখানে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হয় এবং পরবর্তীতে শুধুমাত্র শিট থেকে রাইট করে ড্যাটা রিড করা যায়, কোনো প্রকার মোডিফাই করার আর সুযোগ নেই। বিভিন্ন প্রযুক্তি দিয়ে কাচে ড্যাটা রাইট ও রিড করা সম্ভব। যেমন: কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত মাইক্রোস্কোপ দিয়ে শিট থেকে ড্যাটা রিড করা সম্ভব। এটি ফেমটোসেকেন্ড পালস লেজারের মতোই একটি লেজার রিডিং ডিভাইস, যা কাচ থেকে ড্যাটা পুনরুদ্ধারে ব্যবহার করা হয়। X, Y, Z অক্ষে অবস্থান নির্ণয়ের মাধ্যমে দ্রুত প্রয়োজনীয় তথ্যের অবস্থান লেজার দিয়ে শনাক্ত করা হয়। এরপর রিডিং হেড (রিডিং লেজার পয়েন্টার) যে লেয়ারে তথ্যটি রয়েছে, সেই লেয়ারে ফোকাস করানো হয়। সেই লেয়ারের ভক্সেলগুলোর পোলারাইজেশন (দিক) ও গভীরতা রেকর্ড করা হয়। এভাবে রিডিং হেড পরবর্তী লেয়ারগুলো স্ক্যান করে এবং সবশেষে সবগুলো ছবি একত্রে প্রসেস করে সংরক্ষিত ড্যাটা উদ্ধার করা যায়।

গ্লাস স্টোরেজ বা প্রজেক্ট সিলিকার সুবিধা

প্রজেক্ট সিলিকার সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হলো এতে রক্ষিত ড্যাটার জীবনকাল বা স্থায়িত্ব। কোয়ার্টজ কাচের শিট অত্যন্ত মজবুত এবং কাচের মধ্যে একবার ড্যাটা রাইট করা হয়ে গেলে সেই ড্যাটাসমৃদ্ধ কাচ শত শত বছর অক্ষত থাকতে পারে। অন্যান্য ম্যাগনেটিক স্টোরেজের সবগুলোরই সময়ের সাথে সাথে কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়, সংরক্ষিত ড্যাটা ক্ষয় হয়ে যায়। কিন্তু কাচে এই ক্ষয়ের কোনো ঝুঁকি নেই। বরং আরও বলা হচ্ছে ড্যাটা সংরক্ষিত কাচের লাইফটাইম ভার্চুয়ালি লিমিটলেস, কাচ ভেঙে গেলেও এটা থেকে সম্পূর্ণ ড্যাটা পুনরুদ্ধার সম্ভব। রক্ষিত ড্যাটা নষ্ট করার উপায় একমাত্র কাচকে গলিয়ে ফেলা বা ভেঙে একেবারে গুঁড়ো করে ফেলা। যেহেতু সকল ড্যাটা কাচের ভেতরে রাইট করা, তাই বাইরের সার্ফেসে কোনোভাবে স্ক্র্যাচ পড়লেও ভেতরের তথ্য সুরক্ষিত থাকবে। সাধারণ সিডি, ফিল্ম বা হার্ড ডিস্কের ক্ষেত্রে যেটা সম্ভব না, কারণ এসব সিস্টেমে ডিভাইসের বাইরের তলেই ড্যাটা রাইট করা হয়।

প্রজেক্ট সিলিকার আরও একটি বড়ো সুবিধা হলো এর ইকোনমি। ম্যাগনেটিক স্টোরেজের তুলনায় এর উৎপাদন খরচ এবং ড্যাটা রিড-রাইট করার খরচ অনেক কম এবং একটি কাচ শিটে মাত্র একবারই ড্যাটা রাইট করা যায় এবং সেখান থেকে তা হারিয়ে যাওয়ার কোনো ভয় নেই।

প্রজেক্ট সিলিকা সম্পূর্ণ কাচের হবার কারণে এতে পানিতে ভেজার ভয় নেই, টেম্পারেচার কন্ট্রোলের ঝামেলা নেই এবং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পালস থেকেও এর কোনো ক্ষতি হবার ভয় নেই।

কাদের জন্য প্রজেক্ট সিলিকা?

প্রাথমিক স্টেইজে প্রজেক্ট সিলিকা ডেভেলপমেন্ট শুরু হয়েছিল ক্লাউড স্টোরেজ সল্যুশন হিসেবে। কারণ বর্তমানে ব্যবহৃত সকল স্টোরেজ মিডিয়ামের কোনোটাই অরিজিনালি ক্লাউডের কথা চিন্তা করে আবিষ্কৃত হয়নি এবং দীর্ঘ সময় আর্কাইভ করে রাখা ড্যাটার জন্য এই স্টোরেজ সিস্টেম সুবিধার নয়। অবশ্যই এই প্রজেক্ট সিলিকা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ডিভাইসে ইউজের জন্য উপযোগী নয়, এসব ডিভাইসে স্টোরেজের জন্য ন্যান্ড ফ্ল্যাশ বা ম্যাগনেটিক মিডিয়ার ব্যবহার আরও বহুদিন চলতে থাকবে। কারণ এসব ডিভাইসে রেগুলার ড্যাটা রিড-রাইট-রিরাইট করতে হয়। প্রজেক্ট সিলিকার অ্যাপ্লিকেশন আর্কাইভ ড্যাটার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বলে ধারণা করছেন গবেষকরা। সেসব তথ্য যে-গুলো শত শত বছর অক্ষত অবস্থায় রাখা জরুরি এবং যাতে কখনো কোনোরকম মোডিফিকেশনের দরকার নেই। যেমন: বিভিন্ন দলিলপত্র, ছবি, মিডিয়া কন্টেন্ট (যেমন: সিনেমা) ইত্যাদি।

প্রজেক্ট সিলিকার সাফল্য ও বাস্তব প্রয়োগ:

সম্প্রতি মাইক্রোসফট সফলভাবে প্রজেক্ট সিলিকার ট্রায়াল দিতে সক্ষম হয়েছে। এর জন্য মাইক্রোসফটের সাথে কাজ করছে পৃথিবীর অন্যতম বড়ো প্রোডাকশন হাউজ ওয়ার্নার ব্রাদার্স। ওয়ার্নার ব্রাদার্সের কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ফিল্ম ও টেলিভিশন লাইব্রেরি রয়েছে যার সকল ড্যাটার গুরুত্ব শত শত বছরের থেকেও বেশি। ওয়ার্নার ব্রাদার্স বা এরকম অন্য সকল প্রোডাকশন হাউজ যখন কোনো মিডিয়া প্রোডিউস করে, তখন সেটা সংরক্ষণ করার চিন্তা শুধু ২০ বছর বা ৫০ বছরের নয়, বরং শত শত বছরের হয়ে থাকে। কারণ স্বাভাবিকভাবেই শত বছর আগে তৈরি করা কোনো সিনেমা মানুষ সামনের আরও শত শত বছর দেখবে বা জেনারেশনের পর জেনারেশন সংরক্ষণ করে রাখবে। এই দীর্ঘ ড্যাটা সংরক্ষণের জন্য ডিজিটাল স্টোরেজ কোনোভাবেই উপযোগী নয়। যার দরুন প্রোডাকশন হাউজগুলো তাদের সকল মিডিয়া কন্টেন্ট এখনো অ্যানালগ স্টোরেজ বা ম্যাগনেটিক রিলে রাইট করে অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সংরক্ষণ করে আসছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় রয়েছে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের দীর্ঘমেয়াদী ড্যাটা আর্কাইভ বা তাদের সকল মিডিয়া কন্টেন্ট সংরক্ষণের সুরক্ষিত ও গোপন লাইব্রেরি। এই অত্যন্ত গোপনীয় আর্কাইভের ভল্টে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা (৩০-৪৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট) এবং ধুলা-ময়লাহীন পরিবেশে সংরক্ষিত আছে হাজার হাজার ম্যাগনেটিক রিল। বর্তমান সময়ে যদিও সকল কন্টেন্ট ডিজিটালভাবে রেকর্ড করা, কয়েক বছর আগেও সব ধরনের

সিনেমা বা সিরিজ ফিল্ম ক্যামেরায় ধারণ করা হতো। এই লাইব্রেরিতে রয়েছে সেসব ফিল্মের কালেকশন। প্রজেক্ট সিলিকার জন্য ওয়ার্নার ব্রাদার্সের যে কন্টেন্টটিকে বাছাই করা হয়, সেটা হলো ১৯৭৮ সালের 'সুপারম্যান' মুভি। ২২ রিল ফিল্মের এই বিশাল সিনেমাকে মাত্র একটি ৭৫x৭৫ মিলিমিটার কাচের শিটে রাইট করা হয়। প্রথম প্র্যাক্টিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে এই সিনেমাকে সিলেক্ট করার কারণ হলো ৪০-এর দশকে 'সুপারম্যান রেডিও শো'-কে গ্লাস রেকর্ডে আর্কাইভ করা হয়েছিল। প্রজেক্ট সিলিকায় সুপারম্যানের প্রায় ৭৬ গিগাবাইট রাইট করা হয়, সেই সাথে এতে আরও অতিরিক্ত ৩০ গিগাবাইট রাইট করা হয় এরর রিডানডেন্সি হিসেবে, যাতে করে কোথাও কোনো সমস্যা হলেও সম্পূর্ণ মুভিকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়।

অবাক করার মতো হলেও সত্য যে, এখনো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে মিডিয়া স্টোরেজের গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড হলো ফিল্ম রিল। কিন্তু এই ফিল্ম রিলগুলোকে দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করার জন্য তাদেরকে বড়ো বড়ো ভল্টে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় রাখা হয়। ফিল্মের অসুবিধা হলো সরাসরি সূর্যের আলোতে এটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পালসের ফলে (মাইক্রোওয়েভ) এতে রক্ষিত তথ্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ফিল্ম পানিতে ভিজলে নষ্ট হতে পারে। আবার বেশি তাপ বা আগুনেও নষ্ট হয়ে যায়। আবার সেই সাথে এক একটি মুভিকে ধারণ করতে একাধিক রিলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রজেক্ট সিলিকা বা কাচে এতসব সমস্যার একটিও নেই। ফিল্ম লাইব্রেরিতে অগ্নি-নির্বাপক হিসেবে পানি ব্যবহার করা যায় না কিন্তু পানি কাচের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। উচ্চ বা নিম্ন তাপমাত্রাতেও কাচের গাঠনিক বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। যার ফলে অতিরিক্ত খরচ করে লাইব্রেরিতে টেম্পারেচার কন্ট্রোল করার কোনো দরকার নেই। ওয়ার্নার ব্রাদার্সের মতে, এটি এমন একটি প্রযুক্তি যা সত্যিকার অর্থে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে দীর্ঘমেয়াদী ড্যাটা সংরক্ষণে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে।

অবশ্য ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি প্রজেক্ট সিলিকার কেবলএকটি বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্র। একইভাবে যেসব জায়গায় কাগজে তথ্য সংরক্ষণ করা হয় (বিভিন্ন দলিল বা নথিপত্র), সেখানেও প্রজেক্ট সিলিকা ভূমিকা রাখতে পারে। ৭৫x৭৫ মিলিমিটার আকারে প্রায় ১০০ গিগাবাইট রাইট করা হয়েছে, যা একটি সাধারণ মেমোরি কার্ডের তুলনায় আকারে অনেক বড়ো, কিন্তু ধারণ ক্ষমতায় অনেক ছোটো। তাহলে মনে হতে পারে, এর সুবিধা কোথায়? কিন্তু সিনেমার ২২টি রিলের সাথে যদি তুলনা করা হয় বা প্রতিষ্ঠানের বড়ো বড়ো ফাইল বা খাতার সাথে যদি তুলনা করা হয়, তাহলে এটি অনেক ছোটো এবং অনেক বেশি সুবিধার।

আর অবশ্যই, এর প্রধান উদ্দেশ্য- ক্লাউড স্টোরেজ। বর্তমানে প্রজেক্ট সিলিকা রিসার্চ স্টেইজে আছে। গবেষকরা এর রিড-রাইট স্পিড বৃদ্ধি এবং একে আরও উন্নত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। কেমব্রিজ রিসার্চ ল্যাবে এই প্রজেক্টের সাথে কাজ করার জন্য যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীদের মাইক্রোসফট বিভিন্ন পদে ইন্টার্নশিপ ও পোস্ট-ডক্টরিয়াল রিসার্চেরও সুযোগ দিচ্ছে। প্রজেক্ট সিলিকার পাশাপাশি ডিএনএ স্টোরেজ সিস্টেমেও গবেষণা চলছে।

এখানে ৫ডি বা 5-dimensional আসলে কোনো ৫ম মাত্রার কিছু না। এটা মুলত কাচের মধ্যে ডেটা সংরক্ষণের একটি পদ্ধতি। তাছাড়া এটি বিপণনের উদ্দেশ্যে বেশি ব্যবহৃত হয় যেহেতু ডিভাইসের ৩টি ফিজিকাল মাত্রা রয়েছে এবং কোনও উচ্চতর মাত্রিক বৈশিষ্ট্য নেই। এবং এর ডেটা স্টোরেজের ফ্র্যাক্টাল/হলোগ্রাফিক প্রকৃতিও নিখুঁতভাবে ত্রিমাত্রিক। কোনো পঞ্চম মাত্রিক কিছু না। যদিও এটা বিজ্ঞানের কল্পকাহিনির মতো শোনাতে পারে তবে এটি মূলত একটি অভিনব অপটিক্যাল ইলুশন। এক্ষেত্রে, ডিস্কে অভ্যন্তরের ৫টি মাত্রা হলো ন্যানোস্ট্রাকচারের ত্রিমাত্রিক অবস্থানের সাথে সম্পর্কিত আকার এবং ওরিয়েন্টেশন। আলাদা কোনো মাত্রা নেই।

এটাকে ৫ডি বা ৫-মাত্রিক বলার পেছনে অর্থপূর্ণ কারণ হল যে একটি অপটিক্যাল ডিস্কের মধ্যে ডেটা ইমেজ রিডিং নির্ভর করে এর দিতে দেখার কোণের ওপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ একে বিভিন্ন কোণ থেকে দেখলে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়।
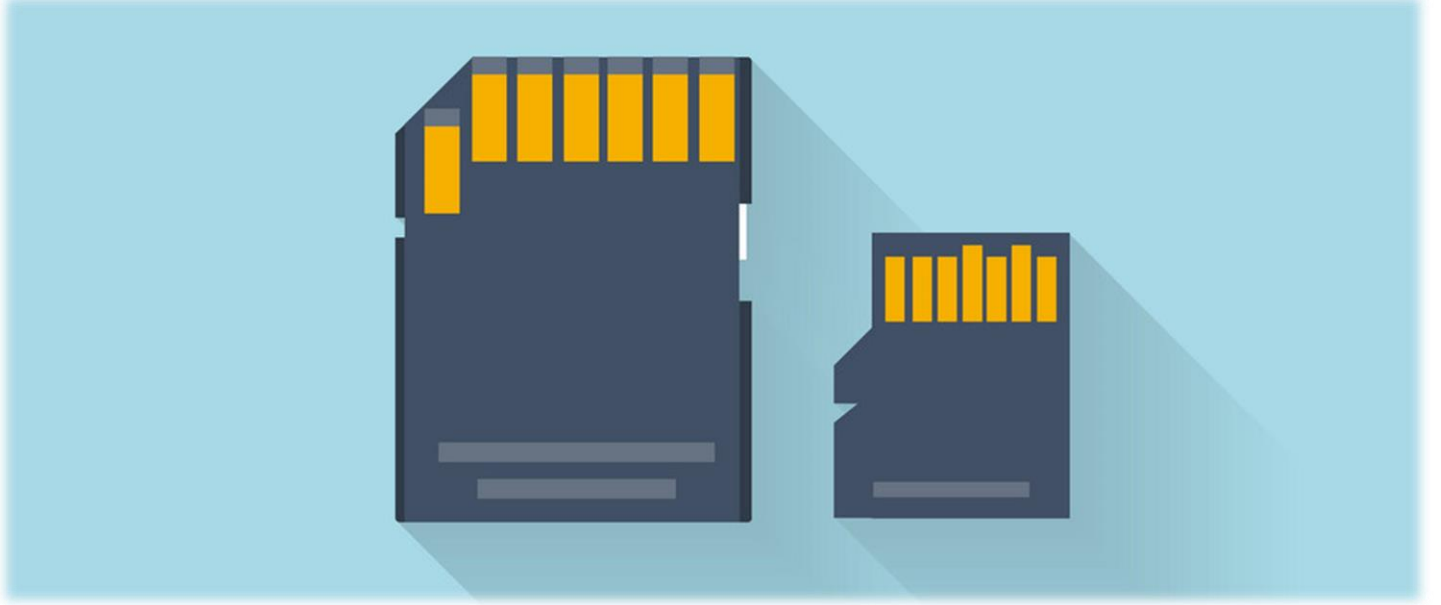
মেমোরি কার্ড বা এসডি কার্ড

রওনক শাহরিয়ার

এসডি কার্ড, মাইক্রো এসডি কার্ড স্টোরেজ হিসেবে দুই যুগের বেশি সময় ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সময়ের সাথে বিভিন্ন আকৃতির কার্ডগুলোর আকার কমেছে, ডেটা স্টোরেজ বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে স্ট্যান্ডার্ড একটা আকৃতিতে এসেছে। কিন্তু এই ছোট্ট একটা মেমোরি কার্ডে কীভাবে এত এত ডেটা কোনো ইলেকট্রিক ব্যবস্থা ছাড়াই সংরক্ষণ করা যায়, আবার প্রয়োজনমতো ডেটা ট্রান্সফার ও ডিলিট করা যায়?

যখন আমরা কম্পিউটারে কোনো ডেটা নিই, সেটা আসকি **(ASCII–American Standard Code for Information Interchange)** কোডে কনভার্ট হয়ে যায়। কম্পিউটার মূলত ০ (শূন্য) ও ১ (এক) ছাড়া কোনো কিছু বোঝে না। ডেটা প্রসেসিং, স্টোর-সহ সবকিছু এই ০ ও ১ দিয়ে হয়ে থাকে।

মেমোরি কার্ডে একটা মাইক্রোচিপ থাকে। চিপে ০/১ স্টোর করার জন্য দরকার সুইচ। কারণ ডেটা সবসময় ০ বা ১ অথবা অন বা অফে স্টোর হয়ে থাকে। মাইক্রোচিপের সুইচে থাকে অসংখ্য ছোটো ছোটো ট্রান্সজিস্টর। এই ট্রান্সজিস্টরগুলো যেভাবে কাজ করে:

একটা সাধারণ ট্রান্সজিস্টরে থাকে তিনটা সোর্স। একটি হলো সোর্স, যেটা দিয়ে কারেন্ট আসে; আরেকটা হলো ড্রেইন, যেটা কারেন্ট বের হওয়ার পথ; আরেকটা হলো গেট, যেটা নির্ধারণ করে কারেন্ট গেটে যাবে কি না। এখানে গেট অন মানে কারেন্ট যাওয়ার পথ থাকে বা ১ এবং অফ মানে লো ভোল্টেজের কারেন্ট বা ০। সমস্যা হলো: যদি এটা কোনো বৈদ্যুতিক সোর্সের সাথে কানেক্টেড না থাকে, তবে আউটপুট লো থাকবে বা ডেটা সব নাই হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু ডেটা এতে স্টোর থাকে কীভাবে?

মেমোরিতে সেজন্য আলাদা ধরনের ট্রান্সজিস্টর ব্যবহার করা হয়, যার নাম '**MOSFETs**' (মসফেটস)। মসফেটস একটি আলাদা ধরনের ট্রান্সজিস্টর, যেখানে গেট থাকে দুইটা। একটি হলো কন্ট্রোল গেট, অন্যটি ফ্লোটিং গেট। গেট খোলার পর যখন পজিটিভ চার্জ আসে, তখন সোর্স থেকে ড্রেইন পর্যন্ত চার্জ প্রবাহিত হয় এবং কিছু কারেন্ট ফ্লোটিং গেটের ওপরে জমা হয়। এখন মেমোরি কার্ড খুলে রাখলেও ডেটা সেখানে স্টোর থাকে এবং পরবর্তীতে ডিভাইসে প্রবেশ করালে স্টোর চার্জ থেকে আবার তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়। কম্পিউটারে প্রবেশ করালে অন-অফ ট্রান্সজিস্টর দেখে কম্পিউটার ০/১ নির্ধারণ করে এবং ডেটা পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করে।

তবে ডিলিট করার সময় কী হয়?

মেমোরি থেকে কোনো ফাইল ডিলিট হলে ওই কন্ট্রোল গেটে নেগেটিভ চার্জ প্রয়োগ করা হয়, ফ্লোটিং গেটের ওপর আটকে থাকা ইলেকট্রন বের হয়ে যায় এবং ট্রান্সজিস্টর ফাঁকা হয়ে যায়।
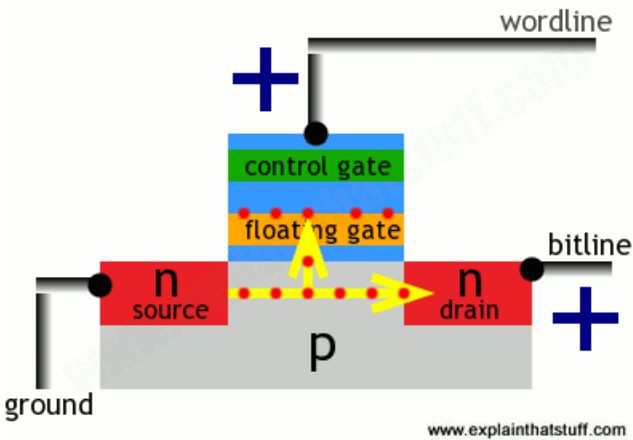
বর্তমানের মেমোরিগুলোতে কয়েকশ বিলিয়ন এবং 40 ন্যানোমিটারের নিচের ট্রান্সজিস্টর ব্যবহার করা হয়। এগুলো মিলিয়ন থেকে ১০ কোটি বার রিড-রাইটের ক্ষমতা রাখে। মেমোরি কার্ডের ওপরের অংশ একটা শক্ত আবরণ দ্বারা সুরক্ষিত থাকে এবং এতে **৮টি পিন** থাকে ডেটা ট্রান্সফারের জন্য। এই ট্রান্সজিস্টরের গতি কিন্তু সবসময় এক রকম নয়। নিচে মেমোরির এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো:

এখন মেমোরির ওপরে লক্ষ করলে বিভিন্ন ধরনের লেখা পাওয়া যায়। লেখাগুলো মূলত মেমোরির মান, ধরন ও স্পিড-সহ বিভিন্ন বিষয় বোঝায়।

মাইক্রো এসডি কার্ড চার ধরনের হয়। এগুলো মূলত মেমোরি কত বড়ো সাইজের হতে পারে তা বোঝায়।

আর মাইক্রো এসডি স্ট্যান্ডার্ড বাদে বাকিগুলো ডিভাইস কম্প্যাটিবিলিটি ভালো না হলে ভালো কাজ করে না।

Micro Sd standard: এই ধরনের মেমোরি কার্ড ২ জিবি পর্যন্ত হতে পারে এবং FAT12 ও FAT16 ফাইল ব্যবহার করা হয়।

Micro SDHC standard: এই ধরনের মেমোরি কার্ড ২-৩২ জিবি পর্যন্ত হতে পারে এবং FAT32 ফাইল সিস্টেম ব্যবহার করা হয়।

SDXC standard: এই ধরনের মেমোরি কার্ড ৩২ জিবি-২ টেরাবাইট পর্যন্ত হতে পারে এবং exFAT ফাইল সিস্টেম ব্যবহার করা হয়।

SDUC standard: এই ধরনের মেমোরি কার্ড ২-১২৮ টেরাবাইট পর্যন্ত হতে পারে এবং এতেও exFAT ফাইল সিস্টেম ব্যবহার করা হয়।

মেমোরির ওপরে বিভিন্ন ক্লাস নির্দেশ করা থাকে। এই ক্লাস বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

Class 2: এই ধরনের মেমোরি কার্ডে কমপক্ষে ২ মেগাবাইট/সেকেন্ড রাইট স্পিড পাওয়া যায়।

Class 6: এই ধরনের মেমোরি কার্ডে কমপক্ষে ৬ মেগাবাইট/সেকেন্ড রাইট স্পিড পাওয়া যায়।

Class 10: এই ধরনের মেমোরি কার্ডে কমপক্ষে ১০ মেগাবাইট/সেকেন্ড রাইট স্পিড পাওয়া যায়।

এর সাথে সম্পর্ক থাকে UHS স্ট্যান্ডার্ডের। এখানে তিন ধরনের মেমোরি পাওয়া যায়।

UHS-1: এই ধরনের মেমোরি কার্ডে কমপক্ষে ১০ মেগাবাইট/সেকেন্ড রাইট স্পিড পাওয়া যায়।

UHS-2: এই ধরনের মেমোরি কার্ডে কমপক্ষে ২০ মেগাবাইট/সেকেন্ড রাইট স্পিড পাওয়া যায়।

UHS-3: এই ধরনের মেমোরি কার্ডে কমপক্ষে ৩০ মেগাবাইট/সেকেন্ড রাইট স্পিড পাওয়া যায়।

এবারে আসা যাক অ্যাপস বা গেমস পারফরম্যান্স নিয়ে, যা দুই ধরনের হয়ে থাকে।

Class-1 (A-1): এই ধরনের মেমোরিতে রিড 1,500 iops এবং রাইট 500 iops পর্যন্ত হতে পারে।

Class-2 (A-1): এই ধরনের মেমোরিতে রিড 4,000 iops এবং রাইট 2,000 iops পর্যন্ত হতে পারে।

মেমরি কার্ডে ভিডিয়ো রাইট স্পিড ক্লাস নির্দিষ্ট থাকে। কয়েকটি ক্লাস হলো:

V-10: এই মেমোরি কার্ডে রাইট স্পিড কমপক্ষে ১০ মেগাবাইট/সেকেন্ড, যা সাধারণ ভিডিয়ো রেকর্ড করতে সক্ষম।

V-30: এই মেমোরি কার্ডে রাইট স্পিড কমপক্ষে ৩০ মেগাবাইট/সেকেন্ড, যা full HD/4K ভিডিয়ো ধারণে সক্ষম।

মেমোরি কার্ডের একটা সুবিধা হলো: কোম্পানিগুলো আগে থেকে কার্ডের রিড ও রাইট স্পিড উল্লেখ করে দেয়। তবে এইগুলো স্ট্যান্ডার্ড ইনভারমেন্ট টেস্টের ফলাফল। কোন ডিভাইসে কোন মেমোরি কার্ড ব্যবহার করা হচ্ছে, পিসিতে কেমন কার্ড রিডার ব্যবহার করা হচ্ছে বা ডেটা কেবল কোনটা ব্যবহার করা হচ্ছে, এমন অনেক বিষয়ই রাইট এবং রিড স্পিডের কম-বেশি করে।

পৃথিবীর প্রথম ওয়েব পেইজ তৈরি হয়েছিল সার্ন এ।

মূলত সাধারণ মানুষকে World Wide Web নিয়ে ধারণা দিতেই এই সাদাসিধে সাইট তৈরি। NeXT কম্পিউটারে রান করা এ ওয়েবসাইটে এখনো ভিজিট করা যায়।

https://go.bangachi.com/www

ওয়াই-ফাই: একবিংশ শতাব্দীর সেরা ইন্টারনেট অ্যাক্সেস গেটওয়ে

জহির রাহাত

বর্তমান বিশ্বে ওয়াই-ফাই-এর নাম শোনেননি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আপনি কফি শপ, রেস্তোরাঁ, লাইব্রেরি, অফিস, বাস, রিসোর্ট, বার – যেখানেই যান না কেন, প্রথম এক ঘণ্টার মধ্যেই অধিকাংশ মানুষ ওয়াই-ফাই-এর পাসওয়ার্ড খুঁজে বেড়াবে। আমাদের সভ্যতার অগ্রগতির সাথে মিশে গেছে ইন্টারনেট, আর সেই ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করার সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম হচ্ছে ওয়াই-ফাই।

ধারণা করা হয়, ২০২৬ সালের মধ্যে প্রায় ২২.২ বিলিয়ন ডিভাইস ওয়াই-ফাই-এর মাধ্যমে ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত থাকবে। এত জনপ্রিয় একটা মাধ্যম বা গেটওয়ে কীভাবে কাজ করে সেটা নিয়ে অনেকেরই কৌতূহল থাকতে পারে। তো চলুন জেনে নেওয়া যাক এই যুগান্তকারী আবিষ্কার ওয়াই-ফাই-এর খুঁটিনাটি।

ওয়াই-ফাই আসলে কী?

নেদারল্যান্ডে জন্ম Wi-Fi-এর পূর্ণরূপ হিসেবে Wireless Fidelity ব্যবহার করা হলেও এটি আসলে IEEE 802.11x (x বিভিন্ন ভার্সনে বিভিন্ন) টার্ম হিসেবে ট্রেডমার্ককৃত। এর আসলে কোনো পূর্ণরূপ নেই এবং কখনও ছিল না। আমাদের বহুল পরিচিত WLAN (Wireless Local Area Network)-এরই খানিকটা আপগ্রেডেড সংস্করণ হচ্ছে ওয়াই-ফাই। ওয়াই-ফাই রেডিয়ো ফ্রিকোয়েন্সির সাহায্যে একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে থাকা ডিভাইসগুলোর মধ্যে যোগাযোগ বা তথ্য আদান-প্রদান করে থাকে। তবে, এই কাজের জন্য দরকার হয় একটা রাউটার, যা এই ওয়াই-ফাই গেটওয়েকে সাপোর্ট করে। ওয়াই-ফাই বিশেষত DSL, cable বা LTE সিগন্যাল আদান-প্রদান করে থাকে।

এখানে একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে, ওয়াই-ফাই নিজে কিন্তু ইন্টারনেট অ্যাক্সেস দেয় না। ওয়াই-ফাই হচ্ছে একটা গেটওয়ে বা মাধ্যম, যার দ্বারা একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে কিছু ডিভাইস একত্রে সংযুক্ত থাকতে পারে। ওয়াই-ফাই হচ্ছে তারবিহীন কানেকশন, সাধারণত ওয়াই-ফাই-এর মাধ্যমে ডিভাইসগুলো কোনো অ্যাক্সেস পয়েন্টের (রাউটার) সাথে যুক্ত হয়, যা কিনা পরবর্তীতে ইন্টারনেট কানেকশন দেয়।

কোনো ডিভাইস ওয়াই-ফাই কম্প্যাটিবল-এর মানে বোঝায় সেটা ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কিং-এর একটা বিশেষ স্ট্যান্ডার্ড (802.11) মেনে চলে, আর সেই ডিভাইস যে-কোনো ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কেই কাজ করতে সক্ষম।
আজ থেকে ৩০ বছর আগে, ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বরে জন্ম নেওয়া এই গেটওয়ে ধীরে ধীরে জয় করতে সক্ষম হয়েছে গোটা ইন্টারনেট দুনিয়া।

ওয়াই-ফাই কীভাবে কাজ করে?

আগেই বলেছি, ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক এবং ওয়াই-ফাই ডিভাইস রেডিয়ো ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে কমিউনিকেট করে। সাধারণত এই ফ্রিকোয়েন্সির পরিমাণ হয় ২.৪ অথবা ৫ গিগা-হার্টজ। এই ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এটা সাধারণ মোবাইল, টেলিভিশন, বা ওয়াকিটকিতে ব্যবহৃত ফ্রিকোয়েন্সির চেয়ে বেশি হয়, ফলে এই সিগন্যাল তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণ তথ্য পরিবহন করতে পারে, আর তথ্য পরিবহনে বিঘ্ন ঘটে না। ২.৪ গিগাহার্টজ এবং ৫ গিগাহার্টজ ওয়াই-ফাই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ব্যাঙাচির আগামী পৃষ্টাতে নজর রাখুন।

একটা ওয়াই-ফাই গেটওয়ে পরিচালনার সময় মূলত ৩ ধাপে ঘটনাটা ঘটে থাকে।
১. একটা ওয়্যারলেস অ্যাডাপ্টর ডেটা বা তথ্যকে রেডিয়ো সিগন্যালে রূপান্তর করে এবং অ্যান্টেনার সাহায্যে একটা রেঞ্জের মধ্যে সেই ডেটাগুলোকে ছড়িয়ে দেয়। এই রেঞ্জ বা পরিধিকে আমরা আদর করে 'ওয়াই-ফাই হটস্পট' নামে ডাকি।
২. একটা রাউটার সেই সিগন্যাল রিসিভ আর ডিকোড করে।
৩. সেই রাউটার এবার তথ্যগুলোকে ইথারনেট কেবলের মাধ্যমে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়।

ওয়াই-ফাই এর বিবর্তন

ওয়াই-ফাই-এর যাত্রা শুরু ১৯৯০ সালে। এ পর্যন্ত ধাপে ধাপে অনেকবার এই টেকনোলজি আপডেটেড হয়েছে। আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ওয়াই-ফাই-এর উল্লেখযোগ্য ক্রমোন্নয়নগুলো নিচে দেওয়া হলো:

IEEE 802.11 : এটা হচ্ছে একদম বেসিক লেভেলের কানেকশন এবং সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত ওয়্যারলেস স্ট্যান্ডার্ড মডেল। ১৯৯৭ সালে উদ্ভাবিত এই মডেল দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ১ মেগাবাইট গতিতে ডেটা পরিবহন করা যায়। এর পরে যত আপডেট এসেছে, সব এই বেসিক মডেলের ওপরেই কাজ করে।

IEEE 802.11b: ১৯৯৯ সালে ডেভেলপ হওয়া এই মডেলে দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ১১ মেগাবাইট গতিতে ডেটা পরিবহন করা যায়। এই মডেল ডেটা পরিবহনের জন্য ২.৪ গিগা-হার্টজ় ফ্রিকোয়েন্সির রেডিয়ো ওয়েভ ব্যবহার করে থাকে।

IEEE 802.11g: এই মডেলও ডেটা পরিবহনের জন্য ২.৪ গিগাহার্টজ় ফ্রিকোয়েন্সির রেডিয়ো ওয়েভ ব্যবহার করে থাকে। তবে এই মডেল প্রতি সেকেন্ডে সর্বোচ্চ ৫৪ মেগাবাইট গতিতে ডেটা ট্রান্সফার করতে সক্ষম। এই মডেল গঠন করা হয় ২০০৩ সালে।

IEEE 802.11n: অনেকে ২০০৯ সালে উদ্ভাবিত এই মডেলকে Wi-fi 4 নামেও চিনে থাকবেন। এই মডেল প্রতি সেকেন্ডে সর্বোচ্চ ৬০০ মেগাবাইট গতিতে ডেটা ট্রান্সফার করতে সক্ষম। তাছাড়াও এই মডেল ডেটা ট্রান্সফার করার জন্য ২.৪ এবং ৫ গিগাহার্টজ় ফ্রিকোয়েন্সির রেডিয়ো ওয়েভ ব্যবহার করতে পারে।

IEEE 802.11ac: আমাদের আজকের সময়ে আমরা অধিকাংশ মানুষ যে ওয়াই-ফাই ব্যবহার করি, এটা সেই মডেল। ২০১৩ সালের শেষ দিকে উদ্ভাবিত এই মডেল ৫ গিগা-হার্টজ় ফ্রিকোয়েন্সির রেডিয়ো ওয়েভ ব্যবহার করে, আর প্রতি সেকেন্ডে ১,৭৩৩ মেগাবাইট গতিতে (৪ অ্যান্টেনার রাউটার লাগবে) ডেটা পরিবহন করতে সক্ষম। এই মডেলের আরেক নাম হচ্ছে Wi-fi 5 ।

IEEE 802.11ax: এটা হচ্ছে সবচেয়ে আপডেটেড ভার্সন। বাফার ফ্রি ভিডিয়ো, ল্যাগবিহীন গেমিং, ব্যাটারির আয়ুবর্ধন, বেশি সংখ্যক কানেক্টেড ডিভাইস, ফাস্ট (৬০%) ডেটা ট্রান্সফার,

হোম এক্সপেরিয়েন্সের উন্নয়ন এবং আরও অনেক চমকপ্রদ ফিচার নিয়ে খুব জলদি আমাদের মাঝে চলে আসবে নতুন এই আপডেটেড মডেল।

শেষকথা

সারা বিশ্ব আস্তে আস্তে ইন্টারনেট নির্ভর হয়ে পড়ছে। সাথে সাথে আমাদের ডেটা পরিবহনের খাতেও এসেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। টেকনোলজির কল্যাণে আজ আপনি ঘরে বসেই আপনার স্মার্টফোনে/পিসিতে/ট্যাবলেটে **ব্যাঙাচি**'র PDF বিনামূল্যে ডাউনলোড করে এই লেখাটি কোনো রকমের বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই পড়তে পারছেন; তাই এই টেকনোলজির ক্রমাগত উন্নয়নে যে-সব নিবেদিতপ্রাণ মানুষ তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে যাচ্ছেন দিনের পর দিন, তাঁদের সবার প্রতি রইল অগাধ শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে লেখা শেষ করছি।

গুগল ফ্যাক্ট

প্রতিদিন গুগলে সার্চ করা হয় প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন বার।

এবং মোট সার্চের ৯২% মার্কেট শেয়ার তাদের।

২০২০ এর টপ ট্রেন্ডিং সার্চ ছিল 'corona virus'।

গুগল লেন্সে ১ বিলিয়নের বেশি বার ব্যবহার করা হয়।

কেনার আগে অর্ধেকের বেশি প্রডাক্ট গুগলে সার্চ করা হয়।

ইউটিউবে প্রতি মিনিটে ১০০ ঘন্টার সমপরিমাণ ভিডিয়ো আপলোড করা হয়।

ব্রাউজার কুকি কী এবং কেন?

অনিন্দিতা ঘোষ

ওয়েবসাইট ব্রাউজ করা সময় অনেক ওয়েবসাইটই পারফর্মেন্স ভালো করার জন্য কুকি পারমিশন চায়, যেটাকে HTTP cookie বা ব্রাউজার কুকি বলে। এখন প্রশ্ন হলো – ব্রাউজার কুকি কী জিনিস? এই কুকি কি খাওয়া যায়?

নামটা কুকি হলেও এই কুকি আমাদের খাওয়ার কুকি বা বিস্কুট নয়। প্রকৃতপক্ষে, ব্রাউজার কুকি (cookie) হচ্ছে একগুচ্ছ ছোট্ট ডেটা। আপনি যখন বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ব্রাউজিং করে বেড়ান, তখন আপনার ওয়েব ব্রাউজার আপনার ডিভাইসে কিছু ডেটা সংরক্ষণ করে রাখে, এটাই ব্রাউজার কুকি। এর প্রকৃত নাম 'এইচটিটিপি কুকি' (HTTP cookie)। এছাড়া এটি ওয়েব কুকি, ইন্টারনেট কুকি ইত্যাদি নামেও পরিচিত।

কুকি কোনো ওয়েবসাইটে আপনার অ্যাক্টিভিটি, বিভিন্ন ব্যক্তিগত তথ্য, যেমন: নাম, ঠিকানা, ইউজার নেইম, পাসওয়ার্ড, ক্রেডিট কার্ডের নাম্বার ইত্যাদি সংরক্ষণ করে রাখে এবং এর সাহায্যে আপনাকে বিভিন্ন সেবা দিতে পারে। একটা কুকির সাইজ ৪,০৯৬ বাইট পর্যন্ত হতে পারে।

কুকি আপনার কী কাজে লাগে দেখা যাক:

ধরি, আপনি ব্রাউজারের মাধ্যমে ফেইসবুকে লগ ইন করলেন। এরপর লগ আউট না করেই বেরিয়ে গেলেন। পরবর্তীতে আপনি একই ব্রাউজার দিয়ে ঢুকলে আপনাকে আর নতুন করে লগ ইন করতে হবে না, লগ ইন ছাড়াই ঢুকতে পারবেন। এই কাজটা কুকির

মাধ্যমেই সম্ভব হয়, যাকে বলে অথেন্টিকেশন কুকি (authentication cookie)।
আবার ধরি, আপনি ফেইসবুক থেকে লগ আউট করে চলে গেলেন। পরবর্তীতে ফেইসবুকে ঢুকতে গেলে আপনাকে আবার পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করতে হবে, না হলে ঢুকতে পারবেন না। সুতরাং কুকি যদি না থাকত, তাহলে যে-কেউ আপনার অ্যাকাউন্টের অ্যাকসেস পেয়ে যেত।

আবার কিছু ওয়েবসাইটে দেখা যায়, আপনি কোনো লিঙ্কে ঢুকলে পরবর্তীতে ওই লিঙ্কের রঙ নীল থেকে বেগুনি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কুকির মাধ্যমে সাইটটি জানতে পারে যে আপনি কোন কোন লিঙ্কে প্রবেশ করেছেন, আর কোন কোন লিঙ্কে প্রবেশ করেননি যেটা উইকিপিডিয়া বা আমাদের ব্যাঙাচির অনলাইন আর্কাইভ bangachi.com এ এরকমটা খেয়াল করতে পারবেন। এছাড়া অনেক সাইটে দেখা যায়, একবার কোনো ফর্ম পূরণ করলে পরেরবার ওই ফর্ম আপনাআপনিই পূরণ হয়ে যায়। একে অটো-ফিল (auto-fill) বলে। এই অটো-ফিলের জন্য কুকির প্রয়োজন হয়। কুকির মাধ্যমে পূর্ববতী ফর্মের তথ্যগুলো সংরক্ষিত থাকে এবং পরেরবার ওই তথ্য দিয়ে অটোমেটিক ফর্ম পূরণ করে ফেলে।

তবে কুকির মাধ্যমে যেমন আপনি সুবিধা পাচ্ছেন, তেমনি এই কুকি আপনার জন্য বিপজ্জনকও হতে পারে। এর জন্য দায়ী হলো থার্ড-পার্টি কুকি (third-party cookie)।

সাধারণত কোনো ওয়েবসাইটের কুকির তথ্য ব্যবহারের অধিকার থাকে শুধু ওই সাইটেরই। একে বলে ফার্স্ট-পার্টি কুকি (first-party cookie)। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে কুকি ব্যবহারের অধিকার ওই সাইট ছাড়াও অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষের হাতে থাকে। একেই বলে থার্ড-পার্টি কুকি। এধরনের কুকি সাধারণত বিজ্ঞাপন দেখাতে ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য তৃতীয় পক্ষের হাতে চলে যায় এবং এর ভিত্তিতে তারা আপনাকে আপনার পছন্দসই পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখায়। এতে করে আপনার প্রাইভেসি নষ্ট হতে পারে। এছাড়াও থার্ড-পার্টি কুকির মাধ্যমে হ্যাকাররা আপনার ব্যক্তিগত তথ্য পেয়ে যেতে পারে এবং আপনার ক্ষতি করতে পারে।

থার্ড-পার্টি কুকি থেকে প্রাইভেসি নষ্ট হওয়া বন্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-সহ অনেক দেশ আইন প্রণয়ন করেছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আইন অনুযায়ী, কোনো ওয়েবসাইট কুকি ব্যবহার করতে চাইলে আগে ব্যবহারকারীর অনুমতি নিতে হবে।

অ্যাপলের সাফারি ব্রাউজারে ডিফল্টভাবেই থার্ড-পার্টি কুকি ব্লক করা থাকে। এছাড়া অন্য ব্রাউজারে সেগুলো ব্লকড থাকে না। তবে গুগল ক্রোমে আপনি ইচ্ছে করলে ব্রাউজার সেটিংসে গিয়ে থার্ড-পার্টি কুকি ব্লক করতে পারবেন। তাছাড়া কোনো ওয়েবসাইটকে কুকি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার আগে সাইটটির গুণাগুণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নেবেন।

সবশেষে বলা যায়, ব্রাউজার কুকির অনেক অসুবিধা থাকতে পারে এবং সচেতন না থাকলে বেশ সমস্যাতেও পড়তে হতে পারে। কিন্তু আধুনিক ওয়েব জগতকে কুকি ছাড়া কল্পনা করা যায় না।

জনপ্রিয় ওয়েব ব্রাউজার ফায়ারফক্সের লোগো আসলে কোনো ফক্স বা শিয়াল না। এই প্রাণীর নাম রেড পান্ডা।

২.৪ গিগাহার্টজ এবং ৫ গিগাহার্টজ ওয়াই-ফাই

রওনক শাহরিয়ার

ওয়াই-ফাই রাউটার কেনা বা পরিবর্তন করার সময় অনেকে কনফিউজড হয়ে যায়। ওয়াই-ফাই ফিচার, সিঙ্গেল বা ডুয়েল ব্যান্ড বা ট্রিপল ব্যান্ড-সহ কিছু বিষয় সামনে চলে আসে। রাউটার-এর ক্ষেত্রে সিঙ্গেল ব্যান্ড হলো 2.4 GHz ও ডুয়েল ব্যান্ড হলো 2.4 GHz 5 GHz-এর ওয়াই-ফাই। এক্ষেত্রে ট্রিপল ব্যান্ড রাউটার দুইটি 5 GHz এবং একটি 2.4 GHz ব্যান্ড ব্যবহার করে। এখন নম্বরগুলো দিয়ে আসলে কী বোঝায় এবং এর কাজ কী তা জেনে নেওয়া যাক।

ব্যান্ড কী?

ওয়্যারলেস রাউটার রেডিয়ো ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে ডিভাইস সংযুক্ত করে। 2.4 GHz এবং 5 GHz হলো ওয়াই-ফাই-এর দুইটা আলাদা ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড।
এদের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো – ব্যান্ডউইথ (ডেটা ট্রান্সফারের গতি) এবং সিগনালের সীমা। যদিও রাউটারের স্পিড ISP এর নির্ধারিত স্পিড প্রদান করে।

যদি ওয়াই-ফাই রাউটারের সেটিংসে যাওয়া হয়, তবে 'Channel' নামের শব্দটি চোখে পড়া স্বাভাবিক। বেশিরভাগ রাউটারে চ্যানেল অটো সেট করা থাকে। ওয়াই-ফাই-এর স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে সবগুলো 2.4 GHz সাপোর্ট করলেও, সর্বশেষ কয়েকটা শুধু 5 GHz সাপোর্ট করে। 2.4 GHz ব্যান্ড ১১টা আলাদা আলাদা চ্যানেলে ভাগ করা

থাকে, যার প্রতিটা 20 MHz। সেখানে 5 GHz ব্যান্ড-এ ৩৬ থেকে ১৬৫ পর্যন্ত চ্যানেল থাকে এবং 6 GHz ব্যান্ড-এ ১ থেকে ২৩৩ পর্যন্ত চ্যানেল থাকে। উভয় ফ্রিকোয়েন্সিই ২০–১৬০ MHz এর কাজ করে।

2.4 GHz চ্যানেল:

এই ২০২১ সালে এসেও 2.4 GHz প্রযুক্তি ব্যবহার সর্বক্ষেত্রে লক্ষণীয়। ২০১৩ সালে 802.11ac ব্যান্ড চালুর মাধ্যমে 5 GHz এর শুরু হয় এবং ২০২০-এ 802.11ax বা WIFI এর ৬ষ্ঠ জেনারেশন শুরু হয়। যদিও এখনও 2.4 GHz সুবিধাযুক্ত রাউটারের দাম, সীমা-সহ বিষয়গুলোর জন্য এখনও প্রচলিত।

ওয়াই-ফাই-এর সব স্ট্যান্ডার্ড 2400–2500 MHz ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে। এই 100 MHz ১৪টা আলাদা আলাদা চ্যানেলে বিভক্ত থাকে, যার প্রতিটা 20 MHz এর হয়ে থাকে এবং মাত্র ৩ চ্যানেল ওভারল্যাপ করে না। অন্য ১১টি চ্যানেল অন্তত দুইবার ওভারল্যাপ করে (ছবিতে দেখুন)।

এখানে ১, ৬ এবং ১১ নং চ্যানেলের দূরত্ব বেশি হওয়ায় একে অপরের সংস্পর্শে আসে না। বা ডেটা ট্রান্সফারের সময় একটি চ্যানেল ক্লিয়ার (২–৫, ৭–১০ এ) না হলে অন্যটা ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে না–যা বেশি ডিভাইস কানেকশনে ডেটা ট্রান্সফার রেট কমিয়ে দেয়।

আর 802.11n স্ট্যান্ডার্ড-এ 40 MHz চ্যানেল ব্যবহার করা যায়।
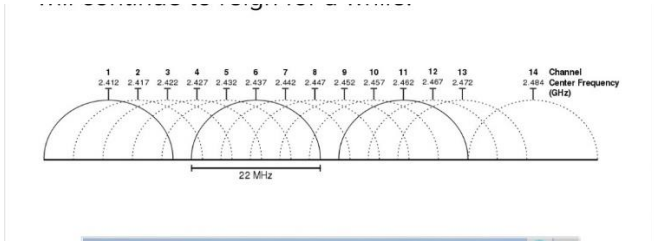
5 GHz চ্যানেল:

এবার 5 Ghz নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রথমেই আসা যাক এর পার্থক্য নিয়ে। 2.4 GHz-এ মাত্র ১১টি চ্যানেল সাপোর্ট করে, যেখানে 5 GHz ২০টি নন ওভারল্যাপিং চ্যানেল সাপোর্ট করে। 802.1n স্ট্যান্ডার্ড 2.4 GHz-এ 40 MHz চ্যানেল থাকে। সেখানে 402.11 ac তে 80 MHz, এমনকি 160 MHz বিস্তৃত চ্যানেল ব্যবহার করা সম্ভব। এখানে 20 MHz-এর দুটো চ্যানেল সংযুক্ত হয়ে 40 MHz তৈরি হয়, যেমনটা চিত্রের 36 ও 40 নং চ্যানেল মিলে 38 নং চ্যানেল তৈরি করেছে।

এভাবে দ্রুত ডেটা ট্রান্সফার করা যায় এবং অতিরিক্ত ডিভাইস সংযুক্ত করা সম্ভব। এছাড়াও Wi-Fi 6 আরও বেশি সুবিধা দিয়ে থাকে।

তবে ডিভাইস কানেকশনের জন্য কোন ব্যান্ড বেশি কার্যকরী?

এটা ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে। কারণ প্রতিটা ব্যান্ডেরই নিজস্ব কিছু সমস্যা আছে।

১. 2.4 GHz-এ ডেটা স্পিড কম, কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি কম হওয়ায় বেশি দূরত্বের কভারেজ দিতে সক্ষম, দেয়ালের বাধা খুব একটা সমস্যার কারণ হয় না। আর 5 GHz-এ ডেটা ট্রান্সফার রেট বেশি হলেও, কভারেজ কম দূরত্বের দেয়, কোনো বাধা আসলে নেটওয়ার্কে সমস্যা হয়।

২. প্রতিটা চ্যানেল সেইম ডেটা প্রেরণ করে। 2.4 GHz-এ চ্যানেল সংখ্যা কম হওয়ায় ইউজার ও ডেটা ট্রান্সফার রেট অনেক কম। সেখানে 5 GHz-এর বিপরীত।

৩. 2.4 GHz মাইক্রোওয়েভ, ব্লুটুথসহ অনেক ডিভাইসে ব্যবহার করা হয়। আবার রাউটারও সবার কাছে কমন। যদি ঘনবসতি এবং চারপাশে রাউটার বেশি দেখায় তবে 5 GHz ভালো অপশন। কারণ চ্যানেল সংখ্যা কম হওয়ায় ডেটা ট্রান্সফারে সমস্যা, এমনকি ওয়াই-ফাই ডিসকানেক্টেড হতে পারে। 5 GHz এখনও মানুষের মাঝে পরিচিতি না পাওয়ায় এবং চ্যানেল সংখ্যা বেশি হওয়ায় ডেটা ট্রান্সফারের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কম।

৪. তবে দূরত্ব ও ঘনবসতি বেশি না থাকলে 2.4 GHz ভালো অপশন।

৫. আর 5 GHz রাউটার এখনও প্রচলিত না হওয়ায় দাম বেশি। সে তুলনায় 2.5 GHz রাউটার অনেক সস্তা।
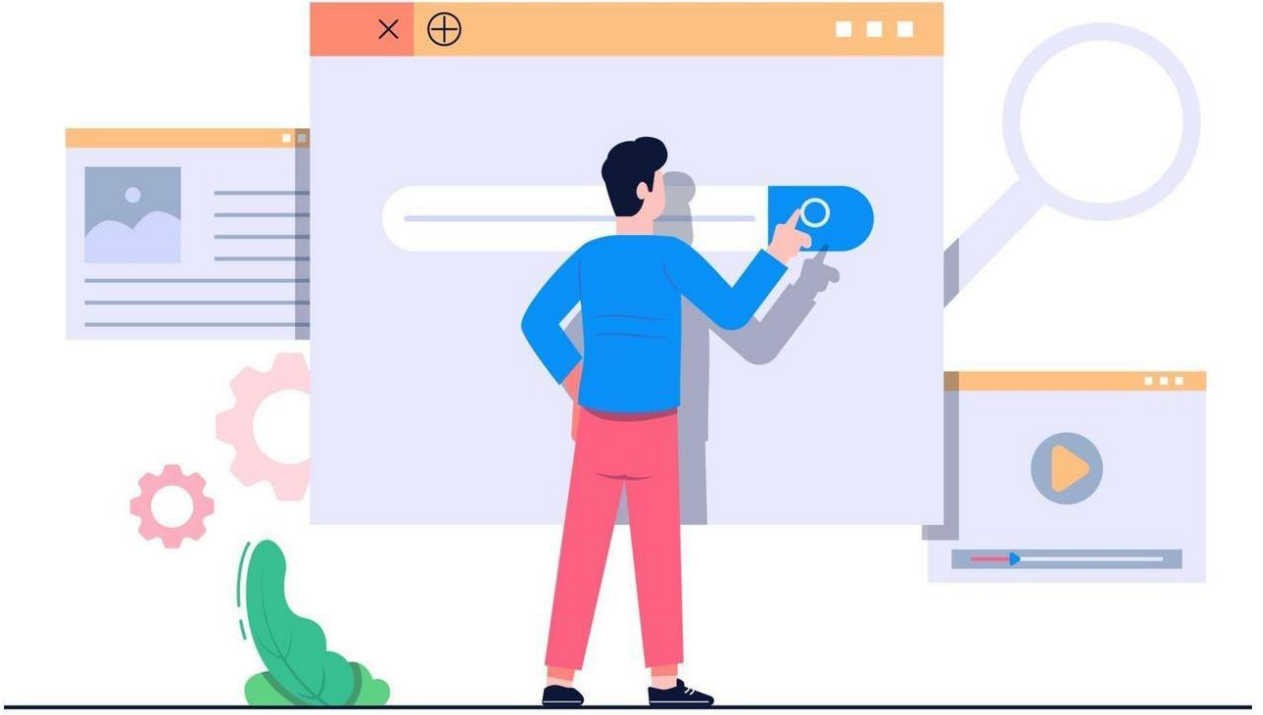
সার্চ ইঞ্জিন যেভাবে কাজ করে

রাজীব সূত্রধর

একটা অতি পরিচিত ঘটনা দিয়ে শুরু করা যাক।
একদিন হরেন জগেনকে জিজ্ঞেস করল, "বল দেখি, গুগল ছেলে না মেয়ে?"
জগেন এক সেকেন্ডও সময় না নিয়ে বলল, "মেয়ে, কারণ গুগল সব জানে।"

কৌতুকটা তেমন মজার ছিল না জানি। এসব রেখে এবার সত্যিকারের একটা প্রশ্ন করি। কখনো কি ভেবেছেন গুগল এতসব জানে কীভাবে? আর কীভাবেই বা এত জলদি প্রয়োজনীয় উত্তর হাজির করে আমাদের মোবাইল বা কম্পিউটারের স্ক্রিনে? চলুন একটু ভাবা যাক।

গুগলের কোনো নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা বা জ্ঞান নেই। তবে তার আছে মেমোরি স্টোর করে রাখার ক্ষমতা। পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে মানুষেরা ইন্টারনেটে এই তথ্যগুলো জমা করেছে যা সবার জন্যে বিতরণের কাজ করে চলেছে গুগল, বিং, বাইডু, ইয়ন্ডেক্স, ইয়াহুর মতো আরও অনেক সার্চ ইঞ্জিন। এবার প্রশ্ন হলো সার্চ ইঞ্জিন আসলে কী? চলুন এটা নিয়েও একটু ভাবা যাক, তবে ধাপে ধাপে।

সার্চ ইঞ্জিন হলো এমন একটা সিস্টেম যার মাধ্যমে ইন্টারনেটে থাকা বিভিন্ন তথ্য থেকে প্রশ্নকারীর প্রশ্ন অনুযায়ী নির্দিষ্ট উত্তর ক্রমানুযায়ী সাজিয়ে প্রদর্শন করা হয়। কয়েকটা মৌলিক সার্চ ইঞ্জিনের নাম হলো: Google, Bing, Baidu, Yandex ইত্যাদি। বাকিরা সবাই এদের থেকে সার্ভিস রেন্ট করে সার্চ ইঞ্জিন প্রভাইড করে। সব সার্চ ইঞ্জিনের কাজের পদ্ধতি মোটামুটি একই। আজকে আমাদের এই আর্টিকেলের মূল বিষয় এটাই যে কীভাবে সার্চ ইঞ্জিন কাজ করে।

পুরো বিষয়টা বোঝার জন্য চলুন একটা রাফ নোট করে নিই। এরপরে আমরা বিস্তারিতভাবে বোঝার চেষ্টা করব আসলে কীভাবে সার্চ ইঞ্জিন কাজ করে।

সার্চ ইঞ্জিনের মূলত তিনটা অংশ। যথা:
১. স্পাইডার সফটওয়্যার
২. ইনডেক্স সফটওয়্যার
৩. কুয়েরি সফটওয়্যার।

১. স্পাইডার সফটওয়্যার:
আমাদের মনে রাখতে হবে, সার্চ ইঞ্জিন কেবল অক্ষর/বর্ণ ছাড়া আর কিছু চিনে না।
স্পাইডার সফটওয়্যার ইন্টারনেটে থাকা বিভিন্ন ওয়েবসাইটের পেইজের ডেটা সংগ্রহ করে থাকে, তবে এর সীমাবদ্ধতাও আছে। এটা কেবল লেখা, লিংক এবং URL নিতে পারে। আলাদা ছবি, ভিডিয়ো এসব সে এড়িয়ে চলে যায়। এমনকি সেই ছবি/ভিডিয়োতে লেখা থাকলেও। এক্ষেত্রে সার্চে ছবি বা ভিডিয়ো পেতে হলে তা আপলোডের সময় নাম বা ওই লেখা 'Alt. tag'-এর ভেতরে রাখতে হয়। তখন নাম দেখে সার্চ ইঞ্জিন এই ছবি/ভিডিয়োর উপস্থিতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারে।

২. ইনডেক্স সফটওয়্যার:
স্পাইডার তার সংগ্রহ করা সব তথ্য মূলত জমা রাখে ইনডেক্সের কাছে। যেহেতু সব তথ্যই (শব্দ, লিংক, URL ইত্যাদি) বর্ণ, তাই এটা সার্চের সময় লেখার (Query) সাথে তার ডেটাবেজেরযে যে তথ্য মিলে যায় কেবল সেগুলোই প্রদর্শনে সাহায্য করে।
এখানে ইনডেক্সের একটা নিজস্ব অ্যালগোরিদম থাকে যার কারণে প্রশ্নকারীকে সর্বোচ্চ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ছোটো একটা উদাহরণ দিই – কোনো সার্চ বারে, ধরুন গুগলের সার্চ বারে এসে আমরা যদি Milk লিখি তবে নিচে সাজেশন হিসেবে 'Milk', 'Milky way' ইত্যাদি আরও বেশ কয়েকটা সাজেশন চলে আসে। এই অবস্থায় আমরা যদি আরও এক–দুইটা শব্দ, অক্ষর যোগ-বিয়োগ করি, সে অনুযায়ী সাজেশনও পালটে যাবে। ইনডেক্স মূলত প্রশ্নকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী এরকম তথ্য সবসময় আপডেট রাখার কাজটাই করে।

৩. কুয়েরি সফটওয়্যার:
হ্যাঁ, এতক্ষণ ধরে যে সার্চের কথা বলছিলাম, সেই সার্চ করতে গিয়ে সবার প্রথমে যে জিনিসটা আমরা দেখি, যেখানে লিখে সার্চ করি সেটাই মূলত এই কুয়েরি সফটওয়্যার। সার্চকারীর প্রশ্ন অনুযায়ী এটা ইনডেক্সে থাকা সকল ডেটা চেক করে যা তার স্পাইডার তাকে দিয়েছে। যেমন: টেক্সট, লিংক, URL ম্যাটেরিয়াল ইত্যাদি।
সে অনুযায়ী সর্বোচ্চ গুণমানসম্পন্ন উত্তরগুলি সাজিয়ে স্ক্রিনে প্রদর্শন করে।

এতটুকু হলো সারমর্ম। এবার চলুন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাক আসলেই সার্চ ইঞ্জিন কীভাবে কাজ করে।

এজন্য আমাদের সবার প্রথমে কয়েকটা জিনিস জানতে হবে। এগুলো হলো:

১. কন্টেন্ট: হ্যাঁ, ইন্টারনেটে আমরা যা যা দেখি সবই একেকটা কন্টেন্ট, লেখা, ভিডিয়ো, অ্যানিমেশন, পিডিএফ, এক্সেল ফাইল–সবই হলো কন্টেন্ট। এগুলো মূলত টার্গেটেট অডিয়েন্সকে কেন্দ্র করে তাদের চাহিদা অনুযায়ী তৈরি করে আপলোড করা হয়। পরে সার্চকারীর প্রয়োজন বুঝে সার্চ ইঞ্জিন এগুলোর মধ্যে Best to Worst সিরিয়ালে সাজিয়ে উপস্থাপন করে। এখানে আরও দুইটা লাইন যোগ করি, সাজানোর সময় সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্টগুলোকে সবসময় Top 10 হিসেবে সাজায়। মানে সেরা রেজাল্টগুলো থাকবে SERP (Search Engine Result Page)-এর প্রথম পাতায়, বাকিগুলো পরবর্তী পাতাসমূহে। আর প্রত্যেকটা সার্চ ইঞ্জিন তার সার্ভারে থাকা তথ্যের ওপর নির্ভর করে উত্তর দেয়। যেমন: গুগল তার স্পাইডার দিয়ে সংগৃহীত তথ্যের ওপর নির্ভর করে ফলাফল প্রদান করে। তেমনি বিং করে তার স্পাইডারের ওপর নির্ভর করে।

২. কী-ওয়ার্ড: ইন্টারনেটে যেগুলো সবচেয়ে বেশি সার্চ করা হয় ওগুলোই একেকটা কী-ওয়ার্ড। কন্টেন্ট তৈরির সময় মূলত এই কি-ওয়ার্ডের ওপর জোর দেওয়া হয়। কারণ সার্চ ইঞ্জিন চায় তার ব্যবহারকারীদের সর্বোচ্চ সেবা দিতে, তাই তারা যা যা লিখে সার্চ করে সেগুলোকেই সে বেশি গুরুত্ব দেয়। আর তাই যত ভালো কন্টেন্টই হোক না কেন সেখানে এই কি-ওয়ার্ডের ব্যবহার, অর্গানাইজ করা এসব দেখেই সার্চ ইঞ্জিন বুঝতে পারে ব্যবহারকারীর জন্য কোন পেইজ সবচেয়ে ভালো। সেই হিসেবেই কোনো পেইজকে SERP লিস্টের শুরুর দিকে রাখে।

এবার আসি মূল আলোচনায়।

আগে যেভাবে বলেছিলাম সার্চ ইঞ্জিন ইন্টারনেটের সব পেইজ খুঁজে না, ইনডেক্সের ওপর নির্ভর করে রেজাল্ট দেয়। এখানে একটা সাইকেল কাজ করে৷ সার্চকারী তার প্রশ্ন (কুয়েরি) করলে তা ইনডেক্সে ম্যাচ করা হয়। এরপরে যতগুলো ম্যাচ পেয়েছে সেগুলোকে সংগতিপন্নতার ওপর নির্ভর করে ম্যাচিং, URL র‍্যাংক অনুযায়ী সাজায়। (এখানে কিছু ফ্যাক্টর কাজ করে যা আমরা একটু পরেই জানব)। লিস্ট করা URL রেজাল্টগুলো ডিসপ্লে করে সার্চ রেজাল্ট হিসেবে৷

কুয়েরি অনুযায়ী ম্যাচ করা

১. সার্চ কুয়েরিতে একসাথে এক বা একাধিক বাক্য সার্চ করা যায়, এজন্য স্পেশাল ক্যারেক্টার, সিম্বল ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

২. এবার এই কুয়েরিকে অ্যানালাইজ করা হয়।

ক. প্রথমে বানান, গঠন ইত্যাদি অনুযায়ী ভিন্নার্থক কিছু রেজাল্ট আছে কি না এসব দেখা হয়। ঠিকটাও দেখায়, অন্য শব্দের জন্যও অপশন রাখে (সেজন্যই ভুল বানান লিখলেও মাঝে মাঝে দেখায় Search instead for...)।

খ. একাধিক শব্দ মিলে অর্থবোধক কোনো কিছু দাঁড়ায় কি না এটাও দেখায়, থাকলে তা রেজাল্টের অন্তর্ভুক্ত হবে৷

এছাড়াও শব্দের ক্রম, অপারেটর ইত্যাদির ব্যবহার অনুযায়ী সম্ভাব্য প্রশ্ন কী হতে পারে তা সার্চ ইঞ্জিন প্রথমে বের করে নেয়৷

৩. এবার ফলাফল প্রদর্শনের পালা।

এখানে আবার দুইটা জিনিস আছে –

ক. পেইড প্লেইসমেন্ট ম্যাচ এবং

খ. অর্গানিক ম্যাচ।

ক. পেইড প্লেইসমেন্ট ম্যাচ হলো এমন পদ্ধতি যেখানে পেইজের মালিক সার্চ ইঞ্জিনকে পে করবে তার রেজাল্ট SERP-তে দেখানোর জন্য। অনেকটা ফেইসবুকে প্রমোট করার মতো। এতে স্বাভাবিকভাবেই সার্চকারীর প্রশ্ন অনুযায়ী এই পেইড পেইজে উত্তর থাকলে তা আগে প্রদর্শিত হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে সার্চ ইঞ্জিনের কোম্পানিভেদে কী-ওয়ার্ড আর পেমেন্টের গুরুত্বের পার্থক্য রয়েছে।

খ. অর্গানিক ম্যাচ হলো যেখানে সার্চকারীর প্রশ্ন অনুযায়ী যে পেইজ সবচেয়ে ভালোভাবে উত্তর দিতে পারবে বলে সার্চ ইঞ্জিন মনে করে, তাকে SERP-তে র‍্যাংক করায়। এখানে পেইজের মালিকের কোনো পে করতে হয় না, তার কন্টেন্টের গুণে পেইজ র‍্যাংক করে। এক্ষেত্রে আরও সাহায্য করে সার্চ কি-ওয়ার্ডের সাথে Document ID, URL ইত্যাদির মিল। কারণ এতে সার্চকারীর প্রশ্নের উত্তরের সাথে পেইজটা কতটা সংগতিপন্ন তা সহজেই বোঝা যায়।

এখন এই র‍্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে অর্গানিক আর পেইডে দুই ক্ষেত্রে কার্যধাপ মোটামুটি মিল থাকলেও একটু পার্থক্য হলো পেইড ম্যাচ দেখতে হয় যে এড দেওয়া হচ্ছে তা ব্যবহারকারীর উপযোগী কি না। আবার অর্গানিকের চেয়ে পেইড পেইজের সংখ্যা কম। তাই সহজে র‍্যাংক করা যায়।

> অন্যদিকে অর্গানিকের ক্ষেত্রে পুরোটাই কন্টেন্ট নির্ভর। এক্ষেত্রে অবশ্য সময়ের সাথে সাথে কন্টেন্টে পরিবর্তন সাধন করেও র‍্যাংক করা যায়।

এবার অল্প করে র‍্যাংকিংয়ের কিছু প্রাইমারি ফ্যাক্টর জেনে নিই।

১. টেক্সট অ্যানালাইসিস: কন্টেন্টে কী-ওয়ার্ডের ঘনত্ব, ব্যবহারের স্থান, প্রশ্নকারীর উত্তরের সাথে সামঞ্জস্যতা ইত্যাদি নির্ভর করে ওই পেইজ/সাইট প্রশ্নকারীকে তার যথাযোগ্য উত্তর দিতে পারবে কি না।

সহজ একটা উদাহরণ দিই – সার্চবারে গিয়ে কিছু লিখলে নিচে সাজেশন আসে। এবার একটা দুইটা শব্দ পালটে দিলেও সে অনুযায়ী আলাদা সাজেশন আসে – এগুলো টেক্সট অ্যানালাইসিসের একটা উদাহরণ।

কী-ওয়ার্ড প্লেইসমেন্টের জন্য সেরা তিনটা জায়গা হলো: ক. টাইটেল, খ. হেডিং, গ. বডির শুরুর অংশ। কারণ এই তিনটা জায়গাতেই ব্যবহারকারীর চোখ সবার আগে যায় এবং সে বুঝতে পারে এই পেইজ তার উপযোগী কি না।

২. লিংক অ্যানালাইসিস: এখানে অথোরিটি একটা বড় ফ্যাক্টর। যে পেইজ/সাইটের অথোরিটি বেশি সার্চ ইঞ্জিনের কাছে তার গুরুত্ব তত বেশি। বয়স্ক সাইটের অথোরিটি বেশি আবার অন্য পেইজ এই সাইটকে কতবার মেনশন করল/লিংক করল বা তার রেফারেন্স দিলো এর ওপরও অথোরিটি নির্ভর করে। এর জন্য সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হলো উইকিপিডিয়া। উইকিপিডিয়ার অথোরিটি অনেক বেশি।

৩. ট্র্যাফিক অ্যানালাইসিস: সার্চ ইঞ্জিনের দুনিয়ায় 'ট্র্যাফিক' অনেক বড়ো একটা ফ্যাক্টর। 'ট্র্যাফিক' হলো একটি পেইজে

কতজন মানুষ ভিজিট করে তার সংখ্যা। এটাও অথোরিটি বাড়াতে সাহায্য করে।

এখানে আরেকটা জিনিস বলা উচিত। "বাউন্সিং" বলে একটা জিনিস আছে যার অর্থ হলো ভিজিটর সাইটে ঢুকে অন্য পেইজে যায়নি, বের হয়ে গেছে। এটা সার্চ ইঞ্জিনকে খারাপ সংকেত দেয়। মানে ওই সাইট ভালো সুবিধা দিচ্ছে না। আবার SERP-তে র‍্যাংকিংয়ে থাকার পরেও ট্রাফিক সংখ্যা কম থাকলেও সার্চ ইঞ্জিন এটাকে পেনাল্টি দেয়ার তালিকায় ধরে নেবে।

এগুলো গেল লেখা অনুযায়ী সার্চ ইঞ্জিনের কার্যপদ্ধতি এবার অল্প করে এর কিছু তথ্য জেনে নিই।

১. ব্যবহারকারীর প্রশ্ন অনুযায়ী সার্চ ইঞ্জিন প্রথমে তার ডেটাবেজে থাকা তথ্যগুলোকে ফাইল টাইপ অনুযায়ী আলাদা করে ফেলে। যেমন: ওয়ার্ড ফাইল, এক্সেল শিট, পিডিএফ ফাইল ইত্যাদি। ব্যবহারকারীর আগ্রহ এবং তার সুবিধা অনুযায়ী SERP-এর লিস্ট সাজানো হয়।

২. সার্চ ইঞ্জিন কেবল লেখা পড়তে পারে। ছবি, ভিডিয়ো এমনকি তাদের ওপরে থাকা লেখা পর্যন্ত পড়তে পারে না। সেক্ষেত্রে সে এগুলোকে এড়িয়ে যায়। সার্চ ইঞ্জিন কেবল ক. ইমেজ নেম, খ. ইমেজ'স ALT টেক্সট গ. মেটা টেক্সট (টাইটেল, ডেস্ক্রিপশন, কী-ওয়ার্ডস, অন্যান্য ডিরেকটিভস) ঘ. URL টেক্সট পড়তে পারে।

তাই ওয়ার্ড ছাড়া অন্য ফাইল টাইপে কন্টেন্ট তৈরি করলে সেগুলোর আপলোডের সময় নাম/লেখা ALT টেক্সটের ভেতর দিয়ে দিতে হয়।

তো এবার ভাবুন কোনটা বেশি জটিল? সার্চ ইঞ্জিনের এলগোরিদম, না জগেনের উত্তরের অ্যালগোরিদম?

এমন একটি ওয়েবসাইট আছে যার মাধ্যমে আপনি ইন্টারনেটের বয়স দেখতে পারেন। এমনকি আপনি আপনার জন্মতারিখ নিবেশ করে দেখতে পারেন আপনার পৃথিবীতে আসার কত আগে বা পরে থেকেই ইন্টারনেট চালু ছিল!

ওয়েবসাইটির লিঙ্ক: https://howoldistheinter.net/
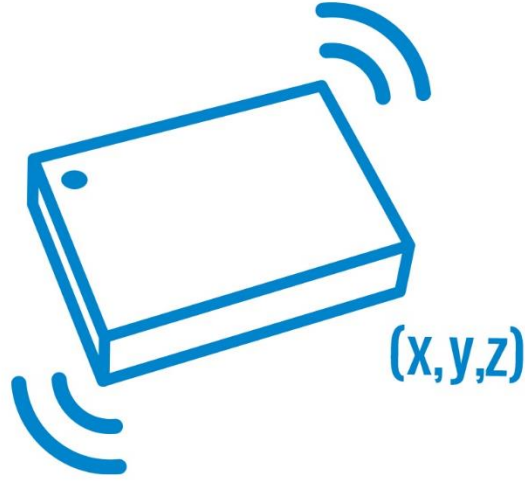
মোবাইলে থাকা সেন্সর

রওনক শাহরিয়ার

স্মার্টফোনগুলোতে আজকাল বহু সংখ্যক সেন্সর থাকে যা বেটার ইউজার এক্সপেরিয়েন্স দিয়ে থাকে এবং চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে অ্যাপসকে অধিক তথ্য দিয়ে থাকে, যেটা ভালো ও অধিক ব্যাটারি লাইফ প্রোভাইড করে। এবার জেনে নেওয়া যাক, সেন্সর কী?

সেন্সরকে আলাদা ডিভাইসের সাথে তুলনা করা যায়, যা চারপাশের পরিবেশের পরিবর্তন শনাক্ত করে এবং প্রাপ্ত ডেটা অপারেটিং সিস্টেম বা প্রসেসরে প্রেরণ করে। সেন্সরের কাজের ভিন্নতা আছে। এই ভিন্নতাকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

১. Motion Sensors,
২. Environment Sensors,
৩. Position Sensors.

Motion Sensor (অক্ষমাপক সেন্সর):
এই সেন্সরগুলো অক্ষ সম্পর্কিত গতি পরিমাপক সেন্সর। যেমন, ত্বরণের বেগ এবং রোটেশনের অক্ষ ত্রিমাত্রিক। এই শ্রেণিতে রয়েছে Accelerometer, Gravity Sensors এবং Gyroscope Sensors.
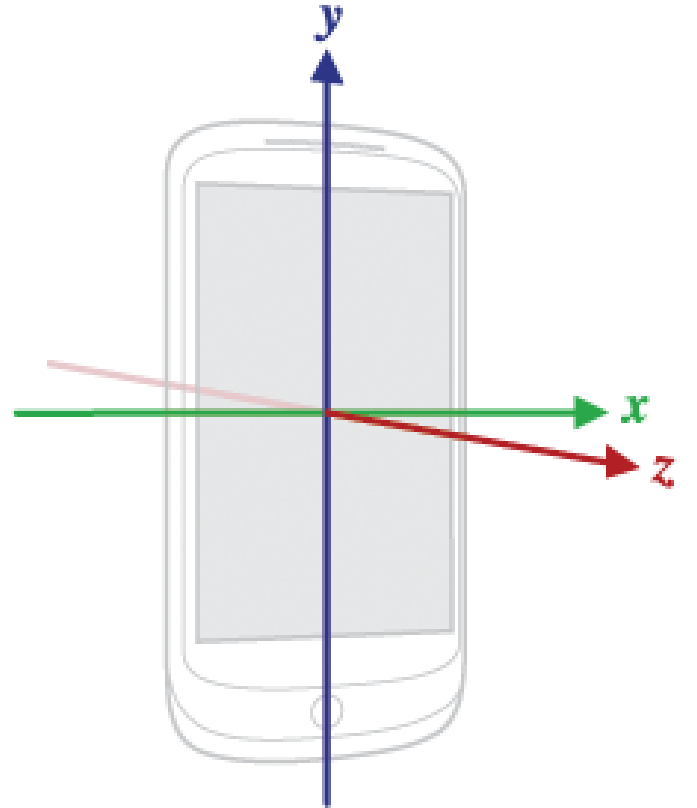
Environmental Sensors (পরিবেশগত সেন্সর):

এই সেন্সরগুলো পরিবেশের প্যারামিটার যেমন: বাতাসের চাপ, তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতাসহ বিভিন্ন বিষয় পরিমাপ করে। এই শ্রেণিতে রয়েছে Barometers, Photometer এবং Thermometers.

Position Sensors (অবস্থানগত সেন্সর):

এই সেন্সরগুলো ডিভাইসের ভৌত অবস্থান নির্ণয় করে। ডিভাইস সোজা বা বাঁকা যেভাবে রাখা হোক সেদিকে কাজ করে। এই শ্রেণিতে রয়েছে Orientation sensors, Magnetometers, GPS.

স্মার্টফোনে থাকা সাধারণ সেন্সরগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো–

Accelerometer Sensor:

অ্যাক্সেলারোমিটার অক্ষভিত্তিক গতি শনাক্ত করে। এটি স্মার্টফোনের ওরিয়েন্টেশনের ওপর নির্ভর করে এর x, y ও z অক্ষ নির্ণয় করে।

ফোনের অটো-রোটেট অপশন যখন অন করা হয় তখন ছবি বা অ্যাপস দেখার সময় মোবাইল সোজা করে দেখলে স্বাভাবিক portrait ভিউ দেখা যাবে এবং বাঁকা করলে landscape ভিউ পাওয়া যাবে। কিছু ফোনে ফিচার হিসেবে উলটা করে রাখলে সাইলেন্ট মোডে যায় বা পাওয়ার সেভিং মোড অন হয়।

এটি স্টেপ কাউন্টের ক্ষেত্রেও কাজ করে। মূলত অক্ষের ওপর ভিত্তি করে ফোনে এসব কাজ হয়।

Gyroscope Sensor:

জাইরোস্কোপ বা জাইরো সেন্সর হলো অ্যাক্সেলারোমিটার-এর উন্নততর সংস্করণ। অ্যাক্সেলারোমিটার যেখানে শুধু অক্ষভিত্তিক গতি মনিটর করতে পারে, জাইরো সেখানে অ্যাক্সিলারোমিটারের সাথে কাজ করে এবং ওরিয়েন্টেশনের প্রতিটা ডিগ্রির পরিবর্তন শনাক্ত করে। এটি গতি পরিমাপের ক্ষেত্রে বেশ কার্যকর।

যেমন: প্যানারোমা বা ফটোস্ফিয়ারের ৩৬০° ছবি তোলার সময় এই সেন্সর পরিমাপ করে ফোনের অবস্থানের কেমন পরিবর্তন হচ্ছে এবং প্রতি ডিগ্রির ছবি তুলতে সহায়তা করে। আবার যেসব গেমসে জাইরো কাজ করে সেগুলোতে আলাদা সুবিধা পাওয়া যায়।

Ambient Light Sensor:

এই সেন্সর মূলত পরিবেশের আলোর উজ্জ্বলতা শনাক্ত করে। ফোনের অটো ব্রাইটনেস এই সেন্সরের ওপর নির্ভর করে। এই সেন্সর আশেপাশের আলোর পরিমাপ করে এবং ডেটা অপারেটিং সিস্টেমে প্রেরণ করে। এই ডেটা অনুযায়ী অপারেটিং সিস্টেম ব্রাইটনেসের সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

Magnetometer Sensor:

এই সেন্সর ফোনে কম্পাসের মতো কাজ করে। এটি ম্যাগনেটিক ফিল্ড পরিমাপ করে এবং দক্ষিণ দিক নির্ণয় করে দিক প্রদর্শন করে।

গুগল ম্যাপসে পথ নির্দেশনার সময় এটি দক্ষিণ দিক কোন দিকে তা দেখায়। আবার মেটাল ডিটেক্টর অ্যাপস কাছাকাছি মেটাল জাতীয় পদার্থ থাকলে তা শনাক্ত করতে পারে।

Proximity Sensor:

এই সেন্সর মূলত বস্তুর উপস্থিতি শনাক্ত করে। স্মার্টফোনে এটি সেন্সর ও বস্তুর মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় করে। যখন ফোনে কথা বলা হয় এবং কাছাকাছি এলে স্ক্রিন একাই অফ হওয়ার কারণ এই প্রক্সিমিটি সেন্সর।

GPS:

জিপিএস মূলত অবস্থান নির্ণয় করতে সহায়তা করে। পৃথিবীর অরবিটে থাকা ২৪টি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে মাইক্রোওয়েভ সিগন্যালের মাধ্যমে সঠিক অবস্থান নির্ণয় করে। বেস স্টেশনে ডিভাইস সিগন্যাল প্রেরণ করলে, সেখান থেকে স্যাটেলাইটে প্রেরণ করা হয় এবং স্যাটেলাইট লোকেশন শনাক্ত করে।

এই শনাক্তকরণ অ্যাকুরেসি প্রায় ১০-১০০ মিটারের মধ্যে তবে ডুয়েল জিপিএস থাকলে আরও নিখুঁতভাবে অবস্থান নির্ণয় সম্ভব।

এটা অটোমেটিক সময় নির্ধারণ, ম্যাপে অবস্থান নির্ণয়-সহ অনেক কাজে ব্যবহৃত হয়।

Barometer:

ব্যারোমিটার ব্যবহার করা হয় বায়ুমণ্ডলের চাপ শনাক্ত করার জন্য। এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কত উচ্চতায় অবস্থান করছে তাও নির্ণয় করে।
জিপিএসের সাথে এটি সঠিক লোকেশন শনাক্ত করবে এবং দিনের বিভিন্ন ফিটনেস অ্যাক্টিভিটি যেমন: স্টেপ ট্র্যাক করতে সহায়তা করবে।

Biometrics:

সিকিউরিটির জন্য ব্যবহৃত হয়। মূলত ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও ফেইসলক ফোনে অধিক জনপ্রিয়। কিছু ফোনে আইরিশ স্ক্যানারও দেখা যায়।

NFC Sensor:

NFC হলো শর্ট রেঞ্জে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সিতে ওয়্যারলেস ডেটা ট্রান্সফার মাধ্যম। মাত্র ১০ সে.মি. এর মধ্যে ডেটা বিনিময় করতে সক্ষম।

Ambient Temperature Sensor:

এই সেন্সর মূলত পরিবেশের তাপমাত্রা শনাক্তে সহায়তা করে। শুধু ফ্ল্যাগশিপ ফোনগুলোতে এই ফিচার দেখা যায়।

Heart Rate:

এই সেন্সর ফোন টাচ করলে উক্ত ব্যক্তির হার্টবিট রেট শো করে।

Relative humidity:

এই সেন্সর আপেক্ষিক আর্দ্রতা পরিমাপ করে এবং পার্সেন্টেজ-এ মান প্রকাশ করে।

আইপি অ্যাড্রেস: ওয়েব-জগতের ঠিকানা

অনিন্দিতা ঘোস

আপনি কোথায় থাকেন? হয়তো অমুক গ্রাম, তমুক জেলা – এটা হচ্ছে আপনার ঠিকানা। এই ঠিকানায় গেলে আপনাকে পাওয়া যাবে। সেরকম ইন্টারনেটের জগতেও আপনার একটা ঠিকানা রয়েছে। সেটা হলো আইপি অ্যাড্রেস (IP address)।

এর পুরো নাম ইন্টারনেট প্রটোকল অ্যাড্রেস (Internet Protocol address)। ইন্টারনেটে সংযুক্ত প্রতিটি ডিভাইসে একটি সংখ্যা নিযুক্ত করা হয়, একেই আইপি অ্যাড্রেস বলে। যেমন: 172.16.254.1 – এটি একটি আইপি অ্যাড্রেসের উদাহরণ। আইপি অ্যাড্রেসের মাধ্যমে কোনো ডিভাইসকে অন্যান্য ডিভাইস থেকে আলাদা করা যায় এবং সেই ডিভাইসের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়।

সারা পৃথিবীতে আইপি অ্যাড্রেস নিয়ন্ত্রণ করে International Assigned Numbers Authority (IANA)। এছাড়া আঞ্চলিক রেজিস্ট্রির জন্য রয়েছে পাঁচটি Regional Internet Registries (RIRs)। তার মধ্যে আমাদের এশিয়া মহাদেশের জন্য আছে Asia-Pacific Network Information Centre (APNIC)। নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরেরা (network administrator) কোনো ডিভাইসকে নির্দিষ্ট কোনো আইপি অ্যাড্রেসে নিযুক্ত করার কাজটি করে থাকেন।

ইন্টারনেট প্রটোকলের ভার্শনগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র ভার্শন ৪ (IPv4) এবং ভার্শন ৬ (IPv6) জনপ্রিয়। আমরা সচরাচর IPv4 ব্যবহার করে থাকি, যেটা কিনা মান্ধাতার আমলের (১৯৮৩)। এতে ৩২ বিটের অ্যাড্রেস ব্যবহৃত হয়। আর IPv6 চালু হয় ১৯৯৫ সালে। এতে ১২৮ বিটের অ্যাড্রেস ব্যবহার করা যায়। এছাড়া IPv5-ও বেরিয়েছিল, যেটা ইন্টারনেট স্ট্রিম প্রটোকল (Internet Stream Protocol) নামে পরিচিত। কিন্তু সেটা তেমন জনপ্রিয় হয়নি। এছাড়াও ভার্শন ১ থেকে ভার্শন ৯ পর্যন্ত রয়েছে, কিন্তু কোনোটাই জনপ্রিয় নয়।

IPv4-এ ৩২ বিটের অ্যাড্রেস ব্যবহৃত হয়, ফলে মোট $২^{৩২}$ = ৪,২৯,৪৯,৬৭,২৯৬টি অ্যাড্রেস থাকা সম্ভব। পুরো অ্যাড্রেসকে চার ভাগে ভাগ করে প্রকাশ করা হয়। প্রতিটি ভাগে ৮ বিট করে থাকে,

যাকে অক্টেট (octet) বলা হয়। ভাগগুলোকে '.'(ডট) দ্বারা আলাদা করা হয়। সুতরাং পুরো অ্যাড্রেসকে n.n.n.n হিসেবে প্রকাশ করা হয়, যেখানে n হলো 0 থেকে 255-এর মধ্যে একটি সংখ্যা। কোনো ভাগের প্রথমে 0 থাকলে সাধারণত সেগুলো বাদ দেওয়া হয়।

IPv6-এ ১২৮-বিটের অ্যাড্রেস ব্যবহার হওয়ায়, মোট $২^{১২৮}$ ≈ ৩.৪০৩ × $১০^{৩৮}$টি অ্যাড্রেস থাকা সম্ভব। এই সংখ্যক অ্যাড্রেস দিয়ে নিকট ভবিষ্যতের চাহিদা পূরণ করার আশা করা যাচ্ছে। এই ভার্শনের অ্যাড্রেসগুলো হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন:- 2001:db8:0:1234:0:567:8:1। এছাড়া উভয় ভার্শনেই কিছু সংখ্যক অ্যাড্রেস প্রাইভেট নেটওয়ার্কের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়। বর্তমানের আধুনিক ডেস্কটপগুলোতে IPv6 সাপোর্ট করে।

কোনো ডিভাইসে আইপি অ্যাড্রেস নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে দুই ধরনের আইপি অ্যাড্রেস রয়েছে।
যথা–
i) স্ট্যাটিক আইপি অ্যাড্রেস (static IP address)
ii) ডায়নামিক আইপি অ্যাড্রেস (dynamic IP address)

কোনো ডিভাইসে যদি একবারই আইপি অ্যাড্রেস নিযুক্ত করা হয় এবং সেটা যদি পরবর্তীতে আর পরিবর্তন না হয়, তাহলে সেই ধরনের অ্যাড্রেসকে স্ট্যাটিক আইপি অ্যাড্রেস বলে। আর যদি কোনো ডিভাইসে প্রতিবার নেটওয়ার্কে প্রবেশ করার সময় নতুন নতুন আইপি অ্যাড্রেস নিযুক্ত করা হয়, তাহলে সে ধরনের অ্যাড্রেসকে ডায়নামিক আইপি অ্যাড্রেস বলা হয়।

এক ধরনের বিশেষ সফটওয়্যার রয়েছে, যাকে বলা হয় ফায়ারওয়াল সফটওয়্যার (firewall software)। এই সফটওয়্যার দ্বারা নির্দিষ্ট কিছু আইপি অ্যাড্রেসকে ব্লক করে রাখা যায়। এছাড়া আইপি অ্যাড্রেসের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর ভৌগোলিক অবস্থানও নির্ণয় করা যায়।

পরিশেষে বলি, বর্তমান যুগ ইন্টারনেটের যুগ। আর এই ইন্টারনেটের পেছনে আইপি অ্যাড্রেসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পৃথিবীর বেশিরভাগ অর্থই ডিজিটাল মুদ্রা হিসেবে আছে। ফিজিক্যাল হিসেবে আছে মাত্র ৮%, ভাবুন ৮%-ই যদি এমন হয় তাহলে সম্পূর্ণ অর্থের পরিমাণ কেমন!

সূত্র: ccstechnologygroup.com

VOIP কী এবং কেন?

রওনক শাহরিয়ার

Voice over Internet Protocol (VoIP) এমন একটা প্রযুক্তি যা অডিয়ো বা ভিডিয়ো কলকে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে প্রেরণ করে, প্রচলিত ফোন লাইনের পরিবর্তে। ইন্টারনেট এই প্রযুক্তির জন্য আবশ্যক নয়। তবে ইন্টারনেট যে প্রটোকলে কাজ করে, VoIP ঠিক একই প্রটোকলে কাজ করে (প্রটোকল হলো বিশেষ কিছু নিয়ম/বিধান যা যোগাযোগে শৃঙ্খলা বজায় রাখে)। Voice over Internet Protocol মানে কল সেই একই পথে যাবে, ইন্টারনেট যে প্রটোকল ব্যবহার করে সেটা ব্যবহার করে।

VoIP এমন একটি প্রযুক্তি যা পৃথিবীর ফোন সিস্টেমকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে দেখার ক্ষমতা রাখে। সার্ভিস প্রোভাইডাররা এই প্রযুক্তি ইউজারকে দিয়ে থাকে এবং প্রতিনিয়ত মানুষের কাছে জনপ্রিয় পাচ্ছে। FCC সংস্থা এই প্রযুক্তির খুঁটিনাটি তদারকি করে থাকে। VoIP এর ব্যাপারে মজার বিষয় হলো, এখানে শুধু এক ভাবে নয় বরং তিনটি ভিন্ন পরিষেবা দিয়ে থাকে। এগুলো হলো –

ATA:
সবচেয়ে সাধারণ ও প্রচলিত প্রযুক্তি হলো একটি ডিভাইস ব্যবহার করা যাকে ATA বলা হয়। ATA একটি সাধারণ ফোনকে কম্পিউটার বা ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে VoIP ব্যবহারে সাহায্য করে। ATA এখানে অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার। এটি ফোন থেকে অ্যানালগ সিগন্যাল গ্রহণ করে এবং ডিজিটাল ডেটাতে রুপান্তর করে, যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। তবে কিছু ATA প্রভাইডার এক্সট্রা সফটওয়্যার হোস্ট কম্পিউটারে রাখে, এক্ষেত্রে এর সেট-আপ সহজ হয়।

IP Phone:
এই বিশেষ ফোনগুলো দেখতে সাধারণ ফোনের মতোই। তবে এতে ফোন কানেক্টরের বদলে ইথারনেট কানেক্টর ব্যবহার করা হয়। IP ফোন রাউটারের সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকে এবং প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার IP কল গ্রহণের জন্য থাকে। আর wi-fi phone-এ যদি সাবস্ক্রাইব করা থাকে তবে যে-কোনো হটস্পট থেকে VoIP এর সুবিধা পাওয়া সম্ভব।

Computer to computer:
এটি VoIP ব্যবহার করার সবচেয়ে সহজ মাধ্যম। এর মাধ্যমে বড়ো দূরত্বের কলে অর্থ প্রদানের দরকার হয় না। প্রোভাইডাররা ফ্রী বা খুব কম খরচে এই প্রযুক্তি প্রদান করে থাকে। এর জন্য দরকার মাইক্রোফোন, স্পিকার, সাউন্ড কার্ড এবং স্ট্যাবল ইন্টারনেট কানেকশন।
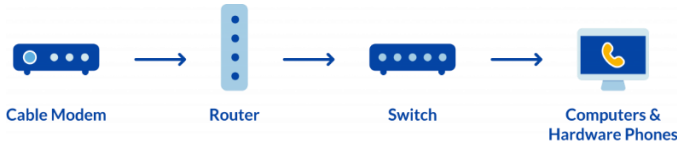
VoIP এর ফ্রী সফটওয়্যার অনলাইনে পাওয়া যায়, যেগুলো ৩–৫ মিনিটে সেট-আপ করা সম্ভব। বিপরীতের মানুষটির যদি একই সফটওয়্যার থাকে তবে VoIP এর সুবিধা উপভোগ করা সম্ভব।

VoIP প্রভাইডাররা কল সংযুক্ত করার থেকেও বেশি কিছু করে থাকে। তারা VoIP ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক স্ট্রিমলাইন করে। তারা হাজারো ফোন কল এক সাথে একটি সার্কিট সুইচ ও আইপি গেটওয়েতে রাউটিং করে, যার জন্য দূরবর্তী কলে স্পিড কম লাগে। আর বিপরীতের মানুষ কল গ্রহণ করলে, সার্কিট সুইচের মাধ্যমে তেমন পরিবর্তন ছাড়াই বার্তা ফিরে আসে।

যদিও সময়ের সাথে প্রযুক্তির পরিবর্তন হচ্ছে। বর্তমানের সার্কিট সুইচ নেটওয়ার্ক পুরোপুরি প্যাকেট সুইচ নেটওয়ার্ক দ্বারা ধীরে ধীরে প্রতিস্থাপন হচ্ছে। আইপি টেলিফোন অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বেশ কার্যকরী। বাণিজ্যিকভাবে যতই VoIP এর ব্যবহার বাড়ছে, বাসা বাড়িতে এর জনপ্রিতা ততই বাড়ছে। তবে সুইচের দাম এবং কিছু সমস্যার জন্য VoIP ঘরে ব্যবহারের বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

Circuit Switching

- Circuit-switched network
  - direct physical connection between two devices
    - ex) phones or computers
  - shorter links (no, length) than point-to-point connection
  - The circuit can not be shared by other devices

circuit switches
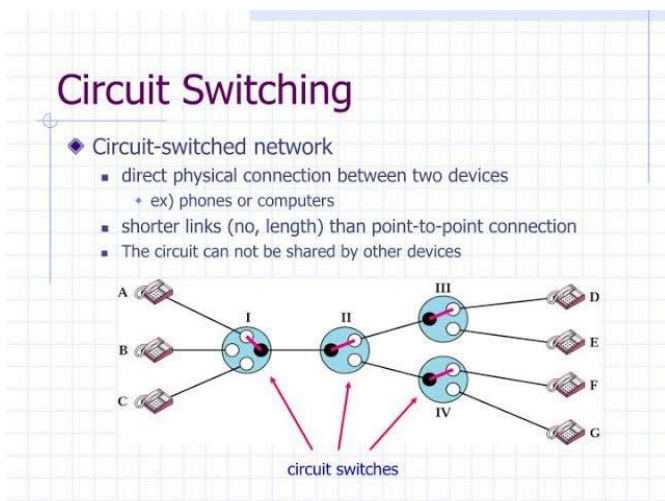
VoIP সার্কিট সুইচিং:

টেলিফোন সিস্টেমে কল সংযোগের জন্য নির্ভরযোগ্য কিন্তু কিছুটা অকার্যকর পদ্ধতি দিয়ে কল সংযোগ দেওয়া হয়, যাকে সার্কিট সুইচিং বলে।

সার্কিট সুইচিং এর মৌলিক ধারণা টেলিফোন নেটওয়ার্কে শতাধিক বছরের বেশি সময় ধরে চলে আসছে। যখন দুই জন কোনো কলে থাকে, কলের সময়ে প্রতি মুহূর্তে সংযোগ বজায় রাখা দরকার হয়। কারণ উভয় দিকের দুই পয়েন্টের সংযোগ করা হচ্ছে এবং এই সংযোগকে সার্কিট বলা হয়। এটা Public Switched Telephone Network (PSTN) এর ভিত্তি।

যদি ফোনে দশ মিনিটের জন্য কথা বলা হয়, তবে এই সময়ে সার্কিট দুই ফোনের জন্য অবিচ্ছিন্ন থাকে। ৬০ এর দশকে অ্যামেরিকার সব জায়গায় কপারের তারের সংযোগ ছিল। নিউইয়র্ক থেকে লস অ্যাঞ্জেলস ফোন করতে, দুই জায়গার সুইচ সেই তারের মাধ্যমে সংযোগ দেওয়া হতো। সেই তার কথা বলার জন্য শুধু সেই ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। অর্থাৎ ৩,০০০ মাইল দৈর্ঘ্যের সেই তার দশ মিনিটের কেনা যেত। যদিও এখন অ্যানালগ পদ্ধতির প্রচলন নেই, তবে সার্কিট সুইচিং সংযোগ এভাবে কাজ করে।

আর বর্তমানে ফাইবার অপটিক্সের মাধ্যমে ডেটা প্রেরণ করা হয়। প্রতি পাশে 64 kbps এর সংযোগ ফিক্সড থাকে, অর্থাৎ মোট ট্রান্সমিশন রেট 128 kbps। অর্থাৎ, দশ মিনিটে মাত্র 9,600 KB ট্রান্সমিশন হয়, যা অনেক বেশি সাশ্রয়ী অ্যানালগের তুলনায়।

VoIP প্যাকেট সুইচিং:

একটি প্যাকেট সুইচ ফোন নেটওয়ার্ক সার্কিট সুইচিং এর বিকল্প। এটা কাজ করে কিছু এভাবে – যখন কেউ ফোনের এক পাশে কথা বলে, তার বিপরীত পাশের মানুষ সেটা শুনে। মানে এখানে অর্ধেক সংযোগ ওই সময় ব্যবহার হচ্ছে। তাই সহজভাবে বললে ফাইলের অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে, বা মাত্র 4,700 KB ব্যবহার হচ্ছে। আবার কথা না বলার (নিশ্চুপ থাকা) সময়েও বাদ দেওয়া হয়। এতে ফাইলের আকারও ছোটো হচ্ছে। দুই পাশ থেকে নিরবচ্ছিন্ন ডেটা পাঠানোর চেয়ে, শুধু শব্দের অংশের প্যাকেট প্রেরণ করা হয়।

ডেটা নেটওয়ার্ক সার্কিট সুইচিং ব্যবহার করে না। ইন্টারনেট কানেকশন স্লো হবে যদি ওয়েব পেইজের থাকার সময় অবিচ্ছিন্ন সংযোগ দরকার হয়। এর বদলে ডেটা নেটওয়ার্ক প্রয়োজনমতো ডেটা গ্রহণ ও প্রেরণ করে। একটি নির্দিষ্ট লাইনে অসংখ্য ডেটা না পাঠিয়ে, ডেটা প্যাকেট হাজার ধরনের পথ দিয়ে বিশৃঙ্খলভাবে চলাচল করে এবং তার গন্তব্যে যেয়ে পৌঁছায়।

সার্কিট সুইচিং-এ সবসময় সংযোগের দরকার হলেও প্যাকেট সুইচিং সংক্ষিপ্ত পথ খুঁজে। কোনো ডেটাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে ভাগ করে প্রেরণ করাকে প্যাকেট বলা হয়। ডেটা এই প্যাকেট আকারে প্রেরণ করা হয়, কখনও ৬,৪০০০ বা ৩২,০০০ বার সেকেন্ডে যেন কখনও ডেটা লস হলেও শুনতে সমস্যা না হয়।

প্যাকেট সুইচিং খুবই কার্যকরী পদ্ধতি। এটা প্যাকেটকে স্বল্প সময় এবং কম দূরত্বের পথ ব্যবহারে সহায়তা করে। দুইটি কম্পিউটারের মধ্যে সংযোগে সহায়তা করে।

VoIP এর অনেক গ্রাহক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কাছে সাশ্রয়ী মাধ্যম যা ৬০% পর্যন্ত ফোন বিল সেইভ করে।
কলের কোয়ালিটি সাধারণ কলের চেয়ে ভালো। শব্দের সমস্যা অনেক কম হয়।
আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রোভাইডাররা প্রিমিয়াম সুবিধা দিয়ে থাকে যেমন – কল রেকর্ড, অ্যাটেন্ডেন্স-সহ ইত্যাদি।
যে-কোনো জায়গা থেকে ফোন সার্ভিস ব্যবহার করা যায়। আবার বাড়িতেও অতিরিক্ত সেট-আপের প্রয়োজন হয় না।
পৃথিবীর যে-কোনো স্থানে খুবই কম রেটে কল করা যায়।

Voip এর বেশ কিছু খারাপ দিকও রয়েছে। যেমন:
এর জন্য উচ্চ গতির স্ট্যাবল ইন্টারনেট সংযোগ দরকার।
ইমারজেন্সি নম্বরে কল করা যায় না বা কোনো জায়গায় কল করা গেলেও লোকেশন অটোমেটিক কেউ পাবে না।
VoIP ডিজিটাল সিগনালে কাজ করায় পুরোনো ফোনগুলো অকার্যকর এক্ষেত্রে।
প্যাকেট গ্রহণে স্ট্যাবল কানেকশন না হলে, অনেক সময় কথায় বাধা আসার সম্ভাবনা থাকে।
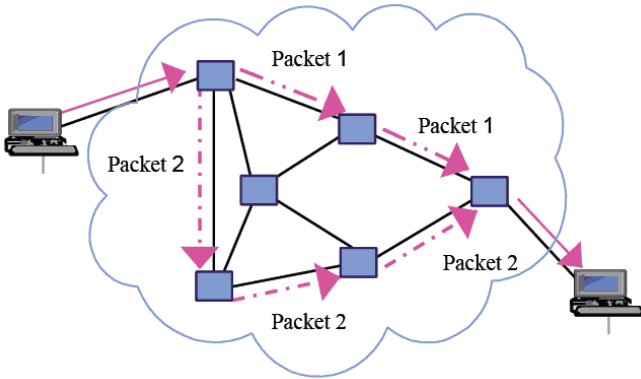
ENIAC নামের পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটারটির ভর ছিল ২৭ টনেরও বেশি। এই মোটা কম্পিউটার ১৮০০ স্কয়ার ফুটের জায়গা দখল করে বসেছিল।

দ্যা মিস্টিরিয়াস মেইল

মাহতাব মাহদী

রাতে ঘুমাচ্ছেন দেরি করে, মনে হলো ইমেইল চেক করে ঘুমাবেন।

ক্রিং ক্রিং... মেসেজ এসেছে!

মেসেজটা দেখে আপনার কথা আটকে গেল, কারণ মেসেজটা যে এসেছে ৪ মাস আগে মারা যাওয়া আপনার বন্ধুর অ্যাকাউন্ট থেকে!

কিন্তু এর পেছনের ঘটনাটা কী?
তো চলুন আজকে কথা বলা যাক 'দ্যা মিস্টিরিয়াস মেইল' নিয়ে।

বেশ কয়েক মাস আগে আমি আমার ক্লোজ একজন মানুষের এমন অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছিলাম। তবে এই ঘটনা ঘটারও আগে, ২০১৬ সালে এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটা কী ছিল আসলে? কেন ৪ মাস বা ৬ বছর আগে মারা যাওয়া কোনো একজন ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট থেকে ইমেইল বা মেসেজ এলো?

টিম রোম্যান এমনই দুর্ভাগা কিছু মানুষের মধ্যে একজন। তাঁর সাথেও এমনই একটা ঘটনা ঘটেছিল ২০১৬ সালে। তো রাতে টিম ঘুমানোর আগে মেইল চেক করছিলেন। সে সময় তাঁর মোবাইলে একটা মেইল এসেছিল। মেইলে লেখা:

"Did you hear me? I'm at your house. Clean your freaking attic!"

মেইলের সাবজেক্ট ছিল: I am watching!

মেইলটা এসেছিল ৩২ বছর বয়সী টিমের অনেকদিনের বন্ধু জ্যাক ফ্লোরেন্সের মেইল থেকে। জ্যাক আর টিমের বন্ধুত্ব ১৭ বছরের

ছিল। বন্ধুত্বটা মাস চারেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, কারণ হার্ট ফেইলরের কারণে মেইলটা আসার মাস চারেক আগে জ্যাক মারা যান!

মেসেজ পেয়ে টিমেরও প্রায় হার্ট যায় যায় অবস্থা! টিম পরবর্তিতে বলেন, জ্যাক ছাড়া তাঁর খুব কাছের কোনো ফ্রেন্ড ছিল না। আর জ্যাকের সাথে তাঁদের চিলেকোঠায় (ইংরেজিতে attic) অনেক সময় কাটাতেন টিম, কিন্তু চিলেকোঠাটা ময়লায় ভরপুর ছিল। জ্যাক বার বার তাড়া দিত টিমকে সেটা পরিষ্কারের জন্য, টিম করতেন না। এমনকি, মারা যাওয়ার বেশ কয়েকদিন আগেও নাকি জ্যাক বলে গিয়েছিলেন, “Tim, clean your freaking attic! Its so messy!”

টিম বলেছিলেন, জ্যাক ছাড়া সেখানে কেউ যায়নি। ফ্লোর নোংরা থাকায় জ্যাক ওঠার আগে বলেছিলেন, "better clean the attic before I go up there!" টিম পরবর্তিতে বিবিসিকে বলেন: এটা নিয়ে কেউ জানতই না! কারণ ওই চিলেকোঠায় কেউ যেতই না! টিম বলেন, "just I and he was up there! That's it!"

টিম প্রচণ্ড শক খেলেও কোনোমতে নিজেকে সামলালেন। কিছুদিন পর তিনি জানতে পারলেন, শুধু তিনিই নন! আরও একজনকে জ্যাক মেইল করেছেন! এবার তাঁর নিজের কাজিন, জিমি ম্যাকগ্রিউকে!

সেই নভেম্বরেই জ্যাকের কাজিন জিমি রাত সাড়ে ১০টার দিকে একটা মেইল পান। প্রথমে খুলে দেখেননি, পরে ঘুমাতে যাওয়ার আগে এই মেইল দেখে তাঁর চক্ষু রীতিমতো চরকগাছ!

এবারের সাবজেক্ট হেডিং ছিল: Hey Jimmy!

ভেতরে লেখা ছিল: How ya you doin? I knew you were gonna break your ankle, tried to warn you. Gotta be careful!

Tell Rock for me! Great song, huh? You're welcome!

Couldn't get through him! His freaking email doesnt work!

জিমি ইমেইল পাওয়ার আগের সপ্তাহে কাজ করতে গিয়ে নিজের বাড়ির দরজায় আঘাত পেয়ে গোড়ালি মচকিয়েছেন! কিন্তু তিনি দাবি করলেন, এই বিষয়ে তিনি প্রায় কাউকেই জানাননি, ফ্যামিলি মেম্বারদের অনেককেও না!

এখন এই দুটো মেইল থেকে কী বোঝা যায়? তাঁর ইমেইল হ্যাক হয়েছে? ফ্যামিলি সেটা মানতে নারাজ! কারণ তাঁর ব্যবহার করা সকল ডিভাইস এখন ইনঅ্যাক্টিভ! আর জ্যাকের মা বিশ্বাস করেন, তাঁর ছেলে কবর থেকে মেইল করেন! দুটো ইমেইল দেখে যেটা বোঝা যায়। কেউ ইমেইল হ্যাক করেছে, তাইতো? অন্তত ইমেইল লেখার ধরন হতে সেটাই বোঝা যায়। কারণ যা-হোক, মৃত মানুষ তো মেইল করতে পারে না! না কি মেইলটা আসলেই জ্যাক করেছেন মারা যাওয়ার আগে?

ফেইসবুকের রিমেম্বারিং সিস্টেম চালু হয়েছে ২০১৫ সাল থেকে, জিমেইল তাদের ইনঅ্যাক্টিভ মেইলগুলো রিমুভ করা শুরু করেছে ২০১৩ থেকে, টুইটার এখনো করেনি। তাই এর মাঝে জ্যাক মারা গেলেও তাঁর অ্যাকাউন্টগুলোর কিছুই করা সম্ভব হয়নি, কারণ পাসওয়ার্ড কেউ জানত না। আর রিসেট করার চেষ্টাও করেননি কেউ।

> এখন হ্যাক হলে কীভাবে হতে পারে? যেহেতু তাঁর ফোন ইনঅ্যাক্টিভ। তাঁর ডিভাইস চেক করে তাঁর মা বললেন, পাসওয়ার্ড রিসেটের কোনো মেসেজ বা ও টিপি নেই। ফলে যদি কেউ ঢুকে থাকে অবশ্যই আসল পাসওয়ার্ড ট্রাই করেই ঢুকেছে!

কেইসটা এখানে কমপ্লিকেটেড হয়ে গেল! কারণ কয়েকবার পাসওয়ার্ড ভুল টাইপ করলে বা পাসওয়ার্ড রিসেটের অপশনে ক্লিক করলে তো মেসেজ বা নোটিফিকেশন আসার কথা। সেটা যেহেতু আসেনি, সেহেতু যে হ্যাক করেছে, সে পাসওয়ার্ড জানত। আর জানামতে, কেউ এমন নেই। টিম ও জ্যাকের মা বলেন, "তাঁর

এমন কোনো ডায়েরি নেই যেখানে পাসওয়ার্ড লেখা," বা পাসওয়ার্ড কেউ জানে কি না, সেই বিষয়েও তাদের উত্তর ছিল, জ্যাক নাকি তাদের কিছুই জানাননি! ফিশিং এর চান্সও প্রায় নেই!

আরেকটা সম্ভাবনা থাকে যে মেসেজটা কি আগে সেন্ড করেছিলেন জ্যাক? হয়তোবা পরে পাঠানোর জন্য রেখে দিয়েছিলেন। এখন এখানে বাগড়া বাঁধায় জিমির কাহিনি। ৪ মাস আগে থেকে তিনি কীভাবে প্রেডিক্ট করতে পারলেন যে জিমির পা মচকাবে? এটা প্রায় অসম্ভব। তাই বলা যায়, মেসেজগুলো আগে থেকে পাঠানো হয়নি, পরে সেন্ড করা হয়েছে!

এইরকম হ্যাকিং পসিবল। বা কেউ হয়তো পাসওয়ার্ড জেনেই ট্রাই করেছে। কিন্তু পরবর্তিতে সঠিকভাবে জানা যায়নি আসলেই কে লগ ইন করেছিল জ্যাকের মোবাইল থেকে, বা আর কোনো ইমেইলও আসেনি কারো মোবাইলে জ্যাকের ইমেইল থেকে! অনেকে ধারণা করেন, জ্যাকের কোনো পরিচিতজন এই কাজটা করেছেন। অনেকের ধারণা অযৌক্তিক যে জ্যাকের আত্মা নাকি এসে ইমেইল পাঠিয়েছিল!

মৃত মানুষের আইডি হ্যাক করার এমন অসংখ্য উদাহরণ আছে, বেশিরভাগই ২০১০ বা এর আগের সময়কার খোলা আইডি! এখন এর সংখ্যা কমে গেছে অনেক। বাংলাদেশেও এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে। অনেক হ্যাকার শখের বশে করে থাকে, কেউবা কোনো উদ্দেশ্যে। যা-হোক, এই ঘটনাকে ইন্টারনেটে 'দ্যা মিস্টিরিয়াস ইমেইল' নামে আখ্যায়িত করা হয়, ইন্টারনেটের টপ ৬০ মিস্ট্রির একটা এই ঘটনা। কিন্তু কথা হচ্ছে, এটা কিন্তু কোনো অলৌকিক ঘটনা না, এক ধরনের হ্যাকিং!

ডিজিটাল ভয়েস অ্যাসিস্টেন্ট এলেক্সা ও সিরি আপনার প্রতিটা কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে। অবিশ্বাস্য হলেও এটা সত্য। আপনার কথাগুলো ক্লাউডে স্টোর করে, যাতে তারা সেসব ব্যবহার করে ব্যবহারকারীকে আরো ভালো এক্সপেরিয়েন্স দিতে পারে। তবে সেসকল রেকর্ডকৃত সাউন্ডগুলো যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় বলে তাদের দাবি।

বারকোড কী এবং কেন?

রওনক শাহরিয়ার

QR code বা Quick Response code সাধারণ কিছু হলেও, এটা ডেটা সংরক্ষণ সক্ষম। আমাদের দেশে এর তেমন প্রচলন না থাকলেও, বাহিরের দেশগুলোতে সর্বস্তরে এর প্রচলন রয়েছে এবং মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডেরও একটি অংশ। ১৯৪০ এর দশকে এর পেটেন্ট হলেও বাণিজ্যিকভাবে কার্যক্রম শুরু হয় কিন্তু তা '৬০ এর দশকে এবং '৮০ এর দশকে সম্পূর্নরূপে চালু হয়। সেসময়ের জেবরার মতো সাদা কালো ডোরাকাটা প্যাটার্নের পদ্ধতি এখনও অনুসরণ করা হয়, যার জন্য বিশেষ স্ক্যানারের দরকার হয় ডিকোড করার জন্য। তবে কিছুদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় প্রজন্মের 2D বারকোড এর স্থান দখল করে নেয়। চলুন দেখে নেওয়া যাক এই কোডগুলো কী এবং কীভাবে কাজ করে!

বর্তমানে দুই ধরনের বারকোড ব্যবহার করা হয়। বারকোডগুলো মূলত ডিজিট ধারণ ক্ষমতার দিক দিয়ে অনেকটা আলাদা। বারকোড দুটো হলো:

- 1 dimensional বা 1D বারকোড,
- 2 dimensional বা 2D বারকোড,

1D বারকোড:

1D বারকোড হলো সাদা ও কালো লাইনের সিরিজ, যা দ্রব্যের ধরন, আকার এবং রঙের তথ্য সংরক্ষণ রাখে। বারকোড বিভিন্ন প্রকারের হলেও, UPC আর EAN CODE সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত। দেখতে একই মনে হলেও কোনোটি ৬টি কোড আবার কোনোটি ১২ বা তার অধিক কোড হয়ে থাকে। এটা সম্পূর্ণ মেশিন রিডেবল জিনিস, স্ক্যানারে পাওয়া তথ্য সফটওয়্যারের মাধ্যমে দ্রব্য নির্ণয় করা হয়। তবে জনপ্রিয়তা ও বহুল ব্যবহারের জন্য এখানে শুধু UPC সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

Universal product code (UPC) কী?

UPC বা universal product code মূলত প্রোডাক্টের ওপর প্রিন্ট করা অংশ, যা দ্রব্য শনাক্ত করতে সাহায্য করে। এর স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে ISO/IECতে, যার নম্বর 15420। UPC হলো একমাত্রিক বারকোড এবং যার দুইটা অংশ আছে –

- মেশিন রিডেবল বারকোড (বারকোডের সিরিজ),
- আর ১২ ডিজিটের নম্বর যা বারকোডের নিচে থাকে।

Left Guard 0 5 1 0 0 0 Center Guard 0 1 2 5 1 7 Right Guard

Left-Side Codes	Right-Side Codes
0001101 = 0	1110010 = 0
0011001 = 1	1100110 = 1
0010011 = 2	1101100 = 2
0111101 = 3	1000010 = 3
0100011 = 4	1011100 = 4
0110001 = 5	1001110 = 5
0101111 = 6	1010000 = 6
0111011 = 7	1000100 = 7
0110111 = 8	1001000 = 8
0001011 = 9	1110100 = 9

Error Checks: Odd # of 1s, Begins 0, Ends 1 — Error Checks: Even # of 1s, Begins 1, Ends 0

Manufacturer's Code — Product Code

0 51000 01251 7

Type of Barcode: 0 = Standard, 2 = Weighed Items, 3 = Pharmacy, 5 = Coupons

Modulo Check Character Formula

3x(0+1+0+0+2+1)+(5+0+0+1+5)=23

Subtract the result of this formula from the next highest multiple of 10.

Modulo Check Character 30-23

এই কোড কাজ করে কীভাবে?

একটি বারকোডে থাকে মোট ৯৫টি ব্লক। মূলত বারকোডের ওপরে স্ক্যানার ধরলে নির্দিষ্ট রেঞ্জের আলো বের হয়, যা কোড শনাক্ত করে।
বারে থাকা কালো অংশের ওপর আলো পড়লে তা তেমন প্রতিফলিত করে না, কিন্তু সাদা অংশ আলো প্রতিফলিত করে। স্ক্যানার এই আলোর প্রতিফলন দেখে ০ বা ১ নির্ধারণ করে।
এখন কালো অংশের ওপর আলো প্রতিফলিত না হলে তা ১ হিসেবে ধরা হয় এবং আলো প্রতিফলিত হলে সেই অংশ ০।

ওপরের বারের দিকে লক্ষ করলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে।
প্রথম ব্লকে কালো বার হওয়ায় এটা থেকে কোনো আলো প্রতিফলিত হবে না অর্থাৎ এটি ১। আর পরের ব্লক সাদা হওয়ায় আলো প্রতিফলিত হবে এবং এটা হবে ০। এভাবে ৯৫টি ব্লক গণনা করা হয়।

এরপর বের হওয়া ০ ও ১কে আবার ১৫টি গ্রুপে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে ১২টি গ্রুপ বারকোডের নিচে থাকা নম্বরকে বোঝায়। আর বাকি ৩টা হলো গার্ড। এই গার্ড প্রথম, মাঝে ও শেষে থাকে যা কম্পিউটারকে সিগন্যাল দেয় শুরু ও শেষ কোথায়।

স্ক্যানার মূলত বারকোড বাম ও ডান দুই পাশ থেকেই নির্ণয় করে। মাঝের ১২ গ্রুপের সংখ্যা নির্ণয় পদ্ধতি মূলত আসকি কোড দিয়ে হয় এবং বাম ও ডান দিক থেকে গণনা হলে ভিন্ন ভিন্ন ফল আসবে। শুরু এবং শেষে থাকা গার্ডের ৬ সংখ্যা, যা এই সমস্যার সমাধান করে। মূলত এখানে থাকা ০/১ এর ওপর নির্ভর করে ডান বাম নির্ণয় হয়।

তারপর প্রতি ৮টি ডিজিট নিয়ে একটি সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। লক্ষ করলে দেখা যাবে বারকোডের নিচে থাকা নম্বর ও বারকোড থেকে বের হওয়া নম্বর পুরোপুরি এক! অর্থাৎ চেক করা হয় বারকোডের সাথে মিল বা অমিল রয়েছে কি না।

বারকোডের ধরন বোঝার উপায়:
বামপাশে বারকোডের বাহিরে থাকা সংখ্যা মূলত উপাদান সম্পর্কে নির্দেশ করে।

0 দিয়ে সাধারণ স্ট্যান্ডার্ড বারকোড,
2 দিয়ে ভারি দ্রব্য যেমন, মাংস বা ফল,
3 দিয়ে ফার্মেসীর দ্রব্য,
5 দিয়ে কুপন বোঝায়।

এরপরে বারকোডে থাকা ৫ ডিজিটের নম্বর কোন প্রতিষ্ঠান থেকে উৎপাদিত তার কোড। ওপরের থাকা কোডটি একটি স্যুপ কোম্পানির।

এরপরের পাঁচটি কোড দিয়ে কী প্রডাক্ট তা নির্দেশ করে। এটা সেই কোম্পানির চিকেন নুডুলস স্যুপ, তা এই অংশ নির্ণয় করে।

বারকোডের শেষের সংখ্যাটি পুরো বারকোডের ইরোর চেকিং করে। বারকোডের কোনো ত্রুটি আছে কি না তা শেষ বারের মতো চেক করা হয়, যেন নিশ্চিত হওয়া যায় আগের সংখ্যা দেখার উপায় ঠিক ছিল। একে modulo cheak character বলা হয়।

Modulo Cheak Character Formula:
এই পদ্ধতি শুরুতে এগারোটি সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে হয়। মূল অ্যালগরিদম কম্পিউটারে নির্ধারণ করা থাকে।
এখানে থাকা প্রথম ছয়টা নম্বর মূলত বিজোড় নম্বর যা প্রথমে একসাথে যোগ করা হয় এবং পরের পাঁচটি জোড় নম্বর তারপর।
প্রথম ছয়টি বিজোড় নম্বরের সাথে তিন গুণ করা হয়। এরপর জোড় ও বিজোড় থেকে প্রাপ্ত মান যোগ করা হয়।

৩×(০+৬+০+০+২+৬)+(৫+০+০+৬+৫)=২৩

এখানে যোগফল ২৩। এর পরের সর্বোচ্চ দশক এর সাথে ২৩ বিয়োগ করা হয়। প্রাপ্ত নম্বর যদি চেক নম্বরের সাথে মিলে তবে বুঝতে হবে বারকোডে কোনো সমস্যা নেই।

তাহলে, ৩০-২৩=৭ যা ইরোর চেকিং নম্বর। বা বারকোডটি সঠিক।

2D বারকোড:

পার্সেল, চিঠি, বিল, টিশার্ট, প্যাকেজিং এর একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে সাদা ও কালো রঙের বর্গক্ষেত্র, যা দেখতে অনেকটা অক্ষর ছাড়া পাজেল বা ক্রসওয়ার্ডের মতো। এগুলোতে দুই মাত্রিক (2D) বারকোড এবং সাধারণ বারকোডের মতো দ্রুত মেশিন-পাঠ্য। যেখানে সাধারণ বারকোডে একমাত্রিক লাইন ব্যবহার করা হয়, সেখানে 2D বারকোড সাদা-কালো বর্গক্ষেত্রের আকৃতির ও প্রচুর তথ্যযুক্ত হয়।

2D বার কোডের সাধারণ সুবিধা:

- যেখানে একমাত্রিক লাইনে কয়েক ডজন থেকে সর্বোচ্চ ২৫৬টি কোড থাকতে পারে, সেখানে সাধারণ QR কোডে ২০০০টি কোড মজুত করে রাখা যায় (এখানে প্রতিটা কোড অবশ্যই ০ অথবা ১ হবে)।
- বিল্ড ইন ইরোর চেকিং পদ্ধতি থাকায় এর ভুল ত্রুটি খুবই কম। যদি কোনো কোডে ক্ষতি হয় তবে সহজে বের করা যায় এবং কিছু বা পুরো কোড পুনঃপাঠ সম্ভব হয়।
- সাধারণ স্মার্টফোন, ট্যাবলেট, ক্যামেরা দিয়ে সহজে রিড করা সম্ভব।
- 2D বারকোড ম্যাসেজ আকারেও টেক্সট সেন্ড করা যায়।
- আর তথ্য এনক্রিপ্ট করলেও রাখা সম্ভব এতে।

2D বারকোডের বিভিন্ন প্রযুক্তি

সব 2D বারকোড দেখতে প্রায় একরকম হলেও, কাছে থেকে দেখলে ভিন্নতা লক্ষ করা যাবে। এর মধ্য কিছু 2D বারকোড জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত, আর কিছু এখনও প্রাইভেটভাবে ব্যবহৃত হয়। কয়েক ধরনের এমন বারকোড হলো–

১. QR code:

১৯৯০ সালে জাপানে প্রথম ব্যবহার শুরু হলে কিছু সময়ের মধ্যে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। এটা সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত 2D বার কোড। এর মাইক্রো ভার্সনও রয়েছে যা অল্প ডেটা সংরক্ষণে সক্ষম। এর বিভিন্ন ধরন রয়েছে যেমন, IQR Code (অনেক তথ্য সংরক্ষণ করে), SQRC(নিরাপদ, এনক্রিপ্ট ডেটা বহন করে), FrameQR (ট্র্যাডিশনাল কোড কিন্তু মানুষের দেখতে পাবে এমন ছবিসহ থাকে)।

২. Aztec code:

মাঝে ষাঁড়ের চোখের মতো বর্গক্ষেত্র, চারদিকে বিভিন্ন প্যাটার্নে তৈরি করা হয়।

৩. MaxiCode:

এরও মাঝে ষাঁড়ের চোখের মতো, চারদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র থাকে।

৪. PDF৪১৭:

এটা অনেকটা Qr কোডের মতো দেখতে, বিভিন্ন প্যাটার্ন ব্যবহৃত হয়।

৫. Semacode:

জাতীয় পরিচয়পত্রে এই ধরনের প্যাটার্ন ব্যবহৃত হয়। এই বারকোডের নাম 'Data-matrix code' যা ISO স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলে। অন্যান্য বারকোড থেকে এটা অনেকটা আলাদা।
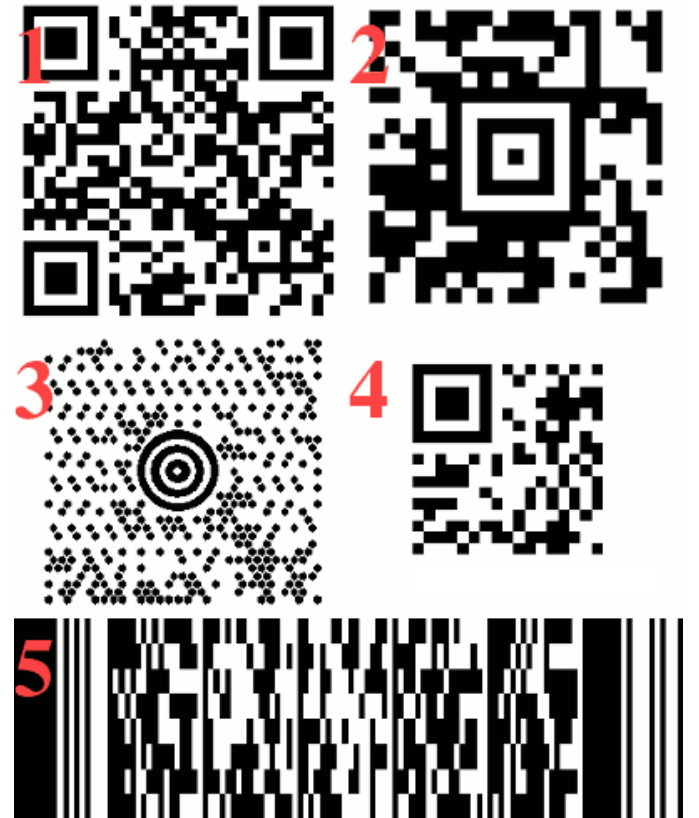
2D বারকোডের মধ্যে QR কোড সবচেয়ে পরিচিত এবং ব্যবহার ও তৈরি পদ্ধতি সবচেয়ে সহজ। এটা মেশিন পড়তে পারে, মানুষের জন্য নয়, তবে এই বারকোড এর বিভিন্ন অংশ দেখে তথ্য বোঝা সম্ভব। যদিও প্রতিটা কোড আলাদা হয়, তবে কমন পয়েন্ট ও দিক রয়েছে। এটা কীভাবে ডেটা ধারণ করে (নিচের ছবি অনুযায়ী) তার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো –

১. Quiet zone:
একটা ফাঁকা সাদা বর্ডার প্রিন্ট তথ্য থেকে অন্যান্য অংশ আলাদা রাখে।

২. Finder patterns:
বড়ো তিনটা কালো ও সাদা বর্গক্ষেত্র QR কোড নির্ণয় করা যায়। অন্যান্য বারকোডে এগুলো থাকে না।

৩. Alignment pattern:
এই অংশটি কোডটিকে সোজাভাবে স্ক্যানে সহায়তা করে। কোড যত বড়ো হবে এর আকারও তত বড়ো হবে।

8. Timing pattern:
এটা অনুভূমিক ও লম্বভাবে তিনটা Finder patterns এর মধ্যে থাকে এবং সাদা ও কালো রঙের বিকল্প। এই প্যাটার্ন QR কোড এ পৃথক পৃথক তথ্য শনাক্তে সহায়তা করে এবং কোডে ক্ষতি বা নষ্ট হলেও বেশ কার্যকরী।

5. Version information:
QR কোডের ৪০টি ভার্সনের স্ট্যান্ডার্ড আছে, এই ভার্সনের তথ্য (দুইটা finder patterns এর কাছাকাছি স্থানে) সহজে বোঝা সম্ভব যা নির্দিষ্ট কোডে ব্যবহৃত হয়।

৬. Data cells:
প্রতিটা সাদা ও কালো স্কয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মতো নয়। বরং এতে আসল ডেটা সংযুক্ত থাকে।

৭. Format information:
এই প্যাটার্নে ভুলের পরিমাণ ও ডেটা মাস্ক প্যাটার্নের তথ্য থাকে।
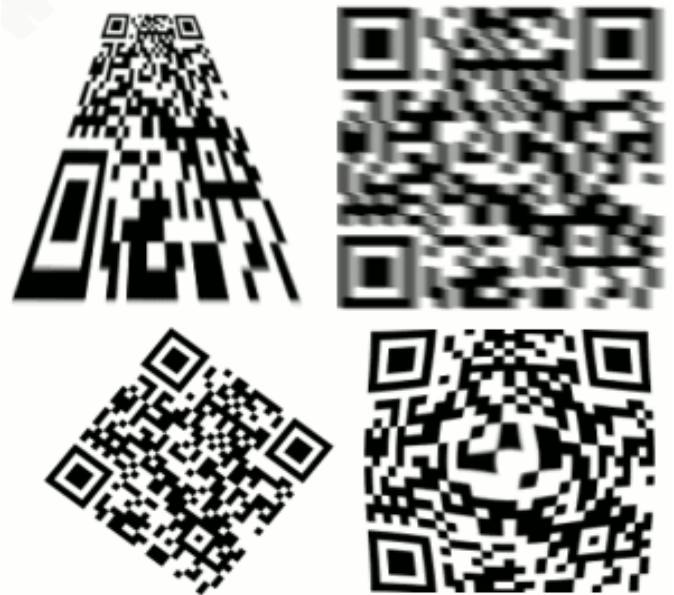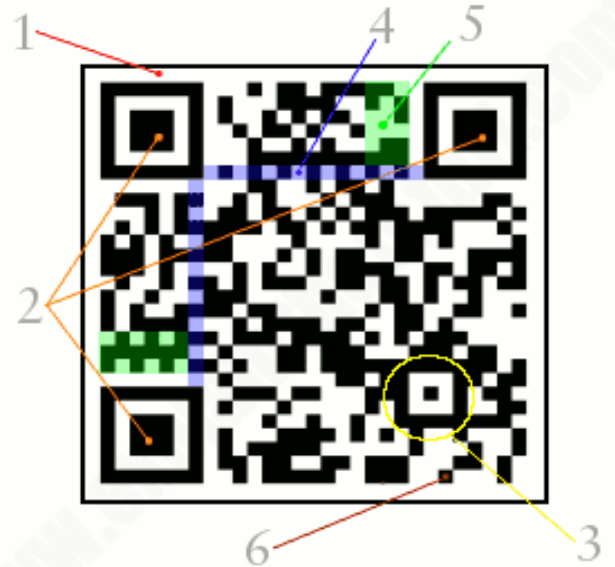
2D বারকোড প্রযুক্তির ব্যবহার:
নাসা প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানদের একটি, যারা এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল তাদের মহাকাশযানের তথ্য সংরক্ষণে! কারণ স্পেইস শাটলে একবার কোড বসালেই হতো, পেপার লেভেল এর চেয়ে অনেক বেশি তথ্য প্রদান করা যেত।

বারকোডের একটা বড়ো সুবিধা হলো Url লিংক প্রদান করা। কার্ড বা কোথাও লিংকের জন্য বড়ো স্পেইস না দিয়ে বারকোড ব্যবহার করা হয়। এতে স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যান করে সহজে সাইট প্রবেশ করা যায়।
এছাড়া টিকেট সিস্টেম, পার্সেলের মতো জায়গায় ব্যবহৃত হয়।
পন্যের প্রাইজ ট্যাগ এবং পেমেন্ট ট্যাগ হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

ওয়াই-ফাই পার্সওয়ার্ড শেয়ার, বা তথ্য আদান প্রদানে ডিভাইস পরিচিতি দেওয়ার সময়।
এছাড়া গুগল অথেনটিকেটরের মতো ভেরিফিকেশন এর মাধ্যমে করা হয়।

QR code ও সাধারণ বারকোড স্ক্যানের উপায়:

সাধারণত রিডেবল স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যান করা হয়।
তবে স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে অ্যাপল ও স্যামসাং বিল্ট-ইন এই সুবিধা দিয়েছে।
অন্যান্য ব্রান্ডের রিসেন্ট ফোনগুলোতে সাধারণ ক্যামেরা অ্যাপসেই স্ক্যান সুবিধা পাওয়া যায়।
তবে ফোন কিছুটা পুরাতন হলে প্লেস্টোর/অ্যাপস স্টোর থেকে থার্ড পার্টি অ্যাপস নামিয়ে নিতে হবে।

QR code বানানোর উপায় কী?

অনলাইনে অনেক ওয়েবসাইটে QR code বানানোর সুবিধা পাওয়া যায়।
বারকোড মূলত নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান ও প্রোডাক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।
আর QR Code-এ অনেক ডিজিট প্রবেশ করানো সম্ভব হওয়ায় নিজের ইচ্ছেমতো কোড বানিয়ে নেওয়া যায়।
ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই তথ্য বা লিংক দিয়ে QR code বানানো যায়।
এমন একটি সাইট www.the-qrcode-generator.com
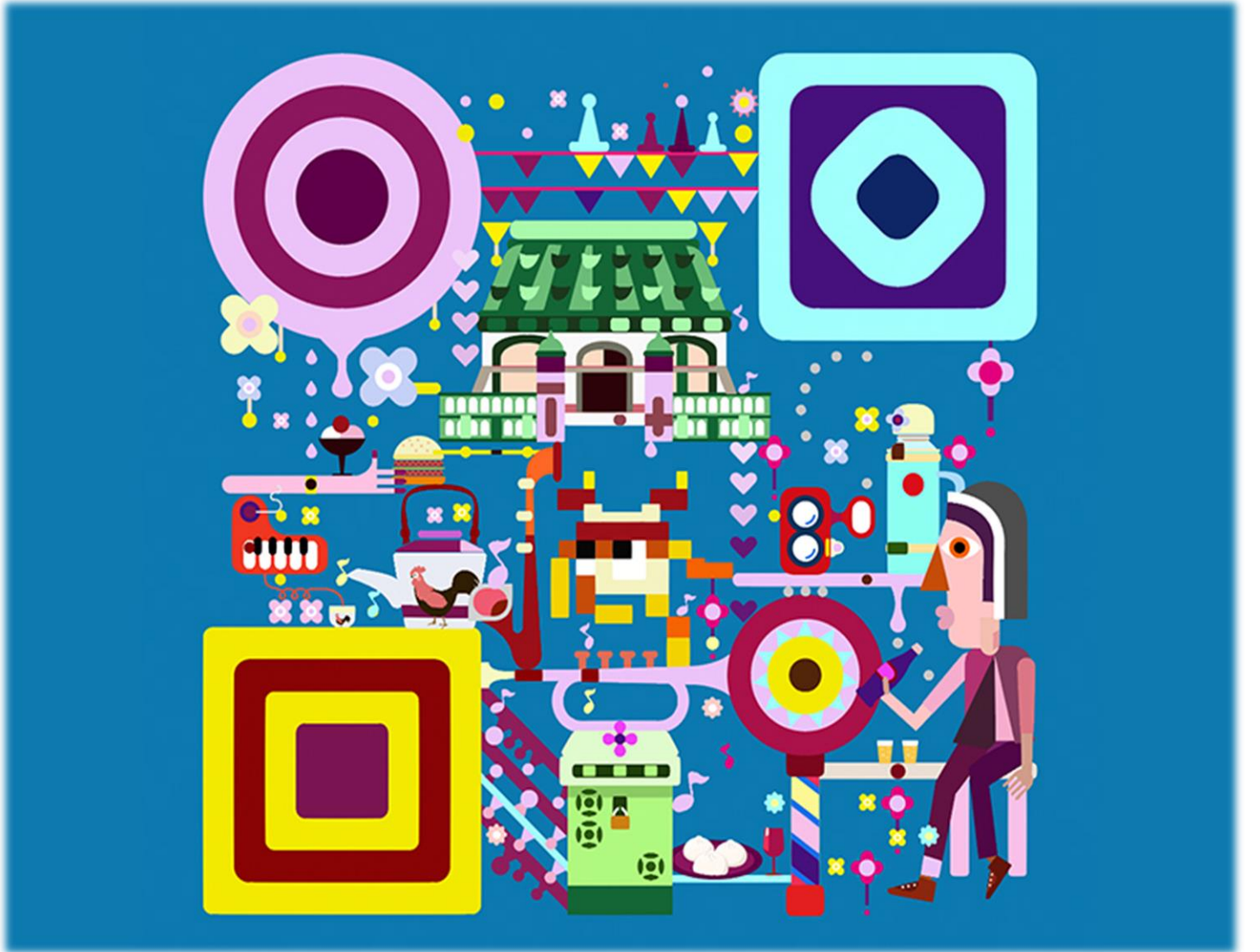
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

ধ্রুব নাথ

কখনো কি ভেবে দেখেছেন, আপনি প্রায় সময় ব্যাঙাচির জন্ম যেখানে, অর্থাৎ ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান গ্রুপে (বিসিবিতে) ঢুঁ মারেন বিধায় ফেসবুক আপনার টাইমলাইনে বিসিবির কন্টেন্টগুলো কেন এত বেশি দেখায় বা ইউটিউব কীভাবে আপনার পছন্দের ভিডিয়োগুলো বুঝতে পারে অথবা গুগলে এত্ত এত্ত তথ্যের ভিড়ে আপনার প্রয়োজনীয় জিনিস খুঁজে বের করে দেয়? তাছাড়া ধরুন- না, গুগল ম্যাপ কীভাবে কাজ করে? সবাই হয়তো বুঝতে পেরেছেন আমি Artificial Intelligence বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে বলছি। প্রায় অনেকে হয়তোবা জানে। তবুও আমি এই আর্টিকেলে বোঝানোর চেষ্টা করব – আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স কী, এটি কীভাবে কাজ করে, এর চাহিদা, আর কীভাবে এটি সমগ্র বিশ্বের চেহারা বদলে দিতে চলেছে।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স এর শুরু:

আমাদের অনেকের মধ্যে ধারণা আছে, এআই-এর শুরু গত কয়েকে দশকে। কিন্তু সত্যিটা ঠিক তা নয়। হ্যাঁ, বলা যায় গত কয়েক বছরে এর ফিল্ডটা অনেক এগিয়েছে। কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স এর ছাপ প্রাচীন মিশরের ফোক স্টাডিজ বা লোকাচারবিদ্যায় পাওয়া যায়। ১৯৫০ সালে অলেন টুরিং একটি ল্যান্ডমার্ক পেপার প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি এক ধরনের মেশিনের সম্ভাবনা তুলে ধরেন যেটি চিন্তা করতে পারে। ১৯৫৬ সালে ডাটমাউফ কনফারেন্সে জন ম্যাকার্থি প্রথম 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স' শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি এআই-কে ডিফাইন করেন এভাবে– "The science and engineering of making intelligent machines in a sense." সেজন্য তাকে ফাদার অব এআই বলা হয়। পরবর্তীকালে তিনি Lisp নামে প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ ডিজাইন করেন, যা এআই

ফিল্ডে জনপ্রিয়। ১৯৫৯ সালে এমআইটি প্রথম এআই ল্যাব প্রতিষ্ঠা করেএবং তখন থেকে AI এর ওপর গবেষণা শুরু হয়। ১৯৯৭ সালে IBM এর Deep Blu নামে AI প্রজেক্ট তখনকার দাবা চ্যাম্পিয়ন গ্যারি-কে হারিয়ে রীতিমতো আলোড়ন তুলে দেয়। এরই মধ্যে অনেকেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজিন্স এর ওপর নানাভাবে কাজ করে সেগুলো নিয়ে খচখচানি আর না-ই করলাম।

AI বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কী?

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কী তা বোঝার আগে আমাদের বুঝতে হবে বুদ্ধিমত্তা কী?চিন্তা-চেতনা, সৃজনশীলতা, আত্মসচেতনতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতাই হলো বুদ্ধিমত্তা। তাহলে কোনো যন্ত্র কিংবা প্রোগ্রামের বুদ্ধিমত্তাই হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। অর্থাৎ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন কম্পিউটারের থাকবে সমস্যা সমাধান ও ডিসিশন মেকিং এর ক্ষমতা, সেল্ফ অ্যাওয়ারনেসহ আরও কিছু বৈশিষ্ট্য।

AI-কে তিনটি স্টেজ বা পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

Artificial Narrow Intelligence (ANI): ANI-কে উইক এএনআই ও বলা হয়। ANI বলতে সেই অবস্থাকে বোঝায় যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন যন্ত্র বা প্রোগ্রাম কিছু নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে, যেটি সুনির্দিষ্ট একটি বিষয়ের উপর সম্ভাব্য সমাধান বিশ্লেষণ করে মতামত প্রদান করে। উদাহরণ হিসেবে বর্তমান সময়ের কথাই বলা যায়। এখন পর্যন্তএআই-এর যত আবিষ্কার আছে সবইANI-এর স্তরে পড়ে। যেমন: অ্যালেক্সা, ফেইস ভেরিফিকেশন অ্যাপসমূহ, IBM এর Watson, সেল্ফ ড্রাইভিং গাড়ি, সোশ্যাল মিডিয়াসমূহে (Facebook, Youtube, Quora, Amazon ইত্যাদি) ব্যবহৃত এআই, গেইম ডেভেলপমেন্টে ব্যবহৃত এআই ইত্যাদি।

Artificial General Intelligence (AGI): AGI,strong AI নামেও পরিচিত। এটি সেই সময়কে বুঝিয়েছে যখন এআই কম্পিউটারসমূহ মানুষের মতো চিন্তা করতে পারবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখবে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০৪০ সালের মধ্যে আমরা সেসকল প্রযুক্তি তৈরিতে সক্ষমতা অর্জন করব।

Artificial Super Intelligence (ASI): এটি এখনো হাইপোথেটিক্যালি সম্ভব,যেটা আমরা সাই-ফাই মুভিতে দেখি। এই স্টেজের এআই কম্পিউটারগুলো মানুষের ওপরে গিয়ে বুদ্ধিমত্তা দেখাতে সক্ষম হবে। এটি নিয়ে বেশি কিছু বলারও নেই।

কাজের ওপর ভিত্তি করে AI-কে চার ভাগে ভাগ করা যায়:

Reactive Machine: AI এর মৌলিক অংশের বেশিরভাগ রিঅ্যাক্টিভ টাইপের হয়। এরা মেমোরি তৈরি করতে পারে না। এতে করে অতীতের অভিজ্ঞতা বর্তমানে ব্যবহার করতে সক্ষম না। এগুলো চারপাশ পর্যবেক্ষণ করে কাজ করতে সক্ষম। যেমন – IBM এর DEEP BLU দাবার চাল কীভাবে দিতে হয় তা জানত এবং প্রতিপক্ষের বা নিজের সম্ভাব্য চালগুলো বলতে পারত। কিন্তু অতীতের চালগুলো বলতে পারত না।

Limited Memory: এসব এআই-এর কিছু মেমোরি থাকে যার মাধ্যমে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। যেমন – সেল্ফ ড্রাইভিং গাড়িগুলো আশেপাশের গাড়ি ও রাস্তার অবস্থান, ট্রাফিক সিগন্যাল এবং অবজেক্ট ডিটেক্ট করে সিদ্ধান্ত নেয় কীভাবে যাবে। কিন্তু এরা পরবর্তীর জন্য কোনো ডেটা সেইভ করে রাখে না।

Theory of Mind: ভবিষ্যতের এসব এআই কম্পিউটারগুলো কোনো নির্দিষ্ট জিনিস নিয়ে কাজ করবে না। এদের থাকবে মানুষের মতো মন অথবা ইমোশন যেটার মাধ্যমে তারা নিজের ও জগতের বিষয়গুলো বুঝবে এবং সে হিসেবে বিহেভ করা বা চারপাশের সাথে ইন্টারেক্ট করার চেষ্টা করবে। যেমন – MIT researcher দ্বারা তৈরি Kismet অথবা Hong kong বেসড কোম্পানি Hanson Robotics এর সোফিয়া।

Self-awareness: এসব AI এতটাই উন্নত হবে যে, এদের মাঝে চেতনা দিয়ে দেওয়া হবে। এতে করে সে নিজেকে একটি সত্তা মনে করবে। যাদের কোনো প্রকার নির্দেশনার প্রয়োজন হবে না, তারা মানুষের মতো চিন্তা-ভাবনা করতে সক্ষম হবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অংশসমূহ:

মেশিন লার্নিং: এটাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাবসেটও বলা যায়। মেশিনকে ডেটা দেওয়া হয় মেশিন সেটির ওপর ভিত্তি করে ডিসিশন মেইক করে। যেমন – ফেইসবুক, ইউটিউব এর অ্যালগরিদম।

ডিপ লার্নিং: এটাকে মেশিন লার্নিং এর সাবসেটও বলা যায়, যেটা নিউরাল নেটওয়ার্ক কনসেপ্টকে ব্যবহার করে জটিল সব প্রবলেমকে সলভ করে।

Natural Language Processing:
এর মাধ্যমে কম্পিউটার আমাদের ভাষা বুঝতে পারবে এবং সে হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। উদাহরণ হিসেবে টুইটারের কথা বলা যায়।

Object Detection: যন্ত্র কীভাবে আশেপাশের বস্তু কিংবা মানুষকে বুঝতে পারবে তাই অবজেক্ট ডিটেকশন এর আলোচনা। যেমন –
অটো পাইলট গাড়িসমূহ।

Robotics: রোবটিক্স কী–তা আমরা সবাই জানি। এটিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স। এমন কিছু প্রজেক্টের নাম যদি বলি, যেমন –সোফিয়ার কথা তো অনেক আগেই বলেছি। তাছাড়া California বেসড কোম্পানি Realbotix এর রোবট Harmony, ওসাকা ইউনিভার্সিটির Erica, জিয়াজিয়া রোবট ইত্যাদি।
এছাড়া আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স এর আরও শাখা রয়েছে – কম্পিউটার ভিশন, এক্সপার্ট সিস্টেম, Fuzzy logicI

AI এর ব্যবহার:
MuseNet একটি ডিপ নিউরাল নেটওয়ার্ক সিস্টেম যেটা ১০ ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টস ব্যবহার করে মিউজিক কম্পোজ করতে পারে। Amazon alexa ডিভাইসটিকে অর্ডার দিয়ে আপনি বাসার ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলোকে নিয়ন্ত্রণসহ অন্য ধরনের কাজ করাতে পারবেন। যেমন: রাইড বুক করা, পিৎজা অর্ডার। গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট আরেকটি এআই বেসড সিস্টেম যেটা ন্যাচারাল ল্যাংগুয়েজ প্রসেসর এর মাধ্যমে আপনি তাকে ভয়েজলিঅর্ডার দিয়ে অ্যাপয়েনমেন্ট বুকসহ কলও দিতে পারবেন। মহাকাশ গবেষণায় এআই বিরাট অবদান রাখতে পারে, যা মানুষ দ্বারা সম্ভব নয়। বর্তমানে গবেষণায় ডেটা অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে এআই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া মঙ্গলে থাকা নাসার রোভার রোবটে AI ব্যবহৃত হয়েছে। গেমিং ইন্ডাস্ট্রিতে বর্তমানে বড়ো পরিবর্তন আসার মূল কারণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার। ভিডিয়ো গেমগুলোকে আরও চ্যালেঞ্জিং ও আনন্দদায়ক করতে এআই এর অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়া হেলথকেয়ার অথবা ব্যাংকিং খাতে এআই এর ব্যবহার তুমুল গতিতে বাড়ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন অ্যাপস অথবা প্রযুক্তি গ্রাহক পর্যায়ে সেবাকে আরও সহজ করে দিয়েছে। প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ব্যবহার বাড়ছে। আমি শেষে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনারা বিস্তারিত দেখতে পারবেন।

AI এর উন্নতি:
এর অর্থনীতি তুমুলগতিতে বাড়ছে। অনেকে অবাক হবে যে ২০১১ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত এই সেক্টরের স্টার্ট আপ সমূহে ইনভেস্টমেন্টের পরিমাণ ছিল ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর ধারণা করা যাচ্ছে, ২০২০ থেকে ২০২৪ সালে এর পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে ৫০.১ থেকে ১১০ বিলিয়ন ডলারে। তাছাড়া ২০১৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত এর বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ২০.১% হবে বলে ধারণা করা হয়। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। আমাদের দেশে এআই ভিত্তিক স্টার্ট আপ অনেক আগে থেকে হয়ে আসছে। যেমন:Socian Ltd, Cramstack, Infolytx I এছাড়া বিশ্বব্যাপী রয়েছে Tempus, DataRobot, Ascent, Grammarly এর মতো ইত্যাদি ছোটো ছোটো কোম্পানি। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়ায় এই ফিল্ডটা ভালোভাবেই ডেভেলপ করছে। পুরো বিষয়টা বুঝতে নিচে লিঙ্কটা দিচ্ছি, একটু ঢুঁ মেরে আসবেন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভয়:
এমন কথা শুনেছেন হয়তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স আমাদের ইতিহাসে সর্বশেষ আবিষ্কার বা সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ অথবা ভবিষ্যতে এটি মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ নেবে। কথাগুলো মোটেও উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। একবার ভেবেই দেখুন এআই কম্পিউটারগুলোর মানুষের মতো বা তার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ দেখাতে পারবে। আর তাদের কাজের দক্ষতা থাকবে মানুষের থেকে কয়েকগুণ বেশি। স্টিফেন হকিং তো বলেই গিয়েছেন, "The development of full artificial intelligence could spell the human race".

তাছাড়া এআই নিয়ে ইলন মাস্ক এর উক্তি – "AI is a fundamental risk to existence of human civilization."
যা-হোক সবকিছুর যেমন ভালো-খারাপ দুটোই আছে, ঠিক সেরকম এটিও। তাই আমাদের উচিত এটিকে নিয়ে আশাবাদী থাকা।

কীভাবে শিখা শুরু করব?

এবার সর্বশেষে বলি কীভাবে শেখা শুরু করবেন? এত কিছু বলার পর নিশ্চয় বুঝে গেছেন, ভবিষ্যতে এর চাহিদা কতটুকু?
শেখা শুরু করার আগে আপনার কিছু জিনিস জানা উচিত:

১.প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ জানতে হবে (পাইথন এ ক্ষেত্রে জনপ্রিয় কারণ এর কমিউনিটি বড়ো,লাইব্রেরি বেশি, তাছাড়া সহজ)।
২.গণিত জানতে হবে – বিশেষ করে ক্যালকুলাস, প্রোবাবিলিটি,স্ট্যাটিটিকস এর বেসিক থাকতে হবে।
৩.সময় আর কমিটমেন্ট।

আর অনলাইনে অনেক ফ্রি কোর্স আছে, যেমন – Coursera, EdX, Udacity ইত্যাদির মতো প্ল্যাটফর্মে।
বেসিক লেভেল পার করলে আপনি নিজেই বুঝে যাবেন পরবর্তীতে কী করতে হবে।

প্রতি মাসে ৬০০০ এর মতো কম্পিউটার ভাইরাস তৈরী এবং উন্মুক্ত করা হয়। যেখানে ১৯৯০ এর মাত্র ৫০টা জ্ঞাত ভাইরাস ছিল। প্রথম কম্পিউটার ভাইরাস মোটেও ক্ষতিকর কিছু ছিল না।
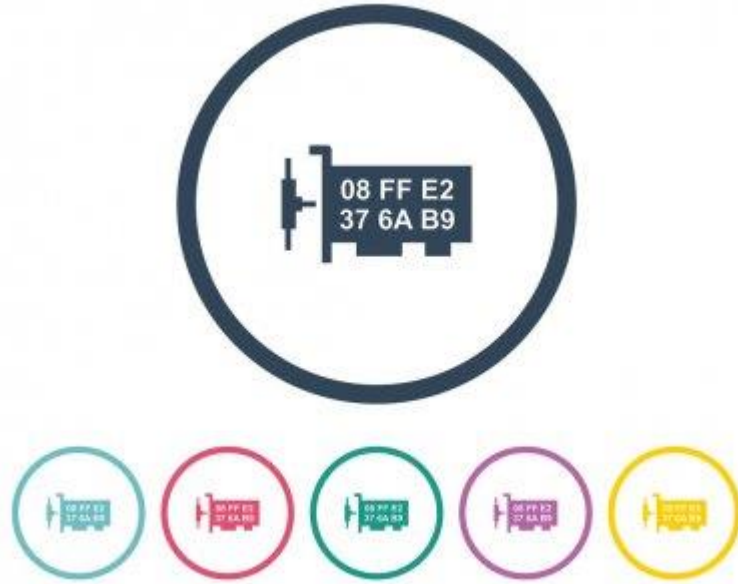
MAC Address কী এবং কেন?

রওনক শাহরিয়ার

ব্রাউজারে কোনো লিঙ্কে ক্লিক করলে সেই লিঙ্কের ওয়েবসাইটটি জানে আপনার ডিভাইসে কী সেন্ড করতে হবে। সাইট থেকে প্যাকেট সেন্ড করা হয় আপনার কাছে। সেটা অন্য কাউকে বা প্রতিবেশীকেও সেন্ড করবে না। কারণ ওয়েবসাইটটা আপনার আইপি অ্যাড্রেস সম্পর্কে অবগত যেটা অনেকটা চিঠি পাঠানোর ঠিকানার মতো কাজ করে। আইপি অ্যাড্রেস (IP Address) মডেম এর জন্য নির্ধারিত থাকে। ডেটা প্যাকেটগুলো সেই আইপি অ্যাড্রেস অনুসরণ করে আসে। তবে বর্তমানে প্রায় সবারই রাউটারের সাথে অনেকগুলো ডিভাইস সংযুক্ত থাকে – ওয়্যারলেস বা ল্যান দুইভাবেই। স্মার্টফোন, ট্যাবলেট, ল্যাপটপ, কম্পিউটারসহ আরও অনেক ডিভাইস প্রায় একই সময়ে চালানো হয়ে থাকে। তাহলে রাউটার কীভাবে জানে ডেটা নির্দিষ্ট কোন ডিভাইসে সেন্ড করতে হবে, সেটা আপনার না আপনার আব্বু-আম্মুর ফোনে?

এখানেই আসে MAC address এর কাজ। প্রতিটা ডিভাইসে Network Interface Card বা NIC থাকে যার হার্ডওয়্যার অ্যাড্রেস হলো এই MAC অ্যাড্রেস। IP (আইপি) অ্যাড্রেস যেখানে TCP বা নেটওয়ার্ক সফটওয়্যারের সাথে সংযুক্ত থাকে, সেখানে MAC অ্যাড্রেস নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারের হার্ডওয়্যারের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আসুন জেনে নিই MAC অ্যাড্রেস আসলে কী।

MAC অ্যাড্রেস জানার সাথে সাথে IP সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি। এজন্য ব্যাঙাচির **'আইপি অ্যাড্রেস: ওয়েব জগতের ঠিকানা'** শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে আসতে হবে।

MAC Address:

MAC অ্যাড্রেস হলো ইউনিক ৪৮ বিটের হার্ডওয়্যার নম্বর যা NIC তৈরি করার সময় প্রদান করা হয়। স্ট্যান্ডার্ড IEEE 802-এ ডেটা লিঙ্ক স্তর প্রাথমিকভাবে দুই স্তরে বিভক্ত হয়-

1. Logical Link Control (LLC) Sublayer.
2. Media Access Control (MAC) Sublayer.

MAC অ্যাড্রেস ডেটা লিঙ্ক স্তরের Media Access Control (MAC) ব্যবহার করে। MAC অ্যাড্রেস পৃথিবীর প্রতিটা ডিভাইসের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। মিলিয়ন মিলিয়ন নেটওয়ার্ক ডিভাইস প্রচলিত আছে, সেজন্য প্রতিটা ডিভাইস স্বতন্ত্রভাবে শনাক্ত করা জরুরি।

MAC অ্যাড্রেস মূলত ১২ ডিজিটের হেক্সাডেসিম্যাল নম্বর (৬ বাইট বাইনারি নম্বর), যার বেশিরভাগ কোলন-হেক্সাডেসিম্যাল চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়। MAC অ্যাড্রেসের প্রথম ছয় ডিজিট ডিভাইস প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান শনাক্ত করার জন্য, যাকে OUI (Organization Unique Identifier) বলা হয়। IEEE Registration Authoritiy Committee ডিভাইস প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট এই অংশটি দিয়ে থাকে।

কয়েকটা প্রচলিত কোম্পানির প্রথম ছয় ডিজিট:
CC:46:D6 - Cisco
3C:5A:B4 - Google, Inc.
3C:D9:2B - Hewlett Packard.
00:9A:CD - Huawei Technologies Co., Ltd.

পরের ছয় ডিজিট Network Interface Controller–কে বোঝায়, যেটা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান দিয়ে থাকে।

ওপরে বলা MAC অ্যাড্রেসে কোলন-হেক্সাডেসিম্যাল চিহ্ন বাদেও হাইফেন, Period-separated চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

ডিভাইসের নির্দিষ্ট MAC অ্যাড্রেস খোঁজার উপায় :

অপারেটিং সিস্টেম কমান্ড –

UNIX/Linux – ifconfig -a
ip link list
ip address show

Windows OS – ipconfig /all

MacOS– TCP/IP Control Panel

Andriod Setting>My device>All specs>Status.

iOS setting>General>about>wi-fi address.

MAC অ্যাড্রেসও বিভিন্ন ধরনের হতে পারে –

ইউনিকাস্ট:
ইউনিকাস্ট অ্যাড্রেস ফ্রেইমে ইন্টারফেস (রাউটার) থেকে তথ্য শুধু নির্দিষ্ট NIC-তে প্রেরণ করা হয়। MAC অ্যাড্রেস ইউনিকাস্ট এর একমাত্র মাধ্যম।

মাল্টিকাস্ট:
মাল্টিকাস্ট অ্যাড্রেস নির্দিষ্ট গ্রুপের ডিভাইসের তথ্য প্রেরণে সহায়তা করে।
এখানে প্রথম আটটি নম্বর একই রাখা হয়, বাকিগুলো ডিভাইস অনুযায়ী।

ব্রডকাস্ট:
ব্রডকাস্টে নেটওয়ার্কের প্রতিটা ডিভাইসে একই তথ্য প্রেরণ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটা ডিভাইসের MAC অ্যাড্রেস, ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস (FF-FF-FF-FF-FF-FF) হিসেবে কাজ করে। কোনো ডিভাইস নেটওয়ার্কের প্রতিটা ডিভাইসে তথ্য পাঠাতে চাইলে এই অ্যাড্রেসকে ম্যাক অ্যাড্রেস হিসেবে ব্যবহার করে।

MAC অ্যাড্রেস দিয়ে রাউটারে ইউজার ব্লক:

MAC অ্যাড্রেস স্বতন্ত্র একটা নম্বর। তাই অনেক রাউটারে wireless Mac filtering আলাদা অপশন থাকে।
এখানে ওপরে বলা পদ্ধতি অনুসরণ করে MAC অ্যাড্রেসটি রাউটারে অ্যাড করলে সেই ডিভাইস বাদে অন্য কোনো ডিভাইস রাউটারে কানেক্টেড হতে পারবে না। সর্বোচ্চ ডিভাইস সংখ্যা রাউটারের ওপর নির্ভর করে এবং কেউ রাউটারের পাসওয়ার্ড পেয়ে গেলেও ইন্টারনেট সংযোগ পাবে না। কারণ রাউটারে তার ডিভাইসের ম্যাক অ্যাড্রেস সেইভ নেই।
এভাবে রাউটারে ইউজার সংখ্যার লিমিট ও সুরক্ষার মান বাড়ানো যায়।

চিনের ৭০% বেচাকেনাই মোবাইল ভিত্তিক, করোণাকালিন যার হার আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ৪৬% পণ্য কেনা-বেচা হয় অনলাইনে।

ফান্ডামেন্টাল অফ কোডিং অ্যান্ড প্রোগ্রামিং

সাইয়েদ হাসান

কোডিং ও প্রোগ্রামিং এই দুইটা শব্দের সাথে আমরা সবাই মোটামুটি পরিচিত। অনেকে প্রোগ্রাম বলতে যা বুঝে, কোডিং বলতেও তা বুঝে। কিন্তু আদতে দুটি আলাদা ব্যাপার, তাদের কাজও আলাদা।

> 'কোড' মানে হলো কম্পিউটারকে দেওয়া কোনো ইন্সট্রাকশন এর সেট, যেটা প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ দিয়ে করা হয়। এই 'কোডিং'গুলো আমাদের কম্পিউটারের সাথে কথা বলতে, কম্পিউটারের ভাষা বুঝতে সাহায্য করে।

প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে কোড আর প্রোগ্রাম এক না! এদের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। প্রথমেই এই দুইটা একটা খোলাসা করি।

কম্পিউটারকে দিয়ে যদি আমরা কোনো কাজ করিয়ে নিতে চাই, তাহলে প্রথমে তাকে কাজ বুঝিয়ে দিতে হবে। সেই কাজের বস্তু হলো প্রোগ্রাম। কাজ বুঝিয়ে দেওয়াটাই হলো প্রোগ্রামিং। যেমন: আমি একটি অ্যাপ্লিকেশন ওপেন করতে চাই। প্রথমেই কম্পিউটারকে বলে দিতে হবে কীভাবে কী করলে এই অ্যাপ্লিকেশন ওপেন হবে। এই বলে দেওয়ার সিস্টেমটাই প্রোগ্রামিং।

কিন্তু আমি আপনি যদি আমাদের ভাষায় কম্পিউটারেকে কিছু করতে বলি, কম্পিউটার বুঝবে না। কারণ কম্পিউটারের মাতৃভাষা 'মেশিন ল্যাংগুয়েজ'। কিন্তু মেশিন ল্যাংগুয়েজ দিয়ে কাজ করতে গেলে আমাদের অনেক সময় লাগবে, শ্রম লাগবে, মেমোরি, পাওয়ার ইত্যাদি লাগবে। তাই আমরা আমাদের বোধগম্য কিছু ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করি। যে ল্যাংগুয়েজ দিয়ে আমরা কম্পিউটারকে একটা ইন্সট্রাকশন দিই সেই ল্যাংগুয়েজ ইন্সট্রাকশনকে কম্পাইল করে কম্পিউটারকে বুঝিয়ে দেয়। ফর

এক্সাম্পল, আমাদের বোধগম্য একটা ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করে আমি কম্পিউটারকে সহজেই বলে দিতে পারি এই অ্যাপ্লিকেশন এভাবে ওপেন হবে, এভাবে এই অ্যাপ্লিকেশনে অ্যাক্সেস পাওয়া যাবে।

এই প্রোগ্রাম ও কোডিং এর মাঝখানে যার অবস্থান সেটাই হল অ্যালগরিদম। যা-হোক, এই আর্টিকেল প্রোগ্রাম ও কোডিং নিয়ে। অ্যালগরিদম ঢুকিয়ে বেশি জটিল করতে চাচ্ছি না।

কোডিং ও প্রোগ্রামিং এর ফান্ডামেন্টাল বিষয় হলো কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ কম্পিউটারের ভাষা না! কম্পিউটারের ভাষা হলো বাইনারি! জাস্ট 1 এবং 0 ! বাইনারি হচ্ছে সবচেয়ে ব্যাসিক যেটা কম্পিউটার খুব সহজে বুঝতে পারে। আসলে যেটা কম্পিউটারের মাতৃভাষা, সেটা সহজে না বুঝলে আর কোন ভাষা বুঝবে?

এই বাইনারিকে মেশিন ল্যাংগুয়েজ বা মেশিন ভাষা বলা হয়। 0 বলতে বুঝায় ০–২ ভোল্ট বিদ্যুৎ। 1 মানে হলো ৩–৫ ভোল্ট বিদ্যুৎ।

এই ভাষা (মেশিন ল্যাংগুয়েজ) বুঝতে আমাদের দম বের হয়ে যাবে – এটাই স্বাভাবিক। তাই কিছু কোডিং ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করা হয় যা কম্পাইলিং এর কাজ করে। অর্থাৎ, আমাদের ভাষায় দেওয়া ইন্সট্রাকশনকে কম্পিউটারের বোধগম্য করে। যেমন: পাইথন, সি, জাভা, জাভাস্ক্রিপ্ট, সি প্লাস প্লাস, রুবি, সুইফট, উবুন্টু, কোটলিন ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি! ৭০০টি প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ এর নাম লেখা সম্ভব হচ্ছে না। হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত প্রায় ৭০০টির মতো প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ আছে (গুগল ডিজিটাল গ্যারেজ এর মতে। সব মিলিয়ে সঠিক সংখ্যা হাজারের ওপরে!)।

প্রোগ্রাম মানে হলো কম্পিউটারকে ইন্সট্রাকশন দেওয়া। কিন্তু কম্পিউটার কি আর আমাদের ভাষা বুঝে? তার মাতৃভাষা হলো 'মেশিন ল্যাংগুয়েজ'। তাহলে আমরা কীভাবে কম্পিউটারকে ইন্সট্রাকশন দেবো? মেশিন ল্যাংগুয়েজেই দিতে হবে। কিন্তু মেশিন ল্যাংগুয়েজ আমরা বুঝতে পারি না। তাই আমরা কিছু প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করি। যেই ল্যাংগুয়েজ প্রোগ্রামকে কম্পিউটারের বোধগম্য করে। অর্থাৎ, ইন্সট্রাকশনগুলো কম্পিউটারকে বুঝিয়ে দেয়।

প্রশ্ন জাগতে পারে, যেহেতু সব ল্যাংগুয়েজ এর কাজ একই, কম্পাইলিং করা তাহলে যে-কোনো একটি ল্যাংগুয়েজ দিয়েই তো কাজ চালানো যেত। হ্যাঁ, তা চালানো যেত। তবে এটা করা থেকে সরাসরি কম্পিউটারের ভাষা দিয়ে কাজ করা সহজ হতো। একজন ডাক্তার যখন কথা বলবে তখন কথায় সে নির্দিষ্ট কিছু টার্ম ব্যবহার করে। একজন ইঞ্জিনিয়ার যখন কথা বলবে তখন সেও কিছু নির্দিষ্ট টার্ম ব্যবহার করবে। কিন্তু দুজনেরই কথা বলার ভাষা সেইম! ঠিক এভাবেই একটা প্রোগ্রামে হাজারটা ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করলেও কম্পিউটার সেটাকে অনুবাদ করে বাইনারিতে নেয় ও বুঝে ফেলে।

কম্পিউটারকে আমি নির্দেশ দিতে পারি ১ – ১০ পর্যন্ত সংখ্যার যোগফল বের করতে এবং সেই নির্দেশ আমি ৭০০টি প্রোগ্রামিং ভাষায় দিতে পারি।

সেই ৭০০টি নির্দেশ আলাদা ল্যাংগুয়েজে লেখা হলেও প্রতিটি প্রোগ্রাম কোডটিকে কম্পিউটারের বোধগম্য কোডে রূপান্তর করবে।

৭০০টি ভাষাকে প্রোগ্রাম রচনা করার ভিত্তিতে যদি বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করি, তাহলে ৪টি স্তর পাব। লো লেভেল ল্যাংগুয়েজ, মিড লেভেল ল্যাংগুয়েজ, হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজ, ভেরি হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজ। এখন এই চারটি স্তরকে 'কম্পিউটার কীভাবে বুঝে' তার ওপর ভিত্তি করে দুইটা ক্যাটাগরিতে ফেলতে পারি।
১. লো লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশন,
২. হাই লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশন।
অ্যাবস্ট্রাকশন যত লো হবে, সেই ল্যাংগুয়েজ ততই মেশিন ল্যাংগুয়েজের কাছাকাছি থাকবে।

লো লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশন, যেমন: সি, অ্যাসেম্বলি ল্যাংগুয়েজ – এগুলো বাইনারির অনেক কাছাকাছি। অর্থাৎ, কম্পিউটার সহজে বুঝতে পারে। যার ফলে কম্পাইল করার সময় কম্পিউটারের ওপর কম ধকল যায়। কম সময়ে, কম শক্তি খরচ করে কম্পিউটার বা মেশিন প্রোগ্রাম পড়তে পারে বা বুঝতে পারে। এর জন্য ছোটোখাটো মাইক্রোপ্রসেসর বা কম্পিউটারে লো লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশন ব্যবহার করা হয়। যেমন: ঘড়ি, ফ্রিজ, গাড়ির ট্রাফিক লাইট ইত্যাদির কিছু প্রোগ্রাম। সি অথবা অ্যাসেম্বলি বা এরকম লো লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশন ব্যবহার করে এগুলো প্রোগ্রাম করা হয়।

হাই লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশন, যেমন: পাইথন, সি প্লাস প্লাস, বাইনারি থেকে অনেক দূরে। কম্পিউটারের বুঝতে বা কম্পাইল করতে একটু অসুবিধা হয়, কিন্তু মানুষের বুঝতে তেমন একটা অসুবিধা হয় না। হাই লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশন এর ভাষা কম্পাইল করতে কম্পিউটারের ওপর অনেক ধকল যায়, রান করার সময় র‍্যাম, প্রসেসর এসবের ওপর দিয়ে অনেক প্যারা যায়। সময় লো লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশন এর তুলনায় বেশি লাগে, স্পেস ও শক্তি খরচ হয়।

পাইথন হাই লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশন ল্যাংগুয়েজ।

মোবাইল, ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন, অপারেটিং সিস্টেম ইত্যাদি তৈরিতে হাই লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশন ব্যবহার করা হয়।

ডেটা স্টোর অ্যাক্সেস করতে হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজ, যেমন: এসকিউএল ব্যবহার করা হয়। ডেটা অ্যানালাইসিস করতে পাইথন ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেকটি ভাষার কাজ একই হলেও এগুলোর নিজস্ব একটি ইউনিক কোয়ালিটি আছে। একেকটা একেক বিষয়ে এক্সপার্ট। কিন্তু সব কাজই করতে পারে।

বুঝতেই পারছেন কেন এত এত প্রোগ্রামিং আছে, আর প্রতিনিয়তই কোনো না কোনো ল্যাংগুয়েজ তৈরি করা হচ্ছে। প্রতিটি ল্যাংগুয়েজই বিভিন্ন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেকটি ল্যাংগুয়েজের কোনো না কোনো সুবিধা আছে।

সি, অ্যাসেম্বলি ছোটোখাটো প্রোগ্রামে ব্যবহৃত হয়, ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট ও ওয়েবসাইটের ইন্টার অ্যাকটিভিটি বাড়াতে জাভাস্ক্রিপ্ট ব্যবহৃত হয়, মেশিন লার্নিং ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্সিতে পাইথন ব্যবহার করা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করা হয়।

শুধু দেখতে হবে কোন কাজে কোন ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করা সুবিধাজনক, কোন ক্ষেত্রে কোন ল্যাংগুয়েজ পারফেক্ট ইত্যাদি।

এটাই হচ্ছে মূলত ফান্ডামেন্টাল অফ কোডিং অ্যান্ড প্রোগ্রামিং।

ইন্টারনেটের বেশিরভাগ তথ্য প্রচলিত সার্চ ইঞ্জিনে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সার্ফেস ওয়েবে আমরা যা দেখি তা মূল ওয়েবের ১০% মাত্র। বাকিটা ডিপ ওয়েব এবং কিছুটা ডার্ক ওয়েবে রয়েছে।
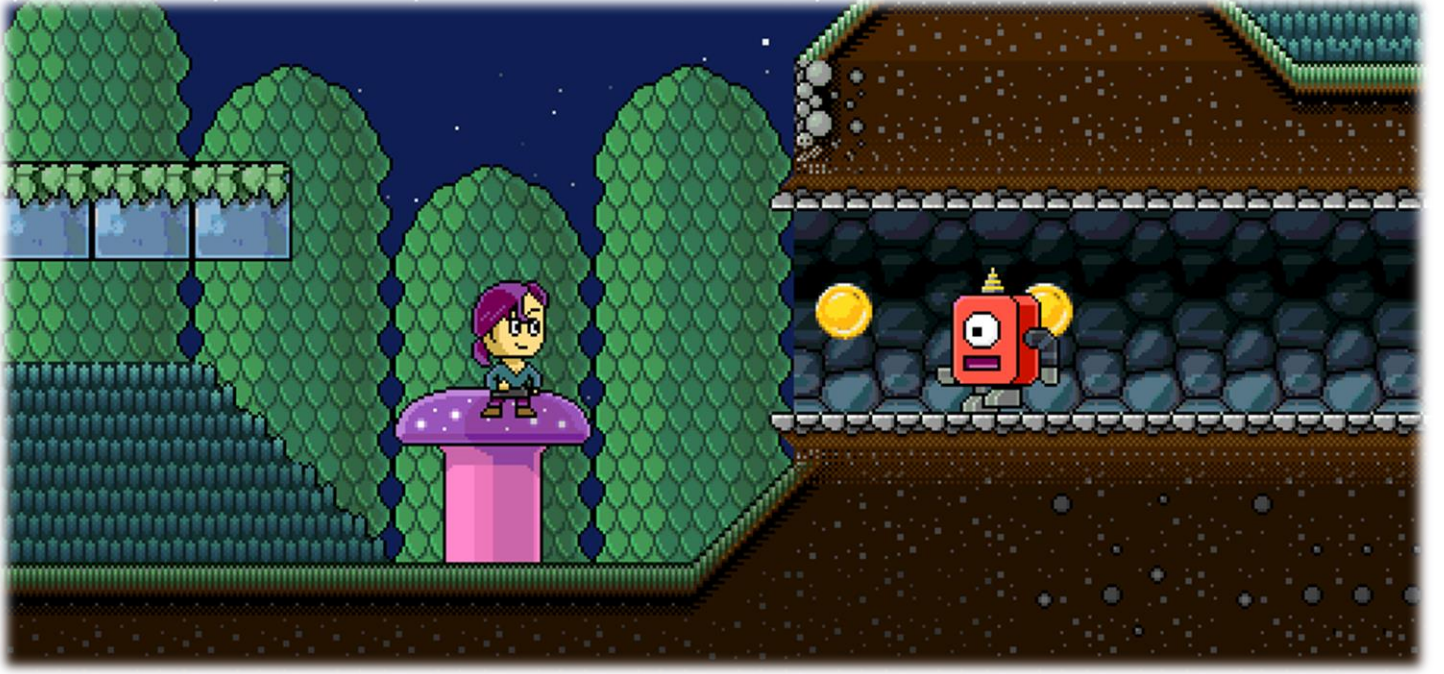
গেম তৈরির যন্ত্র

শাফি আল মাহাদি

'গেমিং' টার্মটার সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত। ব্যক্তিগত জীবনে আমরা বিনোদনের জন্য অনেকেই অনেকরকম গেম খেলে থাকি।
তো, এই প্রশ্নগুলো মাথায় আসা স্বাভাবিক যে গেম কীভাবে তৈরি হয়, কিসের ওপর ভিত্তি করে গেমটি রান করছে বা গেমের এই অংশটুকু এরকম হলো কেন, কেন ওরকম হলো না অথবা আমি হলে গেমটিকে আরও সুন্দর করতে পারতাম, আমি যদি নিজে একা একটি গেম বানাই তাহলে কীরকম, কী বিষয়ের সম্মুখীন হতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তো, এগুলো নিয়েই গেম ডেভেলপমেন্টের ওপর এই লেখাটা।

গেম ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রথম যে জিনিসটা সবচেয়ে প্রয়োজন তা হলো একটা গেম ডেভেলপমেন্ট টিম গঠন করা, যেখানে ডিজাইনার এবং প্রোগ্রামার অবশ্যই থাকবে; তাছাড়া সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার, আর্টিস্ট এবং সর্বশেষে গেম টেস্টার অর্থাৎ.যারা গেমটি খেলে দেখবে। এরা মূলত আংশিকভাবে গেমিং ডেভেলপমেন্টে ভূমিকা রাখে। উন্নত বড়ো বড়ো গেমিং ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে একটা নির্দিষ্ট গেমের জন্য এই টিমের সদস্য ৬০০ থেকে ২,০০০ পর্যন্ত হতে পারে।

তো, এই টিমের সদস্যরা আসলে কী নিয়ে ডিল করে তা একটু বিস্তারিত বলা যাক।

ডিজাইনার:
ডিজাইনাররা মূলত কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, একটা গেম কীরকম হবে এটা মূলত একজন ডিজাইনার ঠিক করে থাকে। গেমের কমব্যাট স্টাইল, ফিজিক্স, গেম প্লে, অ্যানিমি মুভমেন্ট, গেম স্টোরি — এসবের স্ক্রিপ্ট তৈরি করা একজন গেম ডিজাইনারের দায়িত্ব।

প্রোগ্রামার:
এদের কাজ হবে এমন একটা সফটওয়্যার (গেম ইঞ্জিন) বানানো যা ডিজাইনারের স্ক্রিপ্টগুলোকে ভিজুয়ালি রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে। এই গেম ইঞ্জিনকে গেমের ভিত্তি/মূল অবকাঠামো বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ, এর ওপর বেস করেই একটা গেম রান করবে। একটা পরিপূর্ণ গেম ইঞ্জিন বানাতে হলে বিভিন্ন রকম প্রোগ্রামিং করতে হয়। সাধারণত প্রোগ্রামাররা এক একটা সেকশনে ভাগ হয়ে কাজগুলো সম্পন্ন করে, এগুলো হলো:

ফিজিক্স অ্যান্ড গ্রাফিক্স: যদিও এই দুটো আলাদা জিনিস, কিন্তু একটা আরেকটার সাথে সম্পর্কিত। প্রোগ্রামারদের এক ভাগ কাজ করবে গ্রাফিক্স রিলেটেড বিভিন্ন 3D বা 2D মডেল নিয়ে এবং এদের স্ট্রাকচার কেমন হবে এসব সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে, আর আরেকভাগ কাজ করবে এসব 3D মডেল ফিজিক্যালি কীরকম আচরণ করবে তা নিয়ে।

সাউন্ড: এদের কাজ হবে গেম ইঞ্জিনে কোনো এক্সটারনাল সোর্স থেকে প্রাপ্ত মিউজিক গেমের নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে রান করার সিস্টেম তৈরি করা।

গেম প্লে: এরা গেম ইঞ্জিনের এমন একটি সিস্টেম তৈরি করবে যা দ্বারা গেমের রুল, স্টোরি, গেম প্লে, ফিচার এসব মেইন্টেইন করা যায়।

UI and HUDs: গেম অন করলে আমরা অনেক অপশন দেখতে পাই, যেমন –
নিউ গেম, লোড গেম, কন্টিনিউ বা এমন কিছু দিকনির্দেশনা যা দ্বারা আমরা গেমকে নির্দিষ্ট রুলের আন্ডারে কন্ট্রোল করে থাকি। এই সেকশনের প্রোগ্রামাররা সাধারণত এসব জিনিস নিয়ে ডিল করে।

ইনপুট প্রসেসিং: কোন কী-ওয়ার্ড ইউজ করলে কোন অবজেক্ট কীভাবে প্রতিক্রিয়া করবে তা সাধারণত এ অংশের প্রোগ্রামাররা প্রোগ্রামিং করে ঠিক করে থাকে।

নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশন: উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে জনপ্রিয় গেম Fortnite । এখানে আপনি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীর ডেটা কীভাবে গ্রহণ করছেন বা সে আপনার ডেটা কীভাবে গ্রহণ করছে এবং আল্টিমেটলি ফলাফল কী হচ্ছে এসবের কাজ এই সেকশনের প্রোগ্রামাররা করবে।

গেম টুলস:
এখানে ওপরের সবগুলো প্রোগ্রামকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এমন একটি সিস্টেম তৈরি করা যার সাহায্যে কোনো কোডিং করা ছাড়াই সেগুলোকে পুনরায় ইউজ করা যায় সেটা নিয়ে কাজ হয়ে থাকে।

আর্টিস্ট:
গেমের গ্রাফিক্স, ভূখণ্ড বা কোন অবজেক্ট কেমন হবে তা প্রোগ্রামারদের ভিজুয়ালাইজ করানোর জন্য সাধারণত বড়ো বড়ো গেমিং ইন্ডাস্ট্রি আর্টিস্ট রেখে থাকে।

গেমিং সাউন্ড প্রফেশনালিস্ট:
এরা সাধারণত গেমের জন্য সাউন্ড তৈরি করে। তবে এরা গেমিং ইন্ডাস্ট্রির স্থায়ী ইমপ্লয়ি না।

গেম টেস্টার:
একটা গেম পরিপূর্ণভাবে তৈরি হয়ে গেলে এদের কাজ হবে গেম এর খুঁত ধরা। বাগ ফিক্সিং ও গেম প্লে ইম্প্রুভমেন্ট এই ধাপে সম্পন্ন হয়।

তো, এত কিছু বলার পর একটা কথা থেকে যায়, আমি কি গেম বানাতে পারব? প্রথমত, আপনাকে অবশ্যই একজন ভালো ও দক্ষ প্রোগ্রামার হতে হবে, এর বিকল্প নেই। তারপর হলো ডিজাইনিং। আপনার গেম কতটুকু মানসম্মত হবে এটা নির্ভর করবে আপনার ডিজাইনিং দক্ষতার ওপর। আপনার কনটেন্ট যদি ইউনিক আর মজার হয়ে থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই সাফল্য পাবেন। এই ব্যাপারে যদি উদাহরণ দিই তাহলে প্রথমেই চলে আসবে 'মাইনক্রাফট', 'ইনসাইড (২০১৬)', 'Ori and the Blind Forest (২০১৫)' ।

তবে বর্তমানে আপনি কোডিং এ পরদর্শী না হলেও 3D থেকে 2D গেম তৈরি করতে পারবেন। এক্ষেত্রে, আপনি চাইলে Unity (game engine) ব্যবহার করতে পারেন কম ঝামেলা করে। Unity বেশ পাওয়ারফুল গেম ইঞ্জিন। তাছাড়া আরো গেম ইঞ্জিন আছে।
যা-হোক, অন্য কোনো গেম ইঞ্জিন ইউজ করলে সীমাবদ্ধই থেকে যাবেন, অনেকটা পাখি হয়ে খাঁচায় ওড়ার মতো। তবুও এখন Unity, Unreal Engine এর মতো গেম ইঞ্জিন ব্যবহার করে অনেক সফল গেম তৈরি হচ্ছে।

ডিলিট হওয়া ডেটা কোথায় যায়?

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল মামুন

অনেকেই হয়তো জানেন না 'ডেটা' কী জিনিস। ডেটা (data) বা উপাত্ত হচ্ছে ক্ষুদ্র পরিমাণগত তথ্যাংশের সমাহার। এসব ডেটা একসাথে হয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদান করে। অডিয়ো, ভিডিয়ো, ডক্যুমেন্ট ইত্যাদি। এসব অডিয়ো ভিডিয়ো আবার ০ এবং ১ দুটি বিটের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। তো, আমরা যখন আমাদের মোবাইল বা কম্পিউটার থেকে এসব ডেটা ডিলিট করি, তখন কিন্তু সত্যিই মোবাইল বা কম্পিউটার থেকে সেগুলো চিরতরে চলে যায় না; বরং, মেমোরি কার্ড অথবা হার্ড ডিস্কে সেই ডেটা থেকেই যায়।

কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাক। কম্পিউটারের কাছে অডিয়ো, ভিডিয়ো সবই বাইনারি সংখ্যা 1 এবং 0 দিয়ে গঠিত একটি ডেটা। তাই আপনার কম্পিউটারকে এটা জানাতে হবে যে কোনটি ছবি, কোনটি অডিয়ো, কোনটি ভিডিয়ো। এই জন্য প্রত্যেকটি ডেটারই একটি ফরম্যাট থাকে। ফরম্যাটের মাধ্যমেই কম্পিউটার বুঝতে পারে কোনটি অডিয়ো আর কোনটি ভিডিয়ো। এই অডিয়ো, ভিডিয়ো ইত্যাদি file-এর নামের শেষে extension ব্যবহার করা হয়, যেমন: ছবির নামের পরে .jpg, .jpeg, .png, .bmp; আবার ভিডিয়োর নামের পরে .mp4, .3gp, .webm ইত্যাদি লেখা হয়। এগুলোকে এক্সটেনশন বা ডেটা কন্টেইনার বলা হয়। এই extension-এর মাধ্যমে আপনার কম্পিউটার বুঝতে পারে আপনি যেই file-এ ক্লিক করছেন, সেটিকে কোন software দিয়ে open করতে হবে। এই extension থাকার কারণেই আপনি যদি কোনো PDF বই open করেন তখন সেটা কোনো অডিয়ো প্লেয়ার দিয়ে open হওয়ার মতো গন্ডগোল করে না।

যা-হোক, আপনি যখন কোনো অডিয়ো বা ভিডিয়ো download করেন তখন আপনার উইন্ডোজ কম্পিউটারে NTFS নামক ফাইল সিস্টেমের মাধ্যমে কম্পিউটারের HDD হার্ড ডিস্কে চুম্বক পদ্ধতিতে সেই অডিয়ো, ভিডিয়ো ডেটাগুলো সংরক্ষিত হয়। আর কম্পিউটারের রেজিস্ট্রি (registry) নামের একটি ডেটাবেজ আছে যেখানে আপনার কম্পিউটারে কী কী আছে তার তালিকা রেজিস্টার করা থাকে।

আপনি যখন কোনো ডেটা delete করে দেন তখন কিন্তু সেই ডেটা কম্পিউটার হার্ড ডিস্কেই থেকে যায়। কেবল সেই delete করা ডেটার নাম এই রেজিস্ট্রি ডেটাবেজ থেকে মুছে দেওয়া হয়। সেই সাথে আপনার কম্পিউটারে delete করা file-টি

কম্পিউটারে যে নামে save করা ছিল তার নামের প্রথম অক্ষরটি মুছে ফেলা হয়। ফলে দুইটি বিষয় ঘটে:

১। Delete করার পর সেই delete করা file-এর নামের প্রথম অক্ষর মুছে যাওয়ায় কম্পিউটারের কাছে সেই ফাইল-টি unknown হয়ে যায়। এর মাধ্যমে কম্পিউটারকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে unknown ডেটাটি মেমোরির যেখানে থাকবে সেখানে নতুন download করা ডেটা store করে delete করা ডেটাটি চিরতরে মুছে দেওয়ার অনুমতি আছে।

২। Delete করার পর delete করা file-টি রেজিস্ট্রি থেকে মুছে যায়। ফলে, file-টি কম্পিউটারে থাকলেও আপনার কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম থেকে গায়েব হয়ে যায়।

এই কারণে delete করার পরে সেই delete করা file কম্পিউটারে থেকে গেলেও সেগুলো দেখা যায় না। আর যেহেতু কম্পিউটারে থেকেই যায় তাই, সেই delete করা ডেটা মেমোরির যেখানে ছিল সেখানে নতুন কোনো ডেটা download করে ওভাররাইট করার আগে পর্যন্ত পুনরায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

এখন অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, "আমরা যখন ডেটা delete করি তখনই যদি কম্পিউটার সেই ডেটার জায়গায় অন্য কোনো ডেটা ওভাররাইট করে দিত, তাহলেই তো সেই ডেটা চিরতরে মুছে যেত। ফলে, আমাদের delete করা ডেটা অন্য কেউ দেখে ফেলার সম্ভাবনা থাকত না!"

জি, ঠিক ভেবেছেন। কিন্তু তখন একটি ডেটা delete করতে অনেক সময় লাগত। তাই এমন করা হয় না।

এছাড়া '0 filling' নামের আরেকটি পদ্ধতি আছে। সেটা নিয়েই এখন আলোচনা করব। লেখার শুরুতেই বলেছিলাম যে কম্পিউটারের কাছে অডিয়ো, ভিডিয়ো সবই বাইনারি 0 এবং 1 সংখ্যা। ধরুন এই সংখ্যাগুলো চুম্বকীয় হার্ড ডিস্কে নিচের মতো থাকে –

1 থাকে এভাবে: ।

0 থাকে এভাবে: _

তো, delete করা ডেটা চিরতরে মুছে দেওয়ার জন্য একটি কাজ করা যায়। আর তা হলো বাইনারি সকল 1 সংখ্যাকে 0 দিয়ে পরিবর্তন করা। মনে করুন, একটি অডিয়োর গঠন নিচের মতো –

_ _ | _ | | _ _ _ _ _ | _ _ | _ _ _ _

এখানে,

1= |

0= _

তো, যখন আপনি এই অডিয়ো delete করবেন তখন সব 1 সংখ্যাকে 0 দিয়ে পরিবর্তন করা হলে সেই অনুযায়ী –

আগে ছিল:

_ _ | _ | | _ _ _ _ _ | _ _ | _ _ _ _

Delete করার পর হবে:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে যদিও আপনার delete করা ডেটা কম্পিউটারে থেকেই যাবে কিন্তু তার রূপ সম্পূর্ণ বদলে যাবে। তবে এই পদ্ধতি নিয়েও কিছু কথা আছে। আর তা হলো যখন 1 সংখ্যাটি | থেকে _ তে রূপান্তরিত হয় তখন পুরোপুরি _এর মতো সমতল না হয়ে কিছুটা বাঁকা হয়ে থাকে। ফলে এভাবে delete করা ডেটা পুনরায় ফিরিয়ে এনে অন্যের তথ্য জেনে নেওয়া সম্ভব। কারণ আপনি সহজেই বাঁকা চিহ্নগুলো দেখে বুঝতে পারবেন সেগুলো আসলে 1 ছিল। কিন্তু এসব করতে অনেক টাকা খরচ হয়। তাই খুব বেশি প্রয়োজন না হলে রিকভার করা হয় না।

ডিলিটিং কীভাবে কাজ করে?

সোহান

আমাদের দৈনন্দিন ভার্চুয়াল জীবনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা টুলগুলোর একটা হচ্ছে ডিলিট অপশন। তার সাথেই আসে ডিলিট করার সাথে জড়িত বিভিন্ন সফটওয়্যার আর প্রফেশনাল অনেক সার্ভিস। এটি সরাসরি যন্ত্রাংশ না হলেও যন্ত্রাংশ অপারেটিং-এর একটি মেজর মেকানিজম। আমরা ইন্টারনেটে ব্রাউজিং হিস্টোরি থেকে শুরু করে ক্রাশের ছবি, অনেক আগে ফেইসবুকে আপলোড দেওয়া নিব্বামার্কা কোনো পিকচার কিংবা NSFW (Not Safe For Work বা অশ্লীল) কন্টেন্ট মনে পড়লেই ডিলিট দিয়েই সেইফ পজিশনে আছি ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছি এই ডিলিট হয়ে যাওয়া তথ্যগুলো আসলে কী হচ্ছে বা কীভাবে এই তথ্যগুলো ডিলিট হচ্ছে? এগুলো কি আসলেই হারিয়ে যাচ্ছে, যেমনটা হারিয়ে গেছে সপ্তাশ্চার্যের ছয়টি প্রাচীন আশ্চর্য?

পুরোপুরি ডিলিট বাদ দিলাম এখন ভার্চুয়াল স্মৃতির পাতা (মেমোরি) মানুষের এতটাই নিয়ন্ত্রণে যে চাইলেই কোনো ফটো বা ভিডিয়ো জাতীয় কন্টেন্ট থেকে কোনো ইন্ডিভিজ্যুয়াল ব্যক্তি কিংবা স্থানকে এমনভাবে মুছে দেওয়া যায় যে মনে হবে ওই ব্যক্তি-স্থানের আসলে অস্তিত্বই ছিল না (ইমেইজ ম্যানিপুলেশন)। সোভিয়েত শাসক স্ট্যালিন যেমনটা করেছিলেন লেনিনের সাথে তোলা সব ছবি থেকে ট্রটস্কিকে সরিয়ে দিয়ে।

ডিলিট শব্দটার গোড়াপত্তন নিয়ে কিছুটা প্যাঁচাল পারব। GOOGLE NGRAM ভিউয়ার-এর মতো ডিলিট শব্দটি ১৯৭৯ সালের সময় জনসাধারণের মুখে মুখে চলে আসে। সেবছরই মানুষ 'ডিলিট' শব্দটি 'ইরেজ' শব্দের চেয়ে অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা শুরু করে। তবে আমাদের মাঝে ডিলিটের ইকুইভ্যালেন্ট আরেকটা বহুল প্রচলিত শব্দ আছে 'ভুলে যাওয়া'। আমরা পশু-প্রাণীরা না-হয় ভুলে যাই কিন্তু একটা ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র কীভাবে ভুলতে পারে? কিংবা আদৌ ভুলে কি?

শুরু থেকে শুরু করা যাক। একটা ফাইল ডিলিট দেওয়া হয়, তাতে ফাইলটা সাধারণত রিসাইকেল বিন বা তার ইকুইভ্যালেন্ট কোনো ডিরেক্টরিতে মুভ হয় কিন্তু তখনও সেই ফাইলটির দখল করা ডেটা সিস্টেমে থেকে যায় এবং জায়গা দখল করে থাকে। এবার আসা যাক কঠিন একটা পর্যায়ে। ধরে নেওয়া যাক ফাইলটা রিসাইকেল বিন থেকেও মুছে দেওয়া হলো, তখন ওই ফাইলটার দখল করা জায়গাটি খালি হয়ে যাবে এবং ফাইল ফেরত আনা যাবে না এরকম ওয়ার্নিং-ও দেয়। কিন্তু আসলে কি জায়গাটি খালি হয়েছে? না, খালি হয়নি; জায়গাটি খালি হিসেবে (মার্ক করা)

দেখানো হচ্ছে যা উপলব্ধ হবে পরবর্তীতে যদি কখনো নতুন তথ্য রাখতে জায়গার প্রয়োজন হয়।

ফাইলটির ডিরেক্টরি খালি দেখালেও ফাইলটি কিন্তু সরে যায়নি, কেবল ফাইলটির দিকে তাক করা পয়েন্টারগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। পয়েন্টারগুলো একটি বিশেষ ধরনের ডেটা, এদের কাজ আসলে মেমোরিতে একটি নির্দিষ্ট স্থানের প্রতি দিক নির্দেশনা দেওয়া যেখানে সেই ফাইলটি আসলে পাওয়া যাবে, যার দিকে এরা নির্দেশ করছিল। অনেকটা বইপত্রের সূচিপত্রের মতো। এখানে রিসাইকেল বিন থেকে মুছে ফেলা অনেকটা বইয়ের সূচিপত্র থেকে কোনো টপিক পেন্সিল দিয়ে কালো করে ঢেকে গোপন করার মতো। একটা কম্পিউটারের কাছে সেই সূচিপত্র ফলো করলে সেই টপিকের দখল করা জায়গাটি খালি দেখাবে। পরবর্তীতে সূচিপত্র ঘেঁটে সেই টপিকটি পাওয়া না গেলেও টপিকটি কিন্তু বই থেকে হারিয়ে যায়নি, এখনো বইয়েই আছে। কেবল সূচিপত্র ঘেঁটে সেটা খুঁজে বের করতে একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি বিশেষ কৌতূহলী হয়, তাহলে সে ইচ্ছা করলে রাবার দিয়ে মুছে সেই সূচিপত্রতে টপিকটি খুঁজে বের করতে পারবেন। ঠিক এমনটাই হয় ডেটা রিকভারি সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করার ক্ষেত্রে। এগুলো মেমোরির সেই স্থানগুলো অ্যানালাইজ করে যেগুলো খালি হিসেবে মার্ক করা এবং পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য উপলব্ধ দেখানো। অ্যানালাইজ করার সময় এরা খুঁজে দেখে সেই জায়গাগুলোতে আসলে কী আছে এবং কিছু থেকে থাকলে সেগুলোকে আনমার্ক করে তথ্য আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনতে পারে।

সাধারণত প্রফেশনালভাবে চেষ্টা না করলে অনেক সময়ই করাপ্টেড ডেটা রিকভার হয় যদি সেই ফাইলটির জন্য নির্ধারিত জায়গা অন্য কোনো তথ্য দখল করে নেয়, যেন ডিজিটাল স্কন্ধকাটা ভূত। এখান থেকেও ফাইল রিকভার করা কষ্টসাধ্য হলেও অসম্ভব নয়। কেউ যদি এতটাই ডেসপারেট হয় কোনো ফাইল মুছে দিতে তবে সেই ডিলিট করা ফাইলের ডিরেক্টরিতেই নতুন ফাইল এনে পুরোনোটিকে ওভাররাইট করতে পারে। কিন্তু ওভাররাইট করলেই কি আপনি সেইফ? যতই ওভাররাইট করুন ফাইলটি আসলে সে জায়গাতেই থেকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, প্রতিবার ওভাররাইট করলেই ফাইলটা রিকভার করা কঠিনতর হয়ে পড়ছে, কিন্তু অসম্ভবের পর্যায়ে যাচ্ছে না। পরিমিত সময় আর যথেষ্ট চেষ্টা থাকলে সেখান থেকেও তথ্য রিকভার করা সম্ভব।

> যারা সন্দেহে আছেন সিআইএ বা অন্য কোনো সিক্রেট সার্ভিস আপনার পেছনে, তারা সাবধান। ডিজিটালি তথ্য সংরক্ষণ বা আদান-প্রদান মোটেও নিরাপদ নয়। সেটা আপনার কাছে ট্রেস করা যাবে। আপনার ট্রেইল সম্পূর্ণভাবে লুকানো অসম্ভবের মতো। তাই অফিসের কম্পিউটারে কোনো কিছু খোঁজার আগে বা বাসার পিসি দিয়ে কিছু দেখে ডিলিট করে দেওয়ার চিন্তা করার আগেও দু-বার ভেবে নেবেন।

ভাবছেন অতিরঞ্জন করছি? অতিরঞ্জন না, সত্যি-ই বলছি, সাধারণত বিভিন্ন দেশের সরকারি দপ্তরগুলো তাদের অপ্রয়োজনীয় কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে এমন ড্রাইভগুলো টুকরো টুকরো করে ওয়েস্টে রূপান্তর করে ডোনেশনের নামে ঘানায় পাঠিয়ে দেয়। এই ফিজিক্যালি ড্যামেজ করার পরও আপনার তথ্য অতি উৎসুক চোখের কাছে নিরাপদ নয়। ঘানার এরকম আনরেগুলেইটেড ওয়েস্ট ডাম্প থেকে স্যালভেজ কতা ওয়েস্ট থেকেও সংঘবদ্ধ অপরাধীরা তথ্য পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল, যা তাদেরকে অনেক গোপনীয় তথ্যের অ্যাক্সেস দেয়। সেগুলোর মাঝে মার্কিন ডিফেন্স ইন্টিলিজেন্স অ্যাজেন্সি, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি, TSA-এর কনফিডেনশিয়াল তথ্যও ছিল।

২০১০ এর আগে পর্যন্ত প্রান্তিক অঞ্চলে পায়রা বা কবুতরের গড় গতি ইন্টারনেটের গতি থেকে বেশি ছিল।

কারদাশেভ স্কেল এবং আমাদের ভবিষ্যৎ

জয় শর্মা

যদিও আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রায় ছয় মিলিয়ন বছর ধরে রয়েছেন, মানুষের আধুনিক রূপটি প্রায় ২,০০,০০০ বছর আগে বিকশিত হয়েছিল। সভ্যতার হিসাবে আমরা প্রায় ৬,০০০ বছর পুরানো এবং শিল্পায়ন কেবল ১৮০০ এর দশকে শুরু হয়েছিল। আমাদের আরও অনেকদূর পাড়ি দিতে হবে।

সোভিয়েত জ্যোতির্বিদ নিকোলাই কারদাশেভ ১৯৬৪ সালে একটি পদ্ধতি বলেছিলেন, যেখানে বুদ্ধিমান সভ্যতা যে পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করতে সক্ষম, তার ওপর ভিত্তি করে একটি পরিমাপের পদ্ধতি দিয়েছিলেন। স্কেলটিতে তিন ধরনের সভ্যতার কথা বলা হয়েছে–

১. টাইপ-I সভ্যতা

২. টাইপ-II সভ্যতা

৩. টাইপ-III সভ্যতা

যদিও বিজ্ঞানীরা নতুন আরও কয়েকটি টাইপ যোগ করেছেন। জেনে নিই কী কী আছে এতে–

টাইপ-I সভ্যতা

টাইপ-I সভ্যতা হলো যারা তাদের নিকটস্থ নক্ষত্র থেকে আসা সব শক্তি এবং নিজ গ্রহের প্রতিটি শক্তির উৎস নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহার করে ।(Energy consumption by Type I civilization is 10^{16} or 10 quadrillion W) এই পর্যায়ে পৌঁছাতে আমাদের বর্তমান শক্তি উৎপাদন ১০০,০০০ গুণ বাড়াতে হবে। বর্তমান সময়ে, আমরা এখনো টাইপ-I সভ্যতার ধারে-কাছেও নেই। পদার্থবিজ্ঞানী

মিচিও কাকু পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, মানুষ যদি প্রতি বছর গড়ে ৩ শতাংশ হারে তাদের শক্তি ব্যবহার বাড়ায় তবে তারা ১০০–২০০ বছরে টাইপ-I সভ্যতার মর্যাদা অর্জন করতে পারে, কয়েক হাজার বছরে টাইপ-II স্ট্যাটাস এবং টাইপ-III'র স্ট্যাটাস পেতে পারে এক লক্ষ থেকে এক মিলিয়ন বছরে। টাইপ-I সভ্যতা ভূমিকম্প, সুনামি, ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে। তাদের গ্রহের আবহাওয়ার নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতের মুঠোয়।

টাইপ-II সভ্যতা

টাইপ-II সভ্যতা হলো যারা তাদের নিকটস্থ নক্ষত্রের সকল শক্তি নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহার করতে সক্ষম। কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব? এর জন্য বেশ কয়েকটি পদ্ধতি প্রস্তাব করা হয়েছে। যার মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় পদ্ধতি হলো নিকটস্থ নক্ষত্রের চারপাশে 'ডায়সন স্ফিয়ার' তৈরি করে সকল শক্তি নিয়ন্ত্রণ এবং সংরক্ষণ করা। টাইপ-II সভ্যতা তাদের সৌরজগতের সব নক্ষত্র, গ্রহ নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে সক্ষম। তারা হয়তো ম্যাট্রোশকা ব্রেইন তৈরিতে সক্ষম। মানুষ যদি টাইপ-II সভ্যতা হতো, তাহলে পৃথিবীর দিকে চাঁদের আকারের কোনো ধেয়ে আসা বস্তুকে নিমিষেই বাষ্প করার সামর্থ্য রাখত (স্টারওয়ার্স মুভির ডেথ স্টারের মতো কিছু) অথবা যদি আমাদের কাছে সময় থাকে তবে আমরা আমাদের গ্রহটিকে পুরোপুরি সরিয়ে নিয়ে যেতে পারি।
(Energy consumption by Type II civilization is 10^{26} or 100 SeptillionW).

টাইপ-III সভ্যতা

টাইপ-III সভ্যতা, যাদের গ্যালাক্টিক সভ্যতাও বলা হয়, যারা তাদের নিজ গ্যালাক্সির সমস্ত শক্তি ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। আমি বলছি এক অকল্পনীয় বুদ্ধিমান এবং বিশাল ক্ষমতার অধিকারী সভ্যতার কথা, যারা পুরো গ্যালাক্সি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম, যারা টাইপ-II সভ্যতা থেকেও অনেক অনেক শক্তিশালী। (Energy consumption by Type III civilization is 10^{36} or one undecillion W)

কারদাশেভ স্কেলটি অনেক পুরাতন। তাই বিজ্ঞানীরা এর সাথে আরও কয়েকটি টাইপ যোগ করেছেন– টাইপ-IV সভ্যতা, টাইপ-V সভ্যতা।

টাইপ-IV সভ্যতা হলো ইউনিভার্সাল সভ্যতা, যারা পুরো মহাবিশ্ব থেকে শক্তি ব্যবহার করতে সক্ষম। তারা সম্পূর্ণ মহাবিশ্বে ট্র্যাভেল করতে পারবে। তারা হয়তো স্পেইস-টাইম নিয়ন্ত্রণ এবং অমরত্ব অর্জন করতে সক্ষম (Energy consumption by Type IV civilization is 10^{45} or 10 Quattuordecillion W)

টাইপ-V সভ্যতা হলো মাল্টিভার্স সভ্যতা, যারা মাল্টিপল ইউনিভার্স থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে পারে। এক কথায় গড সমতুল্য শক্তি। তারা বর্তমান-ভবিষ্যৎ যে-কোনো টাইমলাইন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ইনফিনিট ক্ষমতার অধিকারী এই সভ্যতা। যে-কোনো টাইমলাইনে তারা যেতে পারবে। তার মানে তারা numbers of universe *10^{45}W শক্তি উৎপাদনে সক্ষম। টাইপ-V সভ্যতা সম্পর্কে অগ্রিম প্রেডিক্ট করা আপাতত অসম্ভব। তারা হয়তো সকল জ্ঞানের অধিকারী হবে। তাদের হয়তো কোনো ফিজিক্যাল ফর্ম থাকবে না।

তা যাহোক, এই সময়ে কিছুই বলা অসম্ভব, এগুলো জাস্ট অনুমিত ধারণা। হয়তো আমরা টাইপ-I হওয়ার আগেই বিলুপ্ত হয়ে যাব। যদি আরও কয়েক শত বছর টিকে থাকি, বিজ্ঞান আমাদের কোথায় নিবে তা ভাবলেই কেমন যেন লাগে। যদি আমরা নিজেরা নিজেদের ধ্বংস না করি কিংবা কোনোভাবে মিলিয়ন বছর টিকে যাই, তাহলে মানব সভ্যতা কোথায় যাবে তা ভাবা যায়! হয়তো টিকে থাকলে আমরাই পুরো মহাবিশ্বে রাজত্ব করব একদিন।
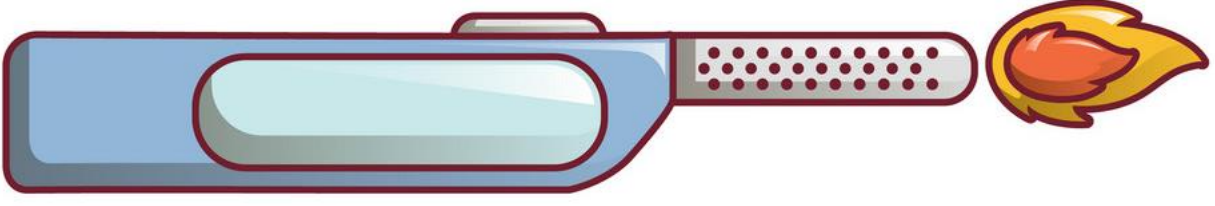
পিজোইলেকট্রিক গ্যাস স্টোভ লাইটার

অমিত চৌধুরী

রান্নাঘরের একটি অন্যতম দরকারি যন্ত্র হলো এই পিজোইলেকট্রিক গ্যাস স্টোভ লাইটার বা ইগনিটর। আমাদের অনেকের বাসাতেই হয়তো এটি আছে। এই যন্ত্রটি বেশ চমৎকার। “সিম্পলের মধ্যে গর্জিয়াস” বলে যে কথাটি ইদানিং বেশ জনপ্রিয় একটা কথা, যার সাথে এটি বেশ মানায়। কারণ, এই যন্ত্রটি দিয়ে রান্নাঘরের গ্যাসের চুলা জ্বালানো হয় উচ্চ বিভবের বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ ব্যবহার করে। কী, আশ্চর্য হলেন? এতে তো ব্যাটারি থাকে না তাহলে উচ্চ বিভবের বিদ্যুৎ তৈরিই বা করবে কীভাবে? আপনার মনে এই প্রশ্ন জেগে থাকলে এই লেখাটি আপনার জন্যই।

এই লাইটারগুলো মূলত স্ফটিকের পিজোইলেকট্রিক প্রভাবের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। তাহলে প্রথমেই পিজোইলেকট্রিক প্রভাবের আদ্যোপান্ত আলোচনা করা যাক।

পিজোইলেকট্রিক শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে গ্রিক 'Piezein' ও 'Electron' থেকে। এখানে, 'Piezein' অর্থ হলো চাপ দেওয়া বা নিষ্পেষিত করা। মূলত স্ফটিক, কতিপয় সিরামিক, ডিএনএ, অস্থি ইত্যাদি নির্দিষ্ট কিছু কঠিন বস্তুর ওপর বল প্রয়োগজনিত যান্ত্রিক পীড়নের ফলে ওই বস্তুতে সৃষ্ট আধান ঘনত্বের পরিবর্তনকে পিজোইলেকট্রিসিটি বলে। সেই ১৮৮০ এর দশকের কথা, তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কারের জন্যে বিখ্যাত নোবেলজয়ী পিয়েরি কুরি ও তাঁর ভাই জ্যাক কুরি প্রথম স্ফটিকের পিজোইলেকট্রিসিটির আবিষ্কার এবং বিশ্লেষণ করেন।

সাধারণ অবস্থায় পিজোইলেকট্রিক স্ফটিকের পরমাণু, অণু বা আয়নগুলোর ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধান একে অপরকে প্রশমিত করে রাখে। তখন ধনাত্মক আধানগুলোর ক্রিয়াকেন্দ্র ও ঋণাত্মক আধানগুলোর ক্রিয়াকেন্দ্র উপরিপাতিত থাকে। ফলে বিপরীত আধানদ্বয়ের সাম্যাবস্থা বিরাজ করে। কিন্তু পিজোইলেকট্রিক স্ফটিকের ওপর বল প্রয়োগ করা হলে এই সাম্যাবস্থার ভঙ্গ হয়, তখন ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জের কেন্দ্র ওপরে বা নিচে সরে যায়, ফলে স্ফটিকের দুইটি বিপরীত তলে পরস্পর বিপরীত আধানের সৃষ্টি হয়। এই দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য কয়েকশ ভোল্ট পর্যন্ত হতে পারে। এদের পরিবাহী দিয়ে যুক্ত করলে ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে ইলেকট্রন দ্রুত ধনাত্মক প্রান্তে প্রবাহিত হয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে। উদাহরণ হিসেবে বহুল ব্যবহৃত কোয়ার্টজের পিজোইলেকট্রিসিটির ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করলে হয়তো বুঝতে সুবিধা হবে।

কোয়ার্টজ হলো SiO_2 (সিলিকন ডাইঅক্সাইড) এর স্ফটিক। কোয়ার্টজের সিলিকন ও অক্সিজেন সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ। তবে তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্যের কারণে এরা যথাক্রমে আংশিক ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানযুক্ত হয়। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় এর ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধান পরস্পরকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়, ফলে কোয়ার্টজ স্ফটিক আধানবিহীন। কিন্তু বল প্রয়োগে স্ফটিকের যান্ত্রিক পীড়নের ফলে সিলিকন পরমাণুগুলোর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে ফলে ধনাত্মক আধানের ক্রিয়া কেন্দ্র থেকে সরে যায়, অন্যদিকে অনুরূপভাবে অক্সিজেন পরমাণুর অবস্থান পরিবর্তনের ফলে ঋণাত্মক আধানের ক্রিয়াকেন্দ্রও সাম্যাবস্থা থেকে সরে যায়। তখন যে দিকে ধনাত্মক কেন্দ্র সরে গিয়েছে সেই দিকে ধনাত্মক ও অনুরূপভাবে বিপরীত প্রান্তে ঋণাত্মক আধানের ঘনত্ব সাময়িকভাবে বেড়ে যায়। শুধু কোয়ার্টজই নয়, এরকম আরও অনেক স্ফটিকে পিজোইলেকট্রিক প্রভাব দেখা যায়। যেমন: টোপাজ, টারমালিন, আখের চিনি, সুক্রোজ, রোশেল লবণ ($KNaC_4H_4O_6 \cdot 4H_2O$), লেড টাইটানেট ($PbTiO_3$), লেড জিরকোনেট টাইটানেট, সোডিয়াম পটাশিয়াম নায়োবেট (NaKNb) ইত্যাদি।
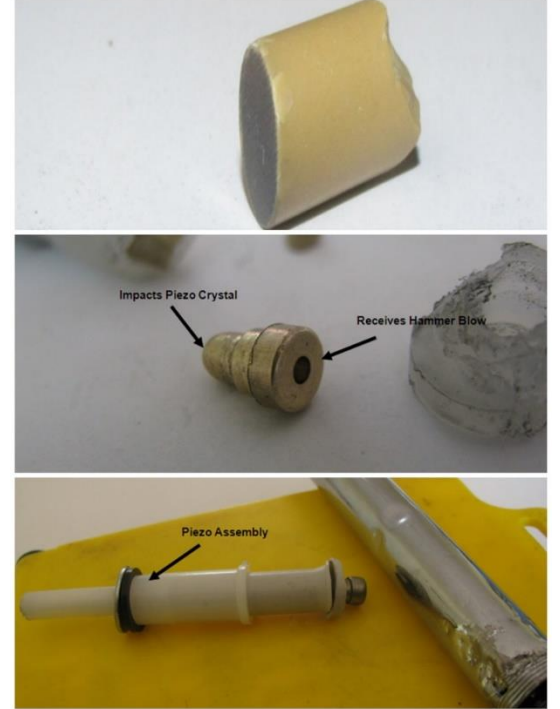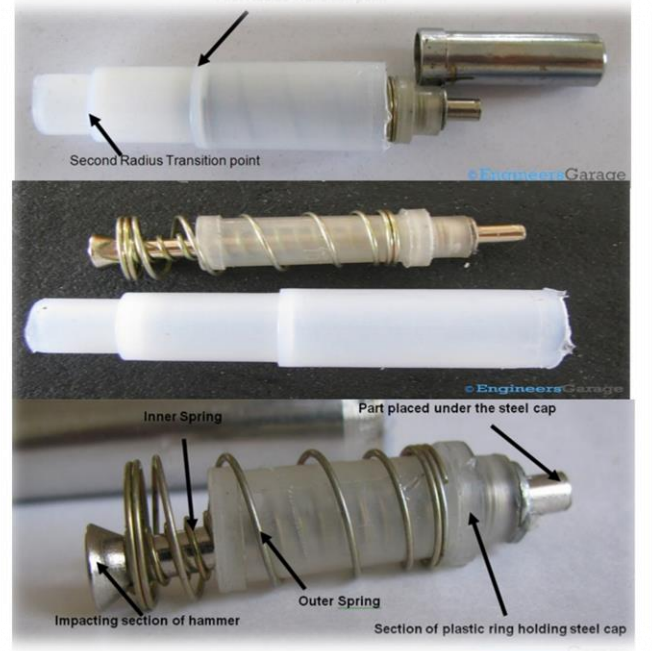
লাইটারের ওপরের দিকে যে বাটনে আমরা চাপ দিই তার নিচে প্লাস্টিকের কাঠামোতে একটি স্প্রিং যুক্ত হাতুড়ি থাকে। লাইটারের ওপরের উন্মুক্ত বাটনে হাত দিয়ে চাপ প্রয়োগ করলে হাতুড়িটি প্রথমে কিছুটা পিছিয়ে আসে, যখন বলের পরিমাণ নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করে তখন হাতুড়িটি সজোরে এর নিচের অংশের প্যাডে আঘাত করে।

উল্লেখ্য, নিচের ইম্প্যাক্ট প্যাডটি তড়িৎবাহী পদার্থে নির্মিত এবং গোলাকার ধাতব অংশের মাধ্যমে লাইটারের ধাতব সিলিন্ডারের সাথে যুক্ত। এই ইম্প্যাক্ট প্যাডের নিচে থাকে বিশেষভাবে কাটা পিজোইলেকট্রিক স্ফটিক। ইম্প্যাক্ট প্যাডে হাতুড়ি আঘাত করলে সেটি আবার ক্রিস্টালকে জোরে আঘাত করে। স্ফটিককে আঘাত করার ফলে এর আকৃতির পরিবর্তন ঘটে এবং পিজোইলেকট্রিক প্রভাবের কারণে স্ফটিকের ঊর্ধ্ব ও নিম্ন প্রান্ত সাময়িকভাবে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জে চার্জিত হয়। এই দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য প্রায় ৮০০ ভোল্টের মতো হয়।

স্ফটিকের নিচের প্রান্তের সাথে একটি দণ্ডাকার ধাতব পরিবাহী যুক্ত থাকে, যা নিম্ন প্রান্তের ইলেকট্রনকে লাইটার সিলিন্ডারের নিচ পর্যন্ত নিয়ে যায়। এই দণ্ড আর ধাতব সিলিন্ডারের দেয়ালের মাঝে খুব কম ফাঁকা স্থান থাকে। উচ্চ বিভবের কারণে এই স্থানের বায়ু আয়নিত হয়ে যায় এবং আয়নিত বায়ুর মাধ্যমে দণ্ডের ইলেকট্রন দণ্ড থেকে ধাতব সিলিন্ডারে সঞ্চারিত হয় এবং সেখান থেকে ইম্প্যাক্ট প্যাডের মাধ্যমে স্ফটিকের ধনাত্মক প্রান্তে পৌঁছায়। এসময় যে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয়, তা চুলার গ্যাসে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।
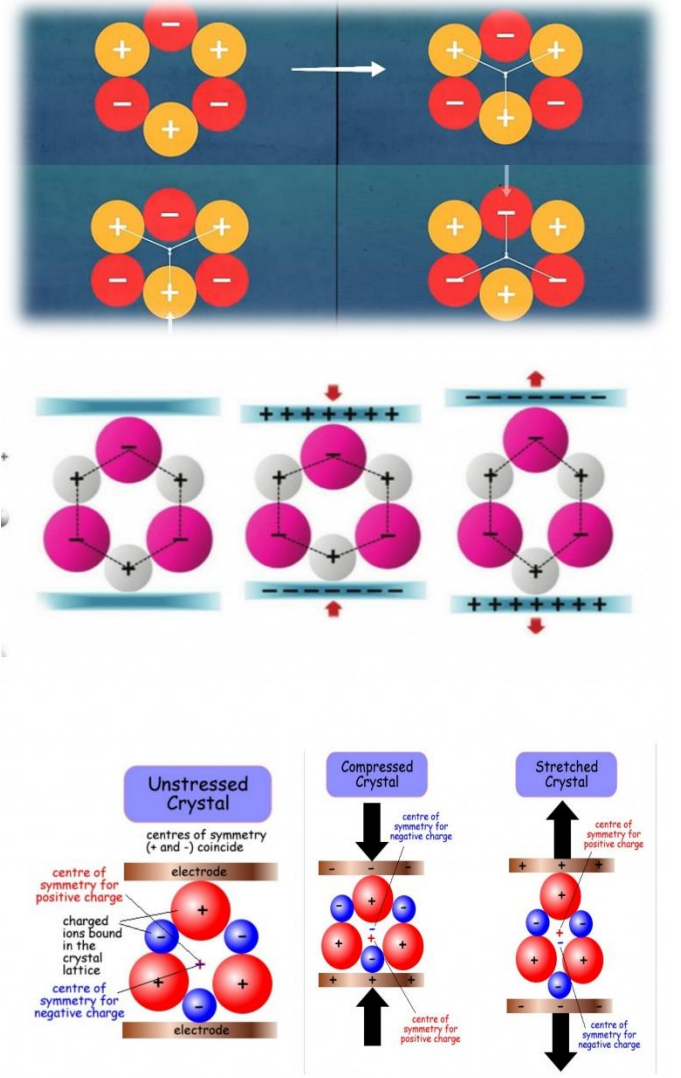
অনেকে ভাবে ডিজিটাল কারেন্সী, বিশেষ করে বিটকয়েন আনলিমিটেড, যত ইচ্ছে মাইনিং করা সম্ভব। আসলে প্রচলিত পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ ২.১ কোটি বিটকয়েকন মাইনিং করা যাবে।
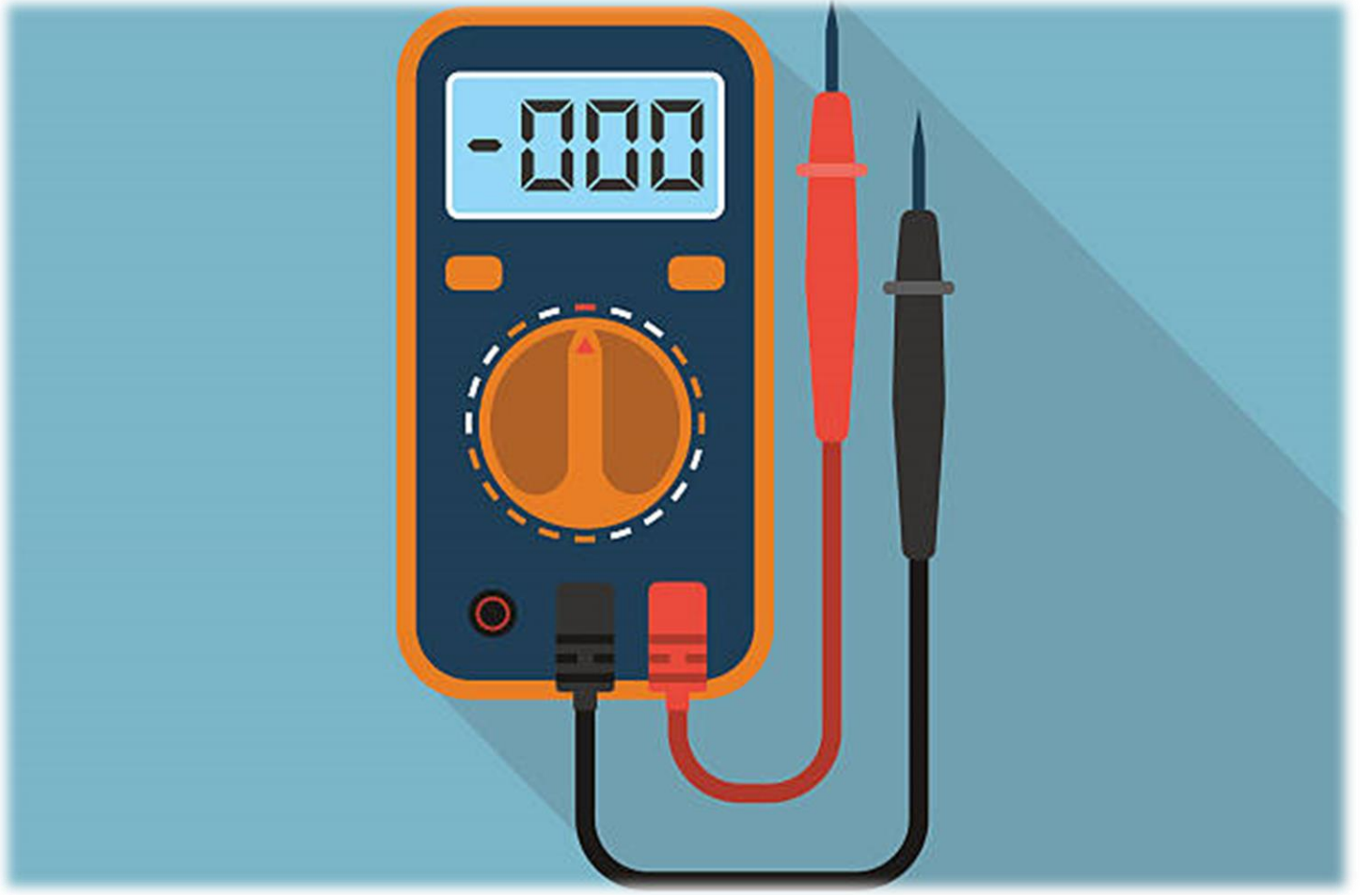
মুভিং কয়েল গ্যালভানোমিটার, অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার

(কারেন্ট ও ভোল্টেজের মাপজোখ)

প্রান্ত দাস

একটা বৈদ্যুতিক তারের দুই প্রান্তে যদি ব্যাটারি লাগাই তাহলে কী হয়? ব্যাটারি লাগালে ওই তারের মধ্যে যে সকল ফ্রি ইলেকট্রন আছে সেগুলো নির্দিষ্ট এক দিকে দৌড়ানো শুরু করে। আর আমরা তখনই বলি বিপরীত দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে।

নবম-দশম শ্রেণিতেই মূলত আমরা এটুকু মোটামুটি বুঝি যে, বৈদ্যুতিক তারের দুই প্রান্তে যখন বিভবের একটা পার্থক্য (Potential Difference) তৈরি করা হয় তখন সেই তারের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন একই দিকে দৌড়াদৌড়ি করে। আর ইলেকট্রনের দৌড়াদৌড়ি মানেই হচ্ছে কারেন্ট। এই যে বিভবের পার্থক্য তৈরি করতে হয়, এই তৈরি করার কাজটাই করে আমাদের ব্যাটারি। এতটুকুতে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাবে; অধিক প্রয়োজন হলে যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে দেখা যাবে।

কারেন্ট ও ভোল্টেজ এর পরিমাপ:

কথা হচ্ছে, একটা তার দিয়ে কতটা বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে? বা, একটা তারের দুই প্রান্তে কতটা বিভব পার্থক্য অ্যাপ্লাই করা হয়েছে সেটা কীভাবে মাপা যায়! এটুকু জানি, অ্যামিটার দিয়ে কারেন্ট মাপা হয় আর ভোল্টমিটার দিয়ে ভোল্টেজ (বিভব পার্থক্য) মাপা হয়। আমরা ল্যাবে যখন কোনো সার্কিট বানিয়ে কোনো এক্সপেরিমেন্ট করি তখন একটা তার দিয়ে কতটা কারেন্ট যাচ্ছে সেটা মাপার জন্য ওই তার কেটে এর মাঝে একটা অ্যামিটার বসিয়ে দিই। আবার নির্দিষ্ট দুইটা প্রান্তের মাঝে বিভব পার্থক্য

কতটা সেটা মাপার জন্য ওই প্রান্তদ্বয়ে ভোল্টমিটার থেকে বের হওয়া দুইটা তার জুড়ে দিই। এখানে একটা জ্ঞানের কথা, আশা করছি সবারই জানা, বিদ্যুৎ প্রবাহের SI একক Ampère (A) এবং বিভব পার্থক্যের SI একক Volt (V)।
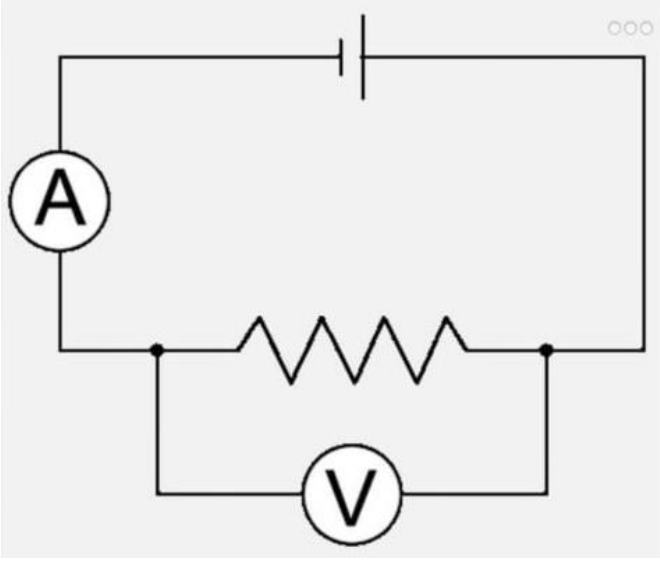
আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, এই অ্যামিটার আর ভোল্টমিটার কীভাবে যথাক্রমে বিদ্যুতের ও ভোল্টেজের পরিমাপ করে। একটা যন্ত্র কীভাবে কাজ করে সেটা জানার জন্য যন্ত্রটার গঠন জানা আবশ্যক। তাই আগে আমরা এদের গঠনটা জেনে নেব। আর একটা সুখের বিষয় হচ্ছে, অ্যামিটার আর ভোল্টমিটারের গঠন প্রায় একই। মুভিং কয়েল অ্যামিটার আর ভোল্টমিটার বানানো হয় মুভিং কয়েল গ্যালভানোমিটারের সাথে জাস্ট ভিন্নভাবে একটা রোধক লাগিয়ে। কীভাবে এবং কেন লাগানো হয়, লাগালে কীভাবে কাজ করে–এগুলো একটু পর জানার জন্য চলুন আগে জেনে নিই মুভিং কয়েল গ্যালভানোমিটার কী?

গ্যালভানোনিটার হচ্ছে এমন একটা যন্ত্র যেটা একটা তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে কি না সেটা বলে দিতে পারে এবং খুবই অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে তার পরিমাণও বলে দিতে পারে। এই লেখার শিরোনামে গ্যালভানোমিটারের সামনে আবার 'মুভিং কয়েল' লেখার কারণ হচ্ছে, আমাদের আলোচ্য গ্যালভানোমিটারের ভেতরে একটা কয়েল থাকে, সেই কয়েলটা মুভ করে বা ঘুরে। আর এটাই গ্যালভানোমিটারের আসল অংশ। এখন পাঠক ভাবতে পারেন, গ্যালভানোমিটারই তো কোনো তার দিয়ে বিদ্যুৎ যাচ্ছে কি না সেটা বলে দিচ্ছে, সাথে বিদ্যুতের পরিমাণও দেখিয়ে দিচ্ছে; তাহলে বিদ্যুৎ প্রবাহ দেখার জন্য ও পরিমাপ করার জন্য গ্যালভানোমিটার থেকে আবার অ্যামিটার বানাতে হয় কেন? সচেতন পাঠক অবশ্যই লক্ষ করেছেন, গ্যালভানোমিটার শুধু অল্প কারেন্ট হলেই তার পরিমাপ করতে পারে, মাইক্রো বা মিলি অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত। বড়ো মাপের কারেন্ট মাপার জন্য অ্যামিটার প্রয়োজন হয়। আসলে গ্যালভানোমিটার খুবই সেনসিটিভ যন্ত্র হয়। যদি খুব অল্প বিদ্যুৎও একটা তার দিয়ে প্রবাহিত হয় সেটা গ্যালভানোমিটার বলে দিতে পারে। কিন্তু অ্যামিটার আবার সেটা পারে না; তত সেনসিটিভ না। এজন্য অল্প কারেন্ট ডিটেক্ট করার জন্য আমরা গ্যালভানোমিটারই ব্যবহার করি। অ্যামিটার যে কেন অল্প কারেন্ট ডিটেক্ট করতে পারে না সেটা অ্যামিটারের গঠন ও কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করে সামনে দেখে নেব। মজার ব্যাপার খুবই অল্প কারেন্টের উপস্থিতি বলতে পারে না বলেই এটা বড়ো কারেন্টের মান দেখাতে সক্ষম! যেহেতু গ্যালভানোমিটার থেকেই অ্যামিটার আর ভোল্টমিটার আসবে সেহেতু গ্যালভানোমিটারের গঠন ও কীভাবে কাজ করে দেখে নিই।

মুভিং কয়েল গ্যালভানোমিটারের গঠন–
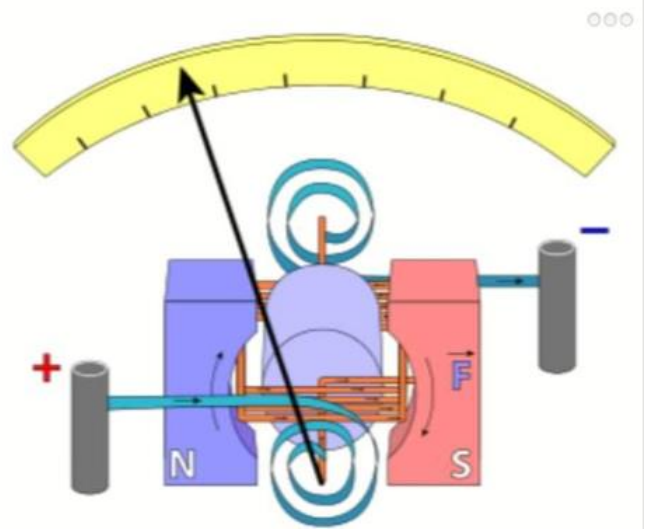
১. চিত্রতে মুখোমুখি দুইটা একই আকৃতির জিনিস দেখা যাচ্ছে যেগুলো N এবং S দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই দুইটা হলো একটা অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বকের দুইটা মেরু। অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বক (Horse-shoe magnet) মানে হচ্ছে কাটা গোল চুম্বক। মাইকে বা স্পিকারে যে চুম্বক লাগানো থাকে সেটার একটু অংশ কেটে ফেলে দিলেই সেটাকে অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বক বলা যায়। তো এই কেটে ফেলে দেওয়া ফাঁকা অংশের দুই দিকে দুইটা মেরু তৈরি হবে। চিত্রতে শুধু ওই দুইটা মেরু দেখানো হয়েছে, সম্পূর্ণ চুম্বক নয়।

অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বক না বুঝলেও ক্ষতি ছিল না; আমাদের শুধু এতটুকু বুঝতে হবে, N এবং S হচ্ছে যথাক্রমে চুম্বকের উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু। (অশ্বক্ষুরাকৃতি বা Horseshoe চুম্বকের সম্পূর্ণ চিত্রর জন্য
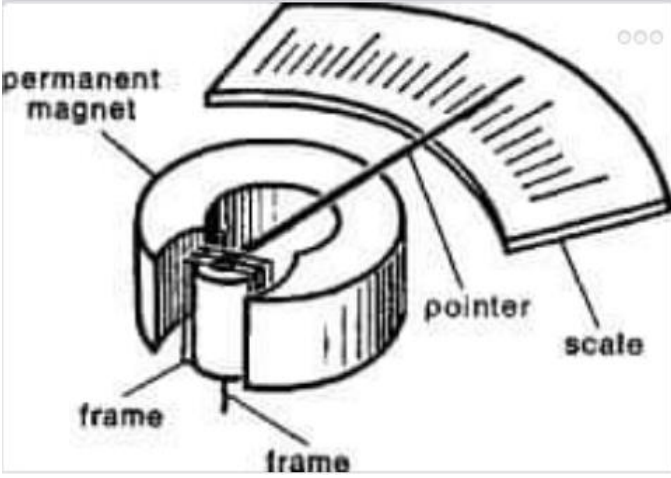
২. (চিত্র: ২ থেকে) চিত্রতে N ও S চিহ্নিত অংশ দুটি হচ্ছে চুম্বকের দুই মেরু। দুই মেরুর মাঝে হালকা বেগুনি রঙের বেলন আকৃতির জিনিসটা হচ্ছে non-magnetic ধাতব হালকা ফ্রেম। যেমন অ্যালুমিনিয়ামের হতে পারে। এটাকে নন-ম্যাগনেটিক রাখা হয়েছে যাতে পাশের চুম্বকের প্রভাবে ফ্রেমটি প্রভাবিত না হয়। আর অ্যালুমিনিয়াম হালকা তো বটেই সাথে চৌম্বকক্ষেত্রকে বুড়ো আঙুল দেখায়। অ্যালুমিনিয়ামের না হয়ে এই ফ্রেমটা সফট আইরনেরও হতে পারে। মূল কথা হচ্ছে, যা দিয়েই এই বেলনাকৃতির ফ্রেমটা তৈরি হবে সেটা হতে হবে পাতলা, ধাতু ও নন-ম্যাগনেটিক যাতে এটাকে নাড়াতে খুব বেশি বলের প্রয়োজন না হয়, আর চুম্বক সরাসরি একে আকর্ষণ/বিকর্ষণ না করে।

৩. এই বেলনাকৃতির ফ্রেমটার ওপর প্যাঁচানো থাকে কপারের তার। চিত্রতে মোটামুটি লাল রঙে যে তার প্যাঁচানো আছে সেটা। তবে চিত্র:২ এর মতো ফ্রেম এবং তারের মধ্যে ফাঁকা থাকে না। বেলনটার গায়েই জড়ানো থাকে। চিত্র:২-এ দেখাই যাচ্ছে, যে তার প্যাঁচানো হয়েছে তার দুই প্রান্ত থেকেই পজিটিভ আর নেগেটিভ দুইটা প্রান্ত এসেছে। আমরা যে তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ যাচ্ছে কি না পরীক্ষা করব সেই তার কেটে, কাটা তারের দুই প্রান্তে এই দুইটা প্রান্ত লাগিয়ে দিয়েই বিদ্যুতের উপস্থিতি চেক করি।

তাহলে কী হবে? বিদ্যুৎ যখন আমাদের পরিক্ষীয়মাণ(যা দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে) তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবে তখন সেটা আমাদের এই প্যাঁচানো তারের মধ্য দিয়েও প্রবাহিত হবে। কারণ পরিক্ষীয়মাণ তারের মাঝেই তো এই তার জুড়ে দিয়েছি। লক্ষ করার বিষয়–তার পেঁচিয়ে কিন্তু একটা আয়তাকার কয়েল তৈরি করেছি।

৪. চিত্র:৪-এ নীল তীর চিহ্ন দিয়ে বিপরীত চৌম্বকমেরু দুইটির ফলে তৈরি চৌম্বকক্ষেত্রের বলরেখা (Magnetic Field Lines) দেখানো হচ্ছে। মনে রাখার বিষয়, কোনো বিশেষ দিকে (উত্তর মেরুর দিকে বা দক্ষিণ মেরুর দিকে) কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ডের শক্তি কম-বেশি না; উভয় দিকেই সমান। তাহলে আমরা বলতে পারব চৌম্বক মেরু দুইটি মাঝখানে একটা ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করেছে। এখানে চুম্বকের কাজই এই ফিল্ড তৈরি করা। আর কোনো কাজ নেই। চুম্বকটা গোল করে কাটায় চৌম্বক বলরেখাগুলো কিন্তু কয়েলটা ঘুরালেও সবসময়ই কয়েলটার প্যারালালে আছে।

৫. চিত্র:৪-এ যে 'রেস্টোরিং' লেখা আছে সেটা একটা সিম্পল স্প্রিং যেটা গ্যালভানোমিটারের বাইরের বডির সাথে এবং বেলনাকৃতির ফ্রেমটার সাথে জড়ানো থাকে।

৬. বেলনাকৃতির ফ্রেমটার ওপরে দেখা যাচ্ছে একটা পয়েন্টার। এটা সাধারণত পাতলা ধাতু, যেমন অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি। এর সামনে একটা স্কেল লাগানো থাকে। যেখানে পরিমাপ লেখা থাকে। এই পয়েন্টার যত বেশি ঘুরবে, স্কেলে তত বড়ো মান দেখাবে, বুঝতে হবে কারেন্ট তত বেশি যাচ্ছে।

কিন্তু বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে পয়েন্টার ঘুরবে কেন?

পয়েন্টারটা লাগানো আছে চুম্বকের মেরুদ্বয়ের মাঝে রাখা হালকা বেলনাকৃতির ফ্রেমটার ওপর, তাই না? তো, পয়েন্টারটা তখনই ঘুরবে যখন এই বেলনটা বা ফ্রেমটা ঘুরবে। কিন্তু আমরা আগেই জেনেছি–ফ্রেমটা একটা নন-ম্যাগনেটিক ধাতুর তৈরি। অর্থাৎ, চুম্বকের কোনো প্রভাব এই ফ্রেমের ওপর পড়বে না। আর চুম্বকের প্রভাবে ঘোরালেও আমাদের কাজ হবে না। আমাদের পয়েন্টার তথা বেলনাকৃতির ফ্রেমটা ঘুরতে হবে কারেন্টের প্রভাবে। যদি বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলেই শুধু ঘুরে তবেই তো বলতে পারব, "পয়েন্টার নড়েছে মানে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে।"

এই ফ্রেমের গায়ে তো আবার আমরা কপারের তার পেঁচিয়েছি। যে পরিবাহী তারের মাঝে এই গ্যালভানোমিটার লাগানো হবে সেই পরিবাহী দিয়ে যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে তখন তো এই পেঁচিয়ে বানানো তারের কয়েল দিয়েও বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে। তো, কোনোভাবে কি এই তার প্যাঁচানো কয়েলটা বিদ্যুতের প্রভাবে ঘুরবে? এটা ঘুরলে তো সাথে বেলনাকৃতির ফ্রেমটাকে নিয়ে ঘুরবে। আর ফ্রেমটা ঘুরলে আমাদের পয়েন্টার ঘুরবে। আর পয়েন্টার ঘুরলেই তো স্কেলে রিডিং দেখাবে! হ্যাঁ, এই কপার তারের

কয়েলটাই আসলে ঘুরবে যখন এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে। কিন্তু কপার তারের কয়েলটার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে সেটা ঘুরবে (Rotate) কেন?

এর উত্তর করতে হলে আসলে একটা ব্যাসিক প্রিন্সিপাল জানতে হয়। সবে হাইস্কুলে প্রবেশ করা বাচ্চাদের কথা চিন্তা করে একদম শুরু থেকে বিষয়টা বলব। ডিরেক্ট কোনো প্রিন্সিপাল এনে সেটা কাজে লাগিয়ে গ্যালভানোমিটার তৈরি করে দিয়ে দেবো না। তো, এবার কিছু জ্ঞানের কথা সেরে নিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর করব।

জ্ঞানের কথা:১–

“কোনো বৈদ্যুতিক তার দিয়ে যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তখন সেটা তার চারপাশে একটা চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি করে।”

হ্যাঁ, এটা এক্সপেরিমেন্টাল সত্যবচন। এর মানে আমাদের গ্যালভানোমিটারে বেলনের ওপর কপারের তার পেঁচিয়ে বানানো কয়েলও তার চারপাশে একটা চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি করবে যখনই এর মধ্য দিয়ে কারেন্ট যাবে।

এবার একটা সহজ সাধারণ সেন্সের প্রশ্ন করা যেতে পারে, একটা চুম্বকের পাশে আরেকটা চুম্বক আনলে এগুলো আকর্ষণ/বিকর্ষণ করে কেন? যেমন, চুম্বকের কাছে তো প্লাস্টিক আনলে সেটাকে আকর্ষণ /বিকর্ষণ করছে না। উত্তর হচ্ছে, একটা চুম্বক তার পাশে চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি করেছে। আর এই চৌম্বকক্ষেত্রের মাধ্যমেই সে অন্য বস্তুকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করবে (সোজা কথায়, বল প্রয়োগ করবে)। তো, যাকে প্রভাবিত করবে তাকেও তো চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। যাতে দুইটা চৌম্বকক্ষেত্র একে অপরের সাথে মেলামেশা করতে পারে। এভাবে দুইটা চুম্বক নিজেদের মধ্যে আকর্ষণ/বিকর্ষণ প্রদর্শন করে।

(অতিরিক্ত জ্ঞান: লোহা, স্টিল জাতীয় ধাতুগুলো চৌম্বকক্ষেত্রে এলে চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত হওয়ার কারণ হচ্ছে এগুলোও এদের চারপাশে চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি করে। কিন্তু এসব পদার্থ শুধু তখনই চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি করে যখন কোনো বাহ্যিক চুম্বকের কাছাকাছি আসে।

এসব থেকে আমরা যে সরল সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি তা হচ্ছে, একটা চৌম্বকক্ষেত্র আরেকটা চৌম্বকক্ষেত্রকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে চৌম্বকক্ষেত্রদ্বয়ের উৎস দুটি একে অপরকে প্রভাবিত করে।

জ্ঞানের কথা:২

একটা বাহ্যিক চৌম্বকক্ষেত্র বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের ওপর কোন দিকে বল প্রয়োগ করে?

একটা বাহ্যিক চৌম্বকক্ষেত্রের দ্বারা একটা বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের ওপর কোন দিকে বল প্রযুক্ত হবে সেটা জানা যায় ফ্লেমিং’স লেফট হ্যান্ড রুল (Flaming's Left Hand Rule) থেকে। ফ্লেমিং এর এই বামহাতি নিয়ম বলে, "আপনার বামহাতের প্রথম তিনটা আঙুল অর্থাৎ বৃদ্ধা, তর্জনী এবং মধ্যমাকে চিত্রর মতো করে ছড়িয়ে দিন, যাতে যে-কোনো দুইটা আঙুলের মধ্যে একটা সমকোন তৈরি হয়।
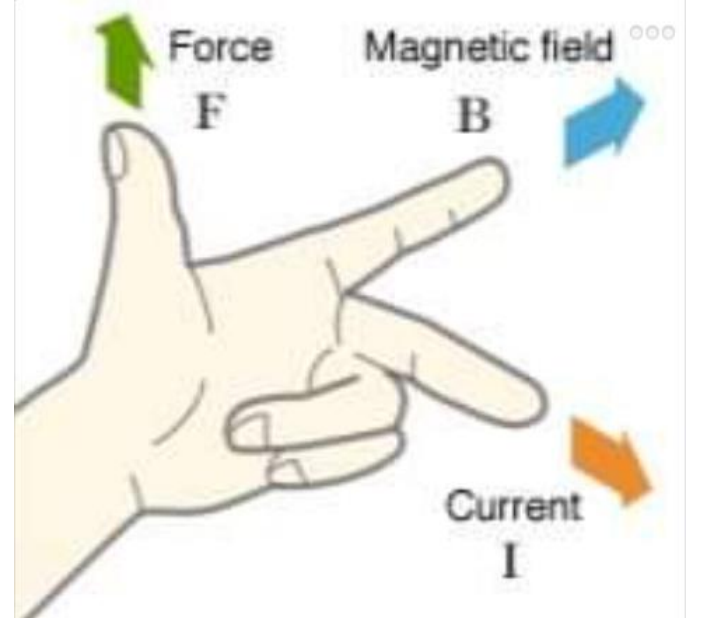
এবার আপনার মধ্যমা যদি বিদ্যুৎ যেদিকে প্রবাহিত হচ্ছে সেদিকে তাক করে ধরেন, আর আপনার তর্জনী বাহ্যিক চৌম্বকক্ষেত্রের দিকে তাক করে ধরেন; তাহলে আপনার বৃদ্ধাঙ্গুলিটা যেদিকে তাক করানো আছে সেটাই হবে প্রযুক্ত বলের দিক। অর্থাৎ, বৃদ্ধাঙ্গুলির দিকে পরিবাহী তারটা সরে যেতে চাইবে।"

বিষয়টা একটু ভিজ্যুয়ালাইজ করা যাক। ধরুন, আপনার চোখের সামনে একটা উলম্ব বৈদ্যুতিক তার আছে যেটা দিয়ে ওপর থেকে নিচের দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে। আর আপনার বাম থেকে ডান দিকে একটা চৌম্বকক্ষেত্র রয়েছে।

এবার আপনার বাম হাতের প্রথম তিন আঙুল যেমন বলা হয়েছে ছড়িয়ে দিন। মধ্যমাটা পয়েন্ট করুন নিচের দিকে, কারণ নিচের দিকে কারেন্ট। তর্জনীটা পয়েন্ট করুন ডান দিকে, কারণ এটা চৌম্বকক্ষেত্রের দিক। এবার বলুন তো বৃদ্ধাঙ্গুলিটা কোন দিকে পয়েন্ট করছে? – আপনার দিকে। অর্থাৎ, বৈদ্যুতিক তারটা আপনার দিকে সরে আসতে চাইবে।

Flaming's Left Hand Rule জানার পর এখন আমরা গ্যালভানোমিটারের কার্যপদ্ধতি বুঝতে পারব।

গ্যালভানোমিটারের কার্যপ্রণালী –

আমাদের গ্যালভানোমিটারের গঠনটা মনে করুন (চিত্র:২ বা চিত্র:৩ চ)। গ্যালভানোমিটারে বেলনাকৃতির ফ্রেমের ওপর প্যাঁচানো কপার তারের কয়েলটা কোথায় রাখা হয়েছিল? হ্যাঁ, দুইটা চৌম্বকমেরুর মাঝখানে যেখানে কিনা একটা ইউনিফর্ম চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি হয়েছে সেখানে। আবার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার দরুণ কয়েলটার চারপাশেও তো একটা চৌম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু চুম্বক থেকে সৃষ্ট চৌম্বকক্ষেত্র আর বিদ্যুৎ পরিবাহী কয়েলের চৌম্বকক্ষেত্র মিলেমিশে একাকার হবে, সুতরাং কয়েল ও চুম্বক একে অপরের ওপর বল প্রয়োগ করবে। গ্যালভানোমিটারের ভেতরের চুম্বক যেহেতু বাইরের বডির সাথে ফিক্সড থাকে সেহেতু তার নড়াচড়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু কপার তারের কয়েল যার ওপর প্যাঁচানো সেই বেলন ফ্রেমটা তো কারো সাথে ফিক্সড করে আটকানো নেই। তাই এটা নিশ্চয় ঘুরতে পারে; অর্থাৎ, Rotate করতে পারে।

তারের কয়েলটা ঘুরলেই সাথে বেলনটা ঘুরবে। বেলনটা ঘুরলেই পয়েন্টার ঘুরবে আর কারেন্ট দেখাবে। তো, এবার দুই চুম্বকের মাঝে শুধু কয়েলটা বসানো চিত্র:৬ দেখি আর কয়েল ঘোরার কারণ এবং দিক দেখি। (চিত্র:৬)

ওপরে বর্ণিত ফ্লেমিং-এর বামহাতি নিয়মে আঙুল ছড়িয়ে দেখা যাবে কয়েলের CB বাহু ওপরের দিকে বল এক্সপেরিয়েন্স করছে এবং AD বাহু নিচের দিকে। এই দুইটা বল এভাবে বিপরীতমুখী হওয়ায় কাটাকাটি গেল। অর্থাৎ, কয়েলটা নিচেও নামছে না ওপরেও যাচ্ছে না। এবার, ফ্লেমিং-এর বামহাতি নিয়মমতে AB বাহু আমাদের থেকে দূরে সরে যেতে বল এক্সপেরিয়েন্স করছে, আর CD বাহু আমাদের কাছে সরে আসার জন্য বল এক্সপেরিয়েন্স করছে। বুঝতে পারছেন? কয়েলটা তাহলে PQ-কে অ্যাক্সিস (axis) বানিয়ে ঘুরতে শুরু করবে। তাহলে বলতে পারি, কয়েলটা এখানে 'টর্ক' এক্সপেরিয়েন্স করছে।

যখন কয়েলে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে তখন কয়েলটা কোনো চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি করবে না; কয়েলের কোনো বাহু কোনো বল এক্সপেরিয়েন্স করবে না, ফলে কয়েলটা ঘুরবেও না।

আগেই বলেছি, যে তারের মাঝে গ্যালভানোমিটার লাগানো হয়েছে সেই তারে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলেই কয়েলটা দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে; এভাবেই কানেক্ট করা। তাহলে কয়েল ঘুরবে মানে বেলনাকৃতির পাতলা ফ্রেমটাও সাথে ঘুরবে। মানে পয়েন্টারটাও ঘুরবে। এবার যত বেশি বিদ্যুৎ এই তার দিয়ে প্রবাহিত হবে কয়েলের বাহুগুলো তত বেশি বল এক্সপেরিয়েন্স করবে (এই বল বিদ্যুৎ প্রবাহের মানের সমানুপাতিক)। কয়েলটা বেশি টর্ক এক্সপেরিয়েন্স করবে, পয়েন্টার বেশি ঘুরবে। বড়ো মান দেখাবে।

তাহলে বারবার নির্দিষ্ট পরিমাণ কারেন্টের জন্য পয়েন্টারের অবস্থান মেপে একটা কাগজে সেই অনুযায়ী স্কেল এঁকে নিয়ে সেটাকে পয়েন্টারের সামনে চেপে দিলেই হলো। হয়ে গেল গ্যালভানোমিটার! তারে কারেন্ট আছে, আর পয়েন্টার সেই কারেন্ট দেখাচ্ছে। কারেন্ট নেই তো পয়েন্টার তার নিজের জায়গায় বসে আছে।

গ্যালভানোমিটারের গঠনটা মনে করুন, ফ্রেমটা একটা রেস্টোরিং স্প্রিং এর সাথে লাগানো ছিল। যখন বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় তখন এই স্প্রিংটা ফ্রেমটাকে তথা পয়েন্টারটাকে পূর্বের স্থানে নিয়ে যায়, যেখানে আমাদের স্কেলের কারেন্টের মান লেখা আছে শূন্য।

গ্যালভানোমিটার খুবই সেনসিটিভ হয়। অল্প বিদ্যুৎ প্রবাহেই অনেক দূর ঘুরে যায়। তাই বড়ো মাপের কারেন্ট মাপতে পারে না। আর সেজন্যই প্রয়োজন হয় অ্যামিটারের। কোনোভাবে যদি গ্যালভানোমিটারের সেন্সিটিভিটি কমানো যায়, যাতে কারেন্ট দেবো বেশি কিন্তু ঘুরবে একটু একটু – তাহলেই কিন্তু এটা একটা অ্যামিটার হয়ে যাবে।

গ্যালভানোমিটার থেকে অ্যামিটার ও তার কার্যপদ্ধতি –
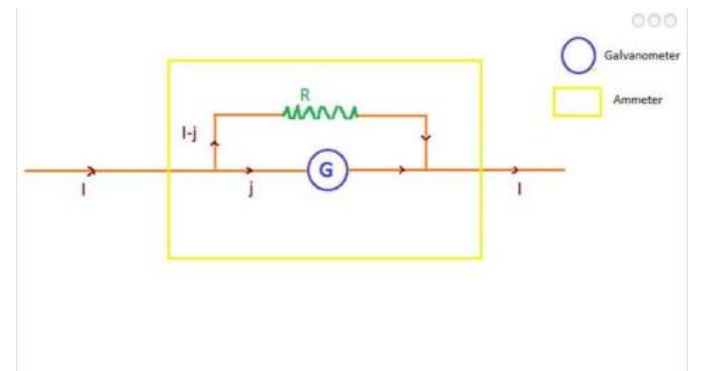
চিত্রতে যে রোধকটা লাগানো হয়েছে সেটা কায়দা করে গ্যালভানোমিটারের রোধের তুলনায় খুব ছোটো রোধ লাগানো হয়। আর রোধ যত কম, কারেন্টে বাধা তত কম। $R<G$ হওয়ায় মূল তার দিয়ে যে কারেন্ট আসছে সেটা গ্যালভানোমিটার

দিয়ে না গিয়ে সবুজ রোধকের মধ্য দিয়ে চলে যায়। আর খুবই অল্প কারেন্ট (j) গ্যালভানোমিটারের মধ্য দিয়ে পার করে।
এভাবে খুব বড়ো কারেন্ট (**I**) মূল তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলেও খুবই অল্প কারেন্ট G এর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে। **I** যত বাড়ানো হবে j-ও অল্প অল্প করে একটু একটু বাড়বে। j হবে **I** এর সমানুপাতিক। তাই গ্যালভানোমিটার দিয়ে আসলে j কারেন্ট যাচ্ছে; কিন্তু পয়েন্টারের সামনের স্কেলে তার মানটা না বসিয়ে **I** এর মান বসিয়ে স্টিকার বানিয়ে পয়েন্টের সামনে লাগিয়ে দেওয়া যায়। এই স্টিকারটা আমরা ভিন্ন মানের কারেন্ট দিয়ে পয়েন্টারের ডিফ্লেকশন পরিমাপ করে শুরুতে বানিয়ে নিতে পারি।
তাহলে অ্যামিটার আসলে চালাকি করে গ্যালভানোমিটার দিয়েই ছোটো কারেন্ট প্রবেশ করিয়ে বড়ো কারেন্ট মেপে আমাদের তার মান দিয়ে দিচ্ছে!

খুবই অল্প কারেন্ট অ্যামিটার দিয়ে মাপা যায় না কেন? গ্যালভানোমিটার প্রয়োজন কেন?
খুব ছোটো পরিমাণের কারেন্ট যদি প্রবাহিত হয় তাহলে তো কম রোধের সহজ পথ পেয়ে প্রায় পুরোটাই R এর মধ্য দিয়ে চলে যাবে। G এর মধ্য দিয়ে যাবে না বললেই চলে (চিত্র:৭-এ)। তাহলে খুবই অল্প কারেন্টের জন্য অ্যামিটার ঘুমন্ত অবস্থায়ই থাকবে! টর্কের জন্য যে ন্যূনতম বল দরকার তার জন্য তো একটা ন্যূনতম কারেন্টেরও দরকার। কয়েলের মধ্য দিয়ে সে কারেন্টই যাচ্ছে না, চলে যাচ্ছে সবুজ রোধকের সহজ পথে!

গ্যালভানোমিটার থেকে ভোল্টমিটার ও তার কার্যপদ্ধতি:
আগে একটা জিনিস ক্লিয়ার হওয়া দরকার, ভোল্টমিটার আসলে সার্কিটে কীভাবে লাগানো হয়। চিত্র:৮-এ দেখিয়েছি, যে রোধকের(যে-কোনো অ্যাপ্লাইয়েন্স) দুপাশের বিভব পার্থক্য চায় ভোল্টমিটার তার সাথে প্যারালালে লাগাতে হয়।
গ্যালভানোমিটারের সাথে একটা রোধক সিরিজে লাগালেই সেটা ভোল্টমিটার হয়ে যায়।

রোধক S, যেটা গ্যালভানোমিটারে লাগিয়ে ভোল্টমিটার তৈরি হলো সেটা আসলে খুব বড়ো মানের রোধক হয় (অ্যামিটারের লাগাতে হয়েছিল ছোটো রোধক প্যারালালে)। গ্যালভানোমিটারের রোধ G হলে ভোল্টমিটারের টোটাল রোধ তাহলে হচ্ছে (S+G)। দেখা যাক তাহলে কীভাবে কাজ করে –
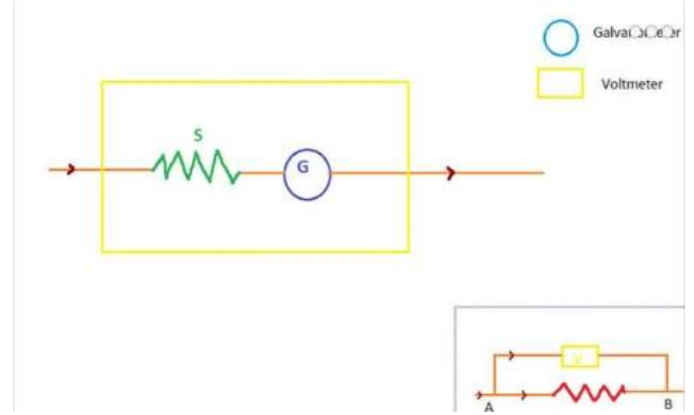
চিত্র:৮-এ নিচে কোনায় A এবং B বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে একটা রেজিস্টেন্স লাগানো আছে, তার দুই দিকের বিভব পার্থক্য মাপার জন্য প্যারালালে একটা ভোল্টমিটার লাগানো আছে। এখন ভোল্টমিটারের রোধ তো অনেক বেশি! তাই কারেন্ট সহজ সোজা পথে চলে যায়। যেহেতু ভোল্টমিটারের জন্য অসীম রোধকের ব্যবস্থা করতে পারিনি তাই ভোল্টমিটার তো একেবারে পুরো কারেন্ট আটকাতে পারবে না, অল্প একটু কারেন্ট এর মধ্যে দিয়েও যাবে।

এবার, ভোল্টমিটারকে A এবং B বিন্দুতে কী দেখানোর জন্য লাগিয়েছি?
- লাল রোধকটার দুপাশের বিভব পার্থক্য (V) দেখানোর জন্য
বা, A বিন্দু ও B বিভব পার্থক্য (V) দেখানোর জন্য
বা, ভোল্টমিটারের দুপাশের বিভব পার্থক্য দেখানোর জন্য।

ওহমের সূত্র বলে, V=IR।
তাহলে,
ভোল্টমিটারের দুপাশের বিভব পার্থক্য (V)= (ভোল্টমিটার দিয়ে পারাপার করা কারেন্ট) x (ভোল্টমিটারের রোধ)

ভোল্টমিটারের রোধ (S+G) আমরা জানি।
আর দরকার ভোল্টমিটার দিয়ে কতটা কারেন্ট যাচ্ছে, সেটা তো আমাদের মুভিং কয়েল দেখিয়ে দেবে। এই কাজ করার জন্যই তো ভোল্টমিটারের ভেতর গ্যালভানোমিটার আছে। ভোল্টমিটার তথা গ্যালভানোমিটারের মধ্য দিয়ে খুবই অল্প কারেন্ট যাচ্ছে।
এখন স্কেলের স্টিকার বানিয়ে লাগিয়ে দিলেই হলো। পয়েন্টার ঘুরবে ছোটো কারেন্টের জন্য। এখন স্টিকারে ছোট্ট কারেন্টের সাথে ভোল্টমিটারের রোধ গুণ করে যে মান পাওয়া যায় সেটা দিয়ে

স্কেলের দাগ টানব। ব্যস! ভোল্টমিটার এখন আউটপুট হিসেবে বিভব পার্থক্য দেবে!

সব শেষে টেসলা ভক্তদের প্রশ্ন–প্যাঁচাল তো কম করলা না, অল্টারনেটিং কারেন্ট (AC) যে একই তার দিয়ে দুই দিকে যাওয়া আসা করে সেই খেয়াল কি আছে? গ্যালভানোমিটারের পয়েন্টার তো একবার বাঁদিকে যাবে তো আরেকটা ডান দিকে। স্কেল জুড়ে নড়তেই থাকবে। AC কারেন্টের ভোল্টেজ কীভাবে মাপব?

ভোল্টেজ মাপার জন্য যে শুধু মুভিং কয়েল ভোল্টমিটার ব্যবহার করা হয় তা না। আরও অনেক ধরনের ভোল্টমিটার আছে। তবে সাধারণত আমাদের স্কুল-কলেজের ল্যাবে আমরা শিশুরা যে এক্সপেরিমেন্টগুলো করি (যেমন ওহমের সূত্র সিদ্ধ করা, মিটার ব্রিজ ব্যালেন্স করা ইত্যাদি) এগুলোতে সাধারণত DC নিয়েই কাজ করি।

তবুও টেসলা ভক্তদের নিরাশ নিশ্চয় করব না, সেমিকন্ডাক্টর ডায়োড দিয়ে রেক্টিফায়ার তৈরি করা হয়। আর সেই রেক্টিফায়ারের মধ্য দিয়ে যখন AC যায় সেটা DC হয়ে বের হয়। তখন তার ভোল্টেজ এবং কারেন্টের পরিমাণ আমরা আমাদের আলোচ্য মুভিং কয়েল ভোল্টমিটার ও অ্যামিটার দিয়ে পরিমাপ করে নিতে পারি।

রেক্টিফায়ারের গঠন ও কার্যপদ্ধতি–

এটা সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে বানানো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। এর কাজ হচ্ছে, AC-কে DC-তে কনভার্ট করা। খুব সুন্দর জিনিস।

পৃথিবীর প্রথম প্রোগ্রামার ছিলেন একজন নারী। অ্যাডা লাভলেস নামের এই মহিলার জন্মে ইংল্যান্ডে। অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিন নিয়ে কাজ করার জন্য তিনি বিখ্যাত।

ব্লুটুথ

রওনক শাহরিয়ার

বিশ্বে যোগাযোগের উপায় প্রতিনিয়ত বাড়ছে। আমরাও প্রযুক্তিকে আপন করে নিচ্ছি, যা পরিবার ও বন্ধুদের সাথে যোগাযোগে সহায়তা করে। তারযুক্ত মাধ্যমের অসুবিধা থেকে আমরা ওয়্যারলেস প্রযুক্তির [প্রয়োজনীয়তা] অনুভব করি এবং একসময়ের কল্পকাহিনির ওয়্যারলেস প্রযুক্তি এখন বাস্তব জীবনে ব্যবহার করছি। কিছু ওয়্যারলেস প্রযুক্তি যেমন : ওয়াই-ফাই, ব্লুটুথ, NFC ইত্যাদি প্রযুক্তির মধ্যে ব্লুটুথ সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত ও সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রযুক্তি। নিয়মিত ব্যবহার করা প্রায় সকল ডিভাইসে ব্লুটুথ সুবিধা পাওয়া যায়; সেটা ওয়্যারলেস কী-বোর্ড, মাউস, কিংবা স্মার্টওয়াচ যা-ই হোক না কেন দৈনন্দিন কাজে এর কোনো কমতি নেই।

এই প্রযুক্তির নাম ব্লুটুথ হলো কেন, তা জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে দশম শতাব্দীতে। এই সময় ড্যানিশ রাজা, যাঁর নাম 'Harald Bluetooth', যিনি ডেনমার্ক ও নরওয়ের শতাব্দীভর যুদ্ধের ইতি টেনে একতাবদ্ধ হতে ভূমিকা রাখেন। তাঁর নামের মতোই, ব্লুটুথ এসআইজি তৈরির মাধ্যমে ৩৫,০০০ হাজারের বেশি ইনডাস্ট্রির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করে একতাবদ্ধ করেছে।

ব্লুটুথ কী?

ব্লুটুথ একটি রেডিয়ো ওয়েভ প্রযুক্তি। তবে এটি মোবাইল টাওয়ারের মতো বিশাল দূরত্ব কাভারেজ করে না। একে ডিজাইন করা হয়েছে স্বল্প দূরত্বের অ্যারিয়ার মধ্যে, বা ১০ মিটার বা ৩০ ফুটের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য। স্বল্প দূরত্বের এই প্রযুক্তিকে 'WPAN' (wireless personal area network) বলা হয়। এর স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে IEEE 802.15.1।

ব্লুটুথে রয়েছে ট্রান্সমিটার ও ট্রান্সরিসিভার, যা রেডিয়ো সিগনাল গ্রহণ ও প্রেরণ করে ৭৯টি ভিন্ন ভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সি চ্যানেলে। ব্লুটুথ ডিভাইস কমিউনিকেট করে স্বল্প শক্তির রেডিয়ো ওয়েভ, যার ফ্রিকুয়েন্সি 2400 MHz-2483.5 MHz-এর মধ্যে। এই ফ্রিকুয়েন্সি আন্তর্জাতিকভাবে চুক্তিবদ্ধ করা হয়েছে। ISM (industrial, scientific and medical devices) এ ব্যবহারের জন্য।

এবার জানা যাক পিকোনেট (pikonet) সম্পর্কে। পিকোনেট হলো ব্লুটুথের মৌলিক বিষয়, যার মাধ্যমে দুই বা অধিক ডিভাইসকে সংযুক্ত করা যায়। ব্লুটুথ থাকা ডিভাইস হলো 'Peer units', যার জন্য একটি ডিভাইস হবে মাস্টার এবং বাকি ডিভাইস হবে স্লেইভ।

পিকোনেটে ৭টি মেম্বার অ্যাড্রেস আছে, যেখানে সর্বোচ্চ ৮টি ডিভাইস বা ১টি মাস্টার ও ৭টি স্লেইভ হবে।

মোবাইল টু মোবাইল বা ক্যামেরাতে কানেক্ট করলে একটি মোবাইল হবে মাস্টার ডিভাইস এবং অন্য মোবাইল বা ক্যামেরা হবে স্লেইভ ডিভাইস। যখনই মাস্টার ও স্লেইভ ডিভাইসের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়, তখন কীভাবে কোন ফ্রিকুয়েন্সিতে ডেটা ট্রান্সমিট হবে তা ঠিক করা হয়।
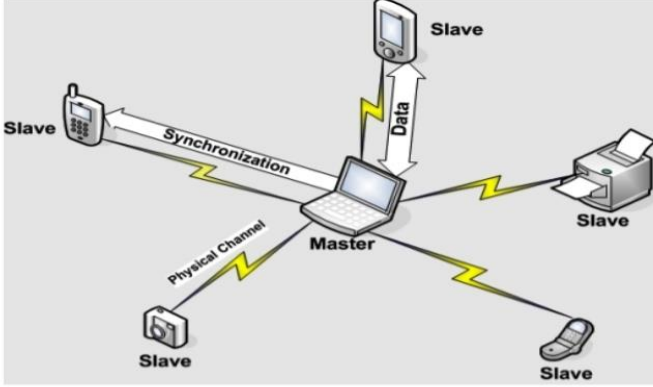
Fig. PICONET

এখন HOP সম্পর্কে জানা যাক।

HOP মূলত একটা ফ্রিকুয়েন্সি চ্যানেল থেকে আরেকটা ফ্রিকুয়েন্সি চ্যানেলে স্যুইচ করা। ব্লুটুথে ফ্রিকুয়েন্সি চ্যানেল থাকে ৭৯টি। যেহেতু ব্লুটুথ ডেটা প্যাকেট আকারে ডেটা ট্রান্সফার করে, তাই খুব সহজেই কোনোরকম সংঘর্ষ এড়াতে চ্যানেল দ্রুত চেইঞ্জ হতে পারে (সেকেন্ডে ১,৬০০ বার)। ট্রান্সমিশনে কোনো প্রকার প্যাকেট কলিশন যাতে না হয়, বা জনবহুল স্থানেও কোনো সমস্যা না হয় সেজন্য এই ব্যবস্থা। আর মোট ৬ প্রকারের হোপিং সিকোয়েন্স আছে, যা ফ্রিকুয়েন্সিকে বিভিন্নভাবে সেন্ড করে।

ব্লুটুথ জেনারেশন:

ব্লুটুথ প্রথম ১৯৯৪ সালে বের হওয়ার পর থেকে প্রতিনিয়ত আপডেট হচ্ছে। বর্তমানে ব্লুটুথ V5.0 ব্যবহার হলেও পূর্বের ভার্শনগুলো অনেক প্রচলিত।

নিচে জেনারেশনগুলোর মূল পার্থক্য দেওয়া হলো :

Bluetooth v1.2

এটি ব্লুটুথ V1.x-এর আপডেট ও স্ট্যাবল ভার্শন। V1.x ছিল প্রোটোকল এবং উল্লেখযোগ্য দিকগুলোর ভবিষ্যৎ সংস্করণের ভিত্তি।

ব্লুটুথ V1.2তে ডেটা স্পিড সর্বোচ্চ 0.7 Mbps এবং ১০ মিটার দূরত্বে সংযোগ পাওয়া যেত।

Bluetooth v2.1 + EDR

এটি ২০০৭ সালে রিলিজ হয় এবং এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। এবারে ব্লুটুথ enhanced data rate-এর (EDR) সাথে পরিচয় করাই, যার ডেটা ট্রান্সফার রেট প্রায় 2.1 Mbps এবং secure simple pairing (SSP) এই ভার্শনে শুরু হয়।

Bluetooth v3.0 + HS

ব্লুটুথের এই ভার্শনে ডেটা ট্রান্সফার রেট প্রায় 24 Mbps। এমন স্পিডের মূল কারণ, এটা Wi-Fi (802.11) এ ট্রান্সমিট করে এবং ব্লুটুথ শুধু স্ট্যাবল কানেকশন বজায় রাখতে ব্যবহার করা হয়। এই ভার্শনে ব্লুটুথ পাওয়ার এফিসিয়েন্সি অনেকটাই।

Bluetooth v4.0 and Bluetooth Low Energy

ব্লুটুথের এই ভার্শনের কাজ তিন প্রকার; ক্লাসিক বা পূর্বের ভার্শনগুলোর মতো, Bluetooth low energy (BLE) বা অনেক বেশি পাওয়ার এফিসিয়েন্সি এবং উচ্চ গতি সম্পন্ন।

Bluetooth v5.0 BLE

এই ভার্শনটা সবচেয়ে নতুন ও আগের সব ভার্শনের চেয়ে ভালো কাজ করে। খোলা স্থানে ১০০ মিটার এবং বদ্ধস্থানে ২০ মিটার পর্যন্ত কানেকশন থাকে। এটি সেকেন্ডে 2 Mbps গতিতে ডেটা ট্রান্সফার করতে পারে এবং আগের ভার্শনের চেয়ে ২.৫ গুণ বেশি পাওয়ার এফিসিয়েন্সি।

নিরাপত্তা:

ব্লুটুথকে একটা নিরাপদ ওয়্যারলেস প্রযুক্তি বলা যেতে পারে। ডেটা ইনক্রিপ্ট করে সেন্ড করা হয়, পেয়ারিং করা ডিভাইসের সাথে কানেক্ট থাকে এবং প্রতিনিয়ত ফ্রিকুয়েন্সি পরিবর্তন করতে থাকে। কিছু ডিভাইসের কোড দিতে হয় সিকিউরিটির জন্য। তাই ব্লুটুথ ডিভাইস লেভেল সিকিউরিটি দিয়ে থাকে এবং ব্লুটুথ গ্যাজেট অন্যান্য ডিভাইসের জন্য রেস্ট্রিকশন করলে তাকে 'সার্ভিস লেভেল সিকিউরিটি' বলা হয়। তবে ক্রিমিনালরা ব্লুটুথ দিয়ে ভিডাইসে সংযোগ, ম্যাসেজ প্রেরণ এবং ইনফরমেশন চুরি করতে

পারে। এখনও এই প্রযুক্তিতে হ্যাক করার অনেক উপায় রয়েছে। তাই খুব দরকার ছাড়া পাবলিক প্লেসে ব্লুটুথ না ব্যবহার করাই ভালো।

ব্লুটুথের সুবিধা:
ব্লুটুথের অনেক ভালো দিক রয়েছে। যেমন, ব্লুটুথ ট্যাদারিং (tethering)-এর মাধ্যমে ওয়াই-ফাই প্রযুক্তি বাদেও মোবাইল ডেটা শেয়ার করা সম্ভব। ব্লুটুথ থাকা যে-কোনো দুই ডিভাইসে ডেটা ট্রান্সফার সম্ভব। কিছু মাল্টিপ্লেয়ার গেইম ব্লুটুথের মাধ্যমে খেলা যায়। বিভিন্ন গ্যাজেটের মধ্যে সহজে সংযোগ দেওয়া যায়, আবার একই সাথে দুইটা গ্যাজেট চালানো সম্ভব। স্মার্ট সিকিউরিটির ক্ষেত্রে ব্লুটুথের ব্যবহার রয়েছে। গাড়ির সাথে ব্লুটুথ কানেক্ট করে, মোবাইলে না দেখে, সেখানের ডিসপ্লেতে দেখা যায়। মজার বিষয় হলো, ইউএসবি ডাঙল ব্যবহার করে ব্লুটুথ ছাড়া ডিভাইসে ব্লুটুথ কানেকশন সম্ভব।

ব্লুটুথ জনপ্রিয় হওয়ার অন্যতম কারণ, এর এফিসিয়েন্সি এবং প্রায় সকল ডিভাইসে এটি ব্যবহার করা হয়। ওয়্যারলেস ইয়ারফোন, মিউজিক প্লেয়ার, সাউন্ড সিস্টেম, ক্যামেরা, স্মার্ট ওয়াচের মতো গ্যাজেট মূলত ব্লুটুথ দ্বারা চালিত হয়। এগুলোর মাধ্যমে সহজে ভিডিয়ো, অডিয়ো-সহ অন্যান্য ডেটা ট্রান্সফার অনেক সহজে করা যায়। ওয়্যারলেস প্রযুক্তিগুলো সম্ভাবনাময় এবং আমরা আগামীতে আরও ভালো প্রযুক্তির ছোঁয়া পাব, যা জীবনমানের উন্নতি ঘটাবে।

MyDoom নামক ভাইরাসটি ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিসাধন করে। সমীক্ষা অনুযায়ী এর পরিমাণ ছিল ৩৮.৫ বিলিয়ন ডলার।

ERROR!

মুস্তফা কামাল জাবেদ

মনে করুন, আপনি আপনার বন্ধুর বাড়িতে ভুরিভোজে যাবেন। একা যাবেন না, সাথে নিউলি ম্যারিড ওয়াইফকেও নিয়ে যাবেন। তো গিয়ে কলিংবেল বাজালেন, বেচারা বন্ধু দরজা একটুখানি ফাঁক করল। তারপর আপনার চাঁদ মুখখানা দেখতেই দড়াম করে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলো!
নতুন বউয়ের সামনে ইজ্জতের ফালুদা!
এটা কি ঠিক হলো?
– একদম না, পত্রপাঠ বিদায়ের কারণটা তো অন্তত বলা উচিত।

ভাগ্যিস RFC আর WWE Consortium আছে। নইলে কোনো সাইট ভিজিট করতে গিয়ে আমাদেরও এরকম বিনা নোটিশে পরোক্ষ 'গেট লস্ট' এর সামনে পড়তে হতো।
আমরা যখন ক্লায়েন্ট হিসেবে কোনো সার্ভারে দাওয়াত খেতে যাই তখন সার্ভার যে রেসপন্স করে সেটাই হলো HTTP Status Code (আর ওই RFC আর WWE Consortium এর কাজই হলো এইটার খেয়াল রাখা।)।

স্ট্যাটাস কোডের রেসপন্সের ওপর ভিত্তি করে তাকে ৫ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

আর কোডের আছে দুইটা অংশ। প্রথম ডিজিট দিয়ে কোন ধরনের রেসপন্স সেই ক্লাস বোঝায়, দ্বিতীয় আর তৃতীয়টা দিয়ে তেমন কিছুই বোঝায় না।
দেখা যাক সেই ৫টা ক্লাস কী কী –

(১) **1xx Informational** – ইনফরমেশনাল রেসপন্স দিয়ে বোঝায় সার্ভার রিকোয়েস্ট রিসিভ করেছে, পুরোদস্তুর বুঝতেও পেরেছে। কিন্তু কোনো কারণে এটার প্রগ্রেস পুরো শেষ হয়নি। এইটা কোনো সমস্যা না, জাস্ট একটা এক্সট্রা ইনফরমেশন যে, Everything so far is OK।

(২) **2xx Successful** – এইটা হলো জলপাই পাতার মতো সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ রেসপন্স। রিকোয়েস্ট রিসিভড, আন্ডারস্টুড এন্ড অ্যাক্সেপ্টেড!
নরমালি সাইট ভিজিটিং এর ক্ষেত্রে এটাই হয়। সো, চিল!

(৩) **3xx Redirection** – আপাতত সবকিছুই ঠিক আছে। তবে খালাবাড়ি যাওয়ার পর আপনাকে সহ প্যাক করে নানাবাড়ি যাওয়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা তৈরি হয়। একটা সাইট থেকে যে আরেকটা সাইটে রিডিরেক্ট করে, এটাই সেই কালপ্রিট।
১ থেকে ৩ পর্যন্ত রেসপন্সে কোনো সমস্যা হয় না। এগুলোর কাহিনি আমরা ঘুণাক্ষরে টেরও পাই না। সব যেন আমাদের বাম কানের পাশ দিয়ে সাই করে ওড়ে যায়। সমস্যা দেখা দেয় ৪ আর ৫ এর ক্ষেত্রে। সব তির একেবারে কপালে এসে ভেদে। কীভাবে?
চলুন, দেখা যাক।

(৪) **4xx Client Error** – ক্লায়েন্ট এররের ক্ষেত্রে যত প্রকার অপকর্ম সাধিত হইয়াছে, সবকিছুতে শুধু আপনারই অবদান থাকিবে। সার্ভার আঙ্কেলের এখানে কোনো দোষ নেই। এটা হতে পারে ভুল URL এর কারণে কিংবা অ্যাক্সেস নিয়ে জটিলতর জটিলতার কারণে।

(৫) **5xx Server Error** – এই ক্ষেত্রে সব দায়ভার সার্ভারের ওপরই ন্যস্ত। হয় সে জানে যে তার পেটে কোনো গণ্ডগোল হয়েছে নয়তো সে রিকোয়েস্ট সম্পূর্ণ করার ক্ষমতাই রাখে না। এটা পারমানেন্ট, টেম্পোরারি দুরকমই হতে পারে।
কয়েকটা কমন স্ট্যাটাস কোড দেখা যাক।

100-Continue
নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে চালিয়ে যেতে হবে।
সবকিছু ঠিক আছে। রিসিভড অ্যান্ড আন্ডারস্টুড। ক্যানসেল না করে জাস্ট প্লে অন, থুক্কু, গো অন।

200 OK
OK means Objection Killed! So, everything is okay, na?
Yep.

আমরা প্রতিদিন হাজার বার সাইট ভিজিটের সময় যে রেসপন্সের সম্মুখীন হই, এটাই সেটা। এভরিথিং ইজ পারফেক্ট!

300 Multiple Choice
বহুনির্বাচনী প্রশ্নের কথা মনে পড়ল?
না, এটা কিন্তু সেটা না। ৩ নাম্বার ক্লাসের কথা মনে আছে?
ওদের কাজ ছিল রিডিরেক্ট করা, এটা মাল্টিপল চয়েজের মাধ্যমে রিডিরেক্ট করে। উদাহরণ?
ভিডিয়ো ডাউনলোডে যে বিভিন্ন ফরম্যাট চ্যুজ করার অপশন দেয়, সেটা।

301 Moved Permanently
এই ক্ষেত্রে যে রিসোর্স চাওয়া হয়েছে সেটা পারমানেন্টলি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। রেসপন্স হিসেবে নতুন URL দেওয়া হয়।

400 Bad Request
খারাপ অনুরোধ!
এটা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। যদি বড়ো ফাইল আপলোড করা হয় যেটা সাইট প্রপারলি হ্যান্ডেল করতে পারছে না, তখন হয়। তাছাড়া ইনভ্যালিড কুকিজ ইউজ করলেও হয়।
কিছু ক্ষেত্রে ডোমেইনের পরের অংশে সমস্যা থাকলেও এইটা দেখায়।

401 Unauthorized
রিসোর্স রিকোয়েস্টের ক্ষেত্রে অথেন্টিকেট করতে যখন ফেইল হয় কিংবা সেটা করাই হয় না তখন দেখায়।
অথেন্টিকেট বলতে ইউজার নেম, পাসওয়ার্ড দিয়ে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করা।

403 Forbidden
নিষিদ্ধ মিনস নিষিদ্ধ!
401 এর সাথে এটার পার্থক্য হলো ওইটাতে অথেন্টিকেট করলে অ্যাক্সেস পাওয়া যায়, এইটায় সেটা হাতে পায়ে ধরলেও পাওয়া যায় না!
কী নিষ্ঠুর!

404 Not Found
এইটা ইন্টারনেটে সবচেয়ে কমন এরর। যখন URL এ ভুল থাকে তখন এটা দেখায়। সবাই-ই কখনো না কখনো এটা ফেইস করেছেন বলা যায়। প্রায়ই যে বলা হয় ব্রোকেন লিংক, ডেড লিংক – এই হলো সেটার মূল হোতা।
তবে 403 এর ফরবিডেন সাইট যদি নিজের অস্তিত্ব লুকিয়ে রাখতে চায়, তখন গিরগিটির মতো রং বদলে এটা শো করে।

418 I'm a teapot
যখন সার্ভার 'টিপট' থেকে চা দিতে চায় না, তখন এই এরর দেখায়!

500 Internal Server Error
যখন সার্ভারে অভ্যন্তরীণ কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তখন এই এরর শো করে। এই অবস্থায় থার্ড পার্টি প্লাগ-ইনের সাহায্য ছাড়া বেচারা রেসপন্স করতে পারে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: টিপটের ব্যাপারটা এপ্রিল ফুল ছিল!

মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

সালেহ আহমেদ কায়েস

মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তিকে কম্পিউটার দ্বারা অনুকরণ করার চেষ্টাই হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। আমরা যদি আরেকটু বিস্তারিতভাবে বলি তাহলে এটাকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যে, মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তিকে কৃত্রিম উপায়ে প্রযুক্তিনির্ভর করে যন্ত্রের মাধ্যমে বাস্তব রূপ দেয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এবার একটু ব্যাখ্যা করা যাক।

বুদ্ধি হচ্ছে জ্ঞান আহরণ করা এবং তা প্রয়োগ করার ক্ষমতা। সাধারণ মেশিনগুলো জ্ঞান আহরণ করতে পারে না। কিন্তু যেসব মেশিন বা প্রোগ্রাম এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন নিজে নিজে কিছু শিখে নিতে পারে, সেগুলোকে আমরা বলি বুদ্ধিমান মেশিন। যেমন: গুগল সার্চ প্রোগ্রামটা একটা বুদ্ধিমান প্রোগ্রাম। আমরা কিছু সার্চ করলে এটি আমাদের আগের সার্চ হিস্ট্রি, বয়স, লোকেশন ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে আমাদের সার্চ রেজাল্ট দেখায়।

আপনার প্রশ্নের উত্তরে আসার আগে আরও কিছু বিষয় ক্লিয়ার করে নেওয়া যাক।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্সের বিভাগ হলো ৩টি।

১. আর্টিফিশিয়াল ন্যারো ইন্টিলিজেন্স (ANI)
২. আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টিলিজেন্স (AGI)
৩. আর্টিফিশিয়াল সুপার ইন্টিলিজেন্স (ASI)

শেষেরটা নিয়ে কিছু বলব না, কারণ এটার ভবিষ্যৎ নিয়ে গবেষকরা এখনো চিন্তিত।

এখন আসি প্রথম কথায়, আর্টিফিশিয়াল ন্যারো ইন্টিলিজেন্সে মেশিন একটা বিষয়ে পারদর্শী হবে। অর্থাৎ, যে মেশিন লিখতে জানে, সে শুধু লিখতেই পারবে, অন্য কোনো কাজ করতে পারবে না। আবার যে মেশিন লুডু খেলতে জানে, সে শুধু লুডুই খেলতে পারবে, তাকে যদি লুডুর চেয়েও সহজ অন্য কোনো কাজ দেওয়া হয়, তাহলেও সে সেটা করতে পারবে না। কারণ ANI এ মেশিন শুধু একটা কাজেই পারদর্শী হবে।

এখন আসা যাক, আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টিলিজেন্স ধাপটিতে। আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টিলিজেন্সে Human-Level AI-ও বলা হয়ে থাকে, কারণ এ ধাপে মেশিন মানুষের মতো চিন্তা করতে পারবে, মানুষের মতো সমস্যা সমাধান করতে পারবে,

এছাড়াও কোনো নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে।

এখন প্রশ্নকর্তার প্রথম প্রশ্নটি ছিল–তিনি যদি কোনোভাবে তার মাইন্ড রিড করে তার মস্তিষ্কের সকল ডেটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন কোনো রোবটে ট্রান্সফার করেন, তাহলে সেই রোবটটি কি তার মতো ব্যক্তিত্ববোধসম্পন্ন হবে?

উত্তর হবে, যদি আপনি আপনার মস্তিষ্কের ডেটাগুলো সঠিকভাবে প্রেরণ করতে পারেন তাহলে রোবটটি অবশ্যই আপনার মতো ব্যক্তিত্ববোধসম্পন্ন হবে, কারণ আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টিলিজেন্স (AGI) ধাপে রোবট বা মেশিন মানুষের মতোই চিন্তা করার ক্ষমতা রাখবে, এছাড়াও নতুন কোনো পরিবেশে সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করবে। ধরুন, আপনি বাসায় যেভাবে কথা বলেন, চলাফেরা করেন, একটা বিদ্যালয়ে গিয়ে আপনি কিন্তু সেভাবে চলাফেরা করতে পারবেন না, কারণ এটা আপনার ব্যক্তিত্ববোধের মধ্যে পড়ে। ঠিক একইভাবে আপনি যদি AGI এর একটা রোবটকে বিদ্যালয়ে পাঠান,তাহলে সে কিন্তু সেখানে গিয়ে আগের মতো কাজ করবে না, সে তখন পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিবে কারণ এটা AGI এর বৈশিষ্ট্য।

তবে আমাদের এখনকার যত বুদ্ধিমান মেশিন আছে, তার সবগুলোই কিন্তু ANI, অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ন্যারো ইন্টিলিজেন্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাজ করে...তাহলে এখন আপনাদের মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে যে, ANI দিয়ে তো শুধু একরকম কাজ করা যায়, কিন্তু এখনকার বুদ্ধিমান মেশিনগুলো তো অনেক কাজে পারদর্শী। তাহলে সেটা কীভাবে সম্ভব?? —উত্তরটা খুবই সহজ। অর্থাৎ, এখানে একের অধিক ANI ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, আপনার হাতের স্মার্টফোন কিন্তু অনেকগুলো ANI এর সমন্বয়ে গঠিত। এখন, সেখানে ছবি তোলার জন্য একরকম ANI ব্যবহার করা হয়, আবার মোশান ক্যাপচারে আরেকটা ANI ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ, প্রতিটা কাজের জন্য আলাদা আলাদা ANI ব্যবহৃত হয়। আপনার ফোনের ছবি তোলার জন্য যে ANI ব্যবহার করা হয়েছে, সেটা দিয়ে ছবি তোলা ছাড়া কিন্তু অন্য কাজ করা যাবে না। অর্থাৎ, অনেকগুলো ANI এর সমন্বয়ে একটা বুদ্ধিমান যন্ত্র গড়ে ওঠে।
আপনি যদি Google Assistant এর সাথে চ্যাট করেন তাহলেই বুঝতে পারবেন যে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স (AI) কতটা উন্নত। এছাড়াও গুগলের যে সেলফ ড্রাইভিং কার রয়েছে, সেটাও ANI ব্যবহার করে চলে।

এবার আসি প্রশ্নকর্তার দ্বিতীয় প্রশ্নে.. প্রশ্নকর্তার দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো–তিনি যদি তার তৈরি সেই রোবটকে দিয়ে ফেইসবুকিং করান, তাহলে সে কি তার মতো ফেইসবুকিং করতে পারবে... বা তার মতো চিন্তা করতে পারবে কি?

আপনার এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা একটু ওপরের দিকে স্ক্রল করি। আমি এই আর্টিকেলের শুরুতেই বলেছি যে, আমরা যখন গুগল সার্চ করি তখন গুগল আমাদের সার্চ হিস্ট্রি, লোকেশন, বয়স, লিঙ্গ ইত্যাদির অ্যালগরিদম হিসেব করে আমাদেরকে সার্চ রেজাল্ট দেখায়। আর গুগল সার্চের প্রক্রিয়াটা কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স দিয়ে করা হয়। আরেকটা বিষয় হলো Google Assistant, এটিও আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স ব্যবহার করে কাজ করে। এখন আপনি যদি আপনার রোবটকে দিয়ে আপনার ফেইসবুকিং এর কাজটা করান, তাহলে সে শুরুতেই গুগল সার্চ প্রক্রিয়ার মতো আপনার প্রিভিয়াস অ্যাক্টিভিটিগুলো অ্যানালাইসিস করবে, এরপর সে অনুযায়ী সে কাজ করবে (এখানে আপনি প্রশ্নে বলে দিয়েছেন যে, আপনি আপনার মস্তিষ্কের ডেটাগুলো রোবটে স্থানান্তর করার মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করবেন, তাই আপনার রোবটের এই কাজগুলো না করলেও চলবে, কারণ আপনার মস্তিষ্কের ডেটাগুলো তো রোবটের মধ্যে আছেই)। এখানে আরেকটা বিষয় না বললেই নয়.. AGI-এ মেশিন মানুষের মতো চিন্তা করতে পারবে, সে নতুন কোনো সমস্যার সমাধানও করতে পারবে। তাই আপনি যদি আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টিলিজেন্সকে সঠিকভাবে ডেভেলপ করতে পারেন, তাহলে আপনার রোবটও আপনার মতো ফেইসবুকিং করতে পারবে এবং আপনার মতো চিন্তা করতে পারবে।

মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট

শাহরিয়ার নাসিম নাফি

মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করব। বর্তমানে মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্টে কাজ করতে চাইলে প্রথমেই আমাদের মনে যে প্রশ্ন আসে সেটা হলো–কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখব, কোন ফিল্ডে কাজ করব, অ্যান্ড্রয়েড না আইওএস – কীভাবে শুরু করব?

তো, যখন কেউ এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করে তখন সামনে আসে ন্যাটিভও ক্রস প্ল্যাটফর্ম, দুইটা শব্দ। পরে আবার গোলকধাঁধায় হারিয়ে যায় মানুষ।

মূলত ন্যাটিভ হলো ওই নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মের নির্ধারিত ফ্রেইমওয়ার্ক দিয়ে কাজ করা। যেমন: অ্যান্ড্রয়েডের ক্ষেত্রে হলো জাভা, কটলিন

ইত্যাদি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে অ্যাপ ডেভেলপ করা। অ্যান্ড্রয়েডের শুরু থেকেই জাভা দিয়ে অ্যাপ ডেভেলপ করা হয়ে থাকে। IDE হিসেবে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিয়ো ব্যবহার করা হয় যা মূলত জেটব্রেইনের ডেভেলপ করা এবং গুগল সেটাকে কিছুটা কাস্টমাইজ করে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিয়ো নামে ছেড়ে দিয়েছে। এটার আসল নাম Intellij IDEA। কয়েক বছর আগে গুগল কটলিনকে অ্যান্ড্রয়েডের দ্বিতীয় ন্যাটিভ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে অ্যাড করে। এটাও জেটব্রেইনের ডেভেলপ করা যা JVM-এ রান করে। বর্তমানে কটলিন জনপ্রিয় হচ্ছে।

তবে, কেউ বিগিনার হিসেবে জাভা দিয়ে শুরু করাই ভালো। কেন?

কারণ, অ্যান্ড্রয়েডের ওপর অনলাইন রিসোর্সের ৭০% বেশি (আরও বেশি হতে পারে) জাভা দিয়ে, যেহেতু এক দশকের বেশি সময় এটা দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। অন্যদিকে বিগিনার লেভেলে কটলিনের অনলাইন রিসোর্স খুবই কম। ফলে বিগিনার লেভেলে কোনো সমস্যায় পড়লে অনলাইনে সেটা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাও কম। অ্যাডভান্স লেভেলে কটলিনের রিসোর্স অনেক। জাভারও আছে। ফলে কেউ শুরুতে জাভা দিয়ে কাজ করার কয়েক মাস পর যখন কিছুটা দক্ষতা আসবে তখন কটলিনে সুইচ করতে পারে এবং এটা কিছু ক্ষেত্রে করা উচিত। বর্তমানে কটলিন অধিক জনপ্রিয় হচ্ছে। জাভা থেকে তুলনামূলকভাবে কম কোড লিখতে হয়, ভয়েড বা নাল সেফটি আছে। উইন্ডোজ, ম্যাক, লিনাক্স যে-কোনো প্ল্যাটফর্মেই অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপ করা যায়। তবে র‍্যাম এক্ষেত্রে ৮ জিবি কমপক্ষে থাকা ভালো। উইন্ডোজের ক্ষেত্রে ৮ জিবির চেয়ে বেশি থাকা ভালো। ম্যাক বা লিনাক্সে ৮ জিবি দিয়ে ভালো চলে। আমি আজ পর্যন্ত কোনো ল্যাগ পাইনি।

এখন আসা যাক আইওএস ন্যাটিভ অ্যাপ ডেভেলপমেন্টে

আইওএস ডেভেলপমেন্টের শুরুতে অবজেকটিভ সি ব্যবহৃত হতো। তবে ২০১৪ সাল থেকে এর সাথে সাথে সুইফট ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহৃত হচ্ছে। এটা অ্যাপলের ডেভেলপ করা অ্যাপল ডিভাইসের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের জন্য। বর্তমানে কেউ আইওএস ন্যাটিভ অ্যাপ ডেভেলপ করতে চাইলে সুইফট শেখার বিকল্প নেই। লেগেসি কিছু প্রোজেক্টের ক্ষেত্রে এখনো অনেক কোম্পানি অবজেকটিভ সি ব্যবহার করছে। তবে আস্তে আস্তে এর পরিমাণ কমে আসছে। সবাই সুইফট-এ শিফট করছে। এখানে আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখা দরকার। আইওএস ডেভেলপ করতে চাইলে ম্যাকবুক, আইম্যাক অর্থাৎ, অ্যাপল ওএসএক্স চালিত কম্পিউটার থাকা আবশ্যক। কারণ আইওএস অ্যাপ ডেভেলপ করার জন্য এক্সকোড IDE, যা অ্যাপল ডেভেলপ করেছে এবং কেবল ওএসএক্সের জন্যই। অন্য প্ল্যাটফর্মের জন্য এক্স কোড নেই। অন্যদিকে, বর্তমানে আইওএস অ্যাপের কোডবেস দিয়ে কিছু টুইক করে ম্যাক অ্যাপ বিল্ড দেওয়া যাচ্ছে। ফলে প্রায় একই কোডবেস দিয়ে দুইটা ভিন্ন প্ল্যাটফর্মে অ্যাপ হয়ে যাচ্ছে। পারফর্মেন্স একই রকম। সামনের বছর কাস্টম সিলিকন ম্যাক রিলিজ হলে সব আইওএস কোনোপ্রকার মোডিফিকেশন ছাড়াই ম্যাকে রান হবে। আইওএস ডেভেলপারদের জন্য এটা একটা বড়ো সুখবর।

এবার আসা যাক ক্রস প্ল্যাটফর্ম অ্যাপ ডেভেলপমেন্টে। মূলত কেউ যদি একইই সাথে অ্যান্ড্রয়েড, আইওএস দুইটার জন্য সিঙ্গেল কোড দিয়ে অ্যাপ বানাতে চায় তাহলে যেন ক্রস প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে। তবে ন্যাটিভ অ্যাপের মতো স্মুথ বা রেস্পন্সিভ অ্যাপ ক্রস প্ল্যাটফর্ম দিয়ে সম্ভব না। পারফর্মেন্স ভালো করা সম্ভব বাট নেটিভ অ্যাপের মতো হবে না কখনো। কিছু জনপ্রিয় ক্রস প্ল্যাটফর্ম হলো React Native, Xamarin এবং বর্তমানে জনপ্রিয় হচ্ছে এমন হলো Flutter।

React Native ফেইসবুকের ডেভেলপ করা। জি, ফেইসবুক অ্যাপ React Native দিয়েই তৈরি। আমার দেখা অ্যান্ড্রয়েডের সবচেয়ে ভারী অ্যাপ হলো ফেইসবুক অ্যাপ। প্রচুর মেমোরি খায়। ফোনকে স্লো করে ফেলে। Xamarin হলো মাইক্রোসফটের ডেভেলপ করা। এই দুইটা নিয়ে আমি বিস্তারিত বলতে যাচ্ছি না। আমার নিজেরেও এইগুলো সম্বন্ধে সম্যক আইডিয়া নেই।

এখন আসি Flutter-এ। ধারণা করা হয়, ভবিষ্যতে ক্রস প্ল্যাটফর্মে রাজত্ব করবে Flutter। এটা প্রথমত গুগলের ডেভেলপ করা। ফলে ফার্স্ট ইন ক্লাস সাপোর্ট পাওয়া যাবে। মাঝখানে Flutter নিয়ে কয়েক মাস কাজ করেছিলাম। মাসকয়েক কাজ করার পর যা মনে হলো তা হলো–Flutter-এর আরও অনেক দূর যেতে হবে। Flutter এসেছে মাত্র ২–৩ বছর হলো। গুগল বর্তমানে Flutter-কে ডেভেলপার বেইজে করার চেষ্টা করছে। মানে Flutter-এ কাজ করার জন্য ডেভেলপারের নিজেকেই বিভিন্ন দরকারি প্যাকেজ ডেভেলপ করতে হচ্ছে। ফলে কিছুক্ষেত্রে এটা একক ডেভেলপার বা একটা ছোটো টিমের জন্য খানিকটা অসুবিধাই। সেজন্য Flutter-কে আরও কয়েক বছর সময় দেওয়া

দরকার। বৃহৎ ফার্মের জন্য এটা তেমন সমস্যা না। তবুও ডেভেলপমেন্টে Flutter-এর বহুমুখী সুবিধার জন্য বর্তমানে Flutter দ্রুতই পপুলার হচ্ছে, কারণ সিঙ্গেল কোডবেস দিয়ে মোবাইল অ্যাপ, ডেস্কটপ অ্যাপ থেকে ওয়েবসাইটও বানানো যাচ্ছে। যদিও বর্তমানে Flutter ওয়েব বা ডেস্কটপ বেটা পর্যায়ে আছে, প্রোডাকশনে আসতে আরও কিছুদিন লাগবে। এছাড়া অ্যাপ ইউআই এরক্ষেত্রে Flutter-এর জুড়ি মেলা ভার। অনেক সুন্দর আকর্ষণীয় ইউজার ইন্টারফেস খুব সহজেই তৈরি করা যাচ্ছে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, ক্রস প্ল্যাটফর্মের চেয়ে যে-কোনো ন্যাটিভ অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট তুলনামূলকভাবে ভালো। কারণ কেউ যদি লো লেভেলে কাজ করতে চায় কোনো অ্যাপে বা খুবই কমপ্লেক্স কোনো অ্যাপ বানাতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই ন্যাটিভে কাজ করতে হবে। সেকেন্ড, মিলিসেকেন্ড লেভেলে পারফর্মেন্স মেইনটেইন করতে চাইলে ন্যাটিভের বিকল্প নেই। এছাড়া যখন কোনো প্ল্যাটফর্মে নতুন নতুন ফিচার রিলিজ হয়, তখন ন্যাটিভে সেটা নিয়ে শুরু থেকেই কাজ করা যায় বাট ক্রস প্ল্যাটফর্মে ডেভেলপারদেরকে সেই বিষয়ে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়, সেটা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য।

তবে ডে টু ডে অ্যাপে ক্রস প্ল্যাটফর্ম ভালো পারফর্মেন্স গেইন করছে। স্টার্ট আপ কোম্পানির জন্য এটা খুবই ভালো একটা দিক। সিঙ্গেল কোডবেস দিয়ে অ্যান্ড্রয়েড বা আইওএস দুই প্ল্যাটফর্মই কভার করা যাচ্ছে। সময়, রিসোর্স কম লাগছে। Flutter এক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে আছে।

কিন্তু একজন ক্রস প্ল্যাটফর্ম ডেভেলপারের জন্য ন্যাটিভ ডেভেলপমেন্ট সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার। যেমন: Flutter-এ ভিন্ন ভিন্ন ফিচারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেজ ব্যবহৃত হচ্ছে। এখন ধরা যাক, কেউ যদি এমন একটা ফিচার নিয়ে কাজ শুরু করল যার জন্য কোনো প্যাকেজ ডেভেলপ করা হয়নি – সেক্ষেত্রে তাকে জাভা/কটলিন/সুইফট-এ কোড করে প্যাকেজ ডেভেলপ করতে হবে। প্ল্যাটফর্ম চ্যানেলে ব্যবহার করতে হবে। তখন যদি ন্যাটিভ ডেভেলপমেন্ট সম্বন্ধে ধারণা না থাকে তাহলে অন্য কোনো ডেভেলপার এই ধরনের প্যাকেজ পাবলিশ করার আগ পর্যন্ত বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

সবশেষে, কেউ যে ওয়েতেই কাজ করুক না কেন তার সে বিষয়ে স্কিলের পরিমাণ ভালো থাকা লাগবে। নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ নেওয়ার মানসিকতা থাকা লাগবে। সবসময় নতুন টেক সম্বন্ধে ধারণা রাখা লাগবে। নিজেকে ফ্লোর বাইরে নেওয়া চলবে না।

বোনাস: এতক্ষণ যদি আপনি এই বোরিং লেখাটা পড়ে থাকেন, তাহলে আপনাকে অভিনন্দন এবং সেই সাথে এই বোনাস পার্ট। এখন আমি একটা সিম্পল অ্যাপ ন্যাটিভ অ্যান্ড্রয়েড, ন্যাটিভ আইওএস ও ফ্লাটারে ডেভেলপ করলে কোড কেমন হতে পারে, সেই বিষয়ে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব।

একটা সিম্পল নোট অ্যাপ। দুই স্ক্রিনের। প্রথম স্ক্রিনে সকল নোটের লিস্ট এবং অ্যাড বাটনে ক্লিক করলে নতুন নোট করার স্ক্রিন ও লিস্টের কোনো নোটে ক্লিক করলে তা এডিট করার স্ক্রিন। খুবই সিম্পল অ্যাপ। আমি গিটহাবের লিংক দিয়ে দিলাম, যাঁরা আগ্রহী তাঁরা দেখতে পারেন।

ন্যাটিভ অ্যান্ড্রয়েড: https://rl.snnafi.com/note-app-android
ন্যাটিভ আইওএস: https://rl.snnafi.com/note-app-ios
ফ্লাটারে: https://rl.snnafi.com/note-app-flutter

শরতে লেখা চিঠি

মনিফ শাহ চৌধুরী

স্নেহাশিস,
শরতের সময়টা বড্ড অনিশ্চিত। মানুষের ছাতি লইয়া বাজারে বেরাইবার পূর্বে ঠায় দাঁড়াইয়া ভাবিতে হয় এই ছাতিখানি তাহাকে রৌদ্রের প্রতাপ হইতে রক্ষা করিবে না কি জলের অঝোর আলিঙ্গনে বাধা প্রদান করিবে। বাড়ির মালকিনরা প্রত্যুষের সোনালি আভা দেখিয়াও চিন্তিত থাকেন অদ্য বিছানার চাদর, জানালার পর্দা ধুইয়া শুকাইতে দিলে আচমকা লাজুক অম্বর তাহার মুখের ওপর ঘোমটা টানিয়া দিবেন না তো? এমনই এক অনিশ্চিত সময়ে যখন গদিতে বসিয়া ভাবিতেছিলাম এই বেলা মাথার উপর ক্যাচর ক্যাচর করিয়া ঘুরিতে থাকা শীর্ণ, হীনবল কঙ্কালের চিকিৎসা করাইব না কি আর দুইটি দিন গরমের জ্বালা সহাইয়া শীতবাবুকে বরণ করিবার সংকল্প করিব, ঠিক তখনই তোমার প্রেরিত একেবারেই অপ্রত্যাশিত ডাক (কুরিয়ার) চলিয়া আসিল।

বাক্স খুলিয়া আমি যথাযথই আপ্লুত হইয়াছিলাম। আমি জানি না আমাদিগের মস্তিষ্কের কোন নিউরনের সমষ্টি একত্রে যোগাযোগ করিয়া তোমাকে জানাইল আমার এই মুহূর্তে একখানা ফ্যানের বড়ো প্রয়োজনবোধ হইতেছিল। তুমি যে আমার কথা ভাবিয়া এই টেবিল ফ্যানখানা পাঠাইয়াছ তাহাতে আমি বেশ আনন্দিত হইয়াছি।

টেবিল ফ্যান লইয়া আমার অনেক কৌতূহল আছিল বাল্যকালে। হাফপ্যান্ট-পরা বয়সে আমি প্রথম দেখিয়াছিলাম এমন ফ্যান। ছোটো, সহজে বহনযোগ্য। ইংরেজ অফিসাররা শিকারে গেলেও তাহাদিগের সহিত এই জিনিস লইত। বুনো হাতি আর নরখাদক ব্যাঘ্রের ধাওয়া খাইয়া যখন তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, কোথা হইতে এক ভৃত্য আসিয়া মাথার নিকটে আনিয়া রাখিয়া দিত ফ্যান। বন বন করিয়া ঘুরিত, তাহাদের পিতলরঙা চুল উড়াইয়া লইয়া যাইত।

অবশ্য, তখন সেইগুলি বিদ্যুৎ দ্বারা চলিত না; বরং তাপশক্তি ব্যবহার করিত। নিম্নে ফাঁকা জায়গায় কোনো মোমবাতি কিংবা কুপি জ্বালাইয়া দিলেই হইত। ভিতরে একখানি ছোটো সিলিন্ডার থাকিত, যাহার ভিতরে এক জোড়া পিস্টন থাকিত। সিলিন্ডারের ভিতরে বাতাসও বন্দি করিয়া রাখা হইত। অর্থাৎ, নিম্ন হইতে তাপের কারণে বাতাস গরম হইয়া ছুটাছুটি বাড়াইয়া দিলে পিস্টন উপরে উঠিয়া যাইত এবং প্রায় সহিত সহিতই ঠাণ্ডা হইয়া বাতাসের ছুটাছুটি কমিয়া গেলে পিস্টন আবার নিম্নে নামিয়া আসিত। পুরা ব্যাপারখানা এক সেকেন্ডে বহু বার পুনরাবৃত্ত হইত। ইহার ফলে ধীরে ধীরে ফ্যানের পাখাগুলির গতি বৃদ্ধি পাইয়া বন বন করিয়া ঘুরিত। ইহার ভিতরের কলকব্জায় কোনো তাড়িত যন্ত্র আছিল না। এমন ইঞ্জিনকে Stirling Engine বলা হইয়া থাকে। যদ্যপি ইহার বাতাস

খাইবার ভাগ্য কোনোদিন হয় নাই, তথাপি আমার ঘোর সন্দেহ, হাওয়া বড়োই গরম হইবার কথা। ইংরেজরা শুধু ভাব দেখাইতেই রৌদ্রপ্রতাপের নিম্নে চুরুট টানিতে টানিতে ইহার হাওয়া খাইতেন।

তাই বলিয়া ভাবিয়ো না তুমি আমাকে যে ফ্যানখানা পাঠাইয়াছ তাহার ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। সরল স্বীকারোক্তি হিসাবে বলা যায়, টেবিল ফ্যানের যান্ত্রিক প্রকৌশল আমাকে মুগ্ধ করে। তুমি হয়তো ভাবিতেছ নানাজান এক সামান্য ফ্যানকে রীতিমতো মাথায় তুলিয়া নাচিতেছেন, কিন্তু নিজেকে জিজ্ঞেস করো তো, ফ্যানখানা কি আসলেই সামান্য? কদাচ ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ইহার চারখানা সুইচের মধ্যে শুধু 'শূন্য' সুইচটাতে চাপ প্রদান করিলেই কেন সেটা আটকাইয়া থাকে না? বাকিগুলো কেন আটকাইয়া থাকে? অথবা, প্রতিটা সুইচ চাপিলে আলাদা গতিতে ইহার পাখাগুলো কেন ঘুরে? অথবা ভাবিয়াছ কি, ইহার ভিতরের মোটর কীভাবে কাজ করে? অথবা কেন ঘাড়ের উপরের সুইচখানা চাপিলে ইহার মাথা লাইটহাউজের আলোর মতো দুই পার্শ্বে ঘুরিতে থাকে?

ফ্যানের সবচাইতে সরল অংশ মনে হয় ইহার সুইচ বোর্ড। সাধারণত চারটা সুইচ থাকে। একদম শুরুরটায় চাপিলে বন্ধ হইয়া যায়। আমরা যদি একটু নিম্নে তাকাই, (অবশ্যই ফ্যানের উপরের কভার খুলিয়া) আমরা দেখিব ইহার সুইচগুলো একটা খাঁজকাটা মেটালের উপর রাখা। খাঁজগুলো মূলত হুকের ন্যায় কাজ করে। সুইচে চাপ দিলে খাঁজের ঢালু অংশে ঠেলা লাগিবার কারণে তাহা ধীরে ধীরে এক পার্শ্বে সরিয়া যায়, আর সুইচের সহিত সংযুক্ত বাঁকা অংশ খাঁজের নিম্নে ফাঁকা জায়গায় আটকাইয়া যায়। এখন তুমি ওই সুইচে যতই চাপ প্রদান কর তাহা আর নিম্নেও নামিবে না, ঊর্ধ্বেও উঠিবে না।
কিন্তু, তুমি যদি অন্য কোনো সুইচে এইবার চাপ প্রদান কর তাহা এইবার ঠেলা দেবে আরেকটা খাঁজকাটা অংশে। ফলে পুরা মেটালের অংশটি আবার এক পার্শ্বে সরিয়া যাইতে থাকবে, পূর্বের সুইচ মুক্তি পাইবে, এই দ্বিতীয় সুইচ বেচারা আটকাইয়া যাইবে।

-

ব্যতিক্রম হইতেছে জিরো সুইচখানা। ইহার নিম্নাংশের মেটাল বডিতে খাঁজ থাকিলেও হুকের মতো কিছু নাই। তাই ইহাতে চাপ দিলে খাঁজ অংশ ঠেলা খাইয়া সরিয়া গিয়া অপর সুইচকে উঠাইয়া দিলেও জিরোকে আটকাইতে পারে না। তোমার বুঝিতে অসুবিধা হইলে একখানা ছবি সংযুক্ত করিয়া দিব।

ফ্যানের মূল অংশ হইতেছে ইহার single phase induction motor। তবে মজার কথা হইল, একটা মোটর নিজেই একখানা ভিন্ন যন্ত্র। মোটর কী করিয়া কাজ করে তাহা তুমি কতদূর জান তাহা আমি সঠিক জানি না, তবে অন্তত এটুকু তো জানিয়াই থাকিবে, একখানা প্যাঁচানো তারের মাঝে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইলে সেথায় চৌম্বকীয় ক্ষেত্র তৈয়ার হয়, এক পার্শ্বে উত্তর অপর পার্শ্বে দক্ষিণ মেরু সৃষ্টি হয়। এখন ভাবো তো ইহার দুই পার্শ্বে যদি দুইটি চুম্বক রাখা হয় যাহার উত্তর মেরু প্যাঁচানো তারের দিকে মুখ করা, তাহা হইলে তারের এক মেরু ঠেলা খাইত, আরেক মেরু অন্য দিকে আকর্ষিত হইত না?

-

এই প্যাঁচানো তার একবার ঠেলা খাইয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করার ভিতরেই যদি আমি খুবই দ্রুত তাহার মেরু বদলাইয়া দিই, তাহলে কী ঘটিবে? সঠিক ভাবিয়াছ। আমার তারটি আবার ধাক্কা খাইয়া ঘুরিয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিবে। এইভাবে যদি আমি খুবই দ্রুত মেরুর দিক পরিবর্তন করাইতে পারি আমার প্যাঁচানো তার ঘুরিতেই থাকিবে।

-

প্রশ্ন করিতে পার, এই মেরু পরিবর্তন কীভাবে করা হইবে? তাহার আগে কিঞ্চিৎ শব্দ পরিবর্তন করিয়া লই। এই যে প্যাঁচানো তারের কথা বলিতেছি তখন হইতে, ইহাকে ডাকি armature। ইহা মূলত একখানা মেটাল লুপ। কারেন্টের দিক পরিবর্তন করাও এমন কঠিন কিছু নহে। একখানা গোল খোলা সিলিন্ডারের মতো পাত কল্পনা করো যা armature এর দুই তারের অংশে সংযুক্ত। এর মাঝখানে আবার দুটো ফালি করে কাঁটা রইয়াছে। তুমি যদি মোটর খুলিয়া দেখ, তোমার এইগুলি দেখে ইংরেজি সি অক্ষরের মতো লাগিবে। এইগুলিকে commutator বলে। ইহার বাইরের অংশের দুই পার্শ্বে দুইটা ব্রাশ থাকিবে। ব্রাশগুলি সংযুক্ত থাকিবে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সহিত। ব্রাশগুলির মুখ সর্বদাই commutator এর সহিত সংযুক্ত থাকিবে।

পুরা ব্যাপারটা কল্পনা করিয়া লও। দুই ধারের চুম্বক প্রায় গোলাকৃতির, মাঝে তারের লুপ যাহার দুই প্রান্ত প্রায় গোলাকার সি অক্ষরের পাতের সহিত লাগানো, যাহা আবার দুইটি ছোটো ব্রাশের সহিত লাগানো, যাহা সরাসরি সাপ্লাইয়ে লাগানো থাকে। তোমার বুঝিবার সুবিধার্থে এই চিঠিতে কিঞ্চিৎ ছবি সংযুক্ত করিয়া দিব।

> চিঠিখানা লিখিতে লিখিতে খেয়াল হইল, এইবার আমাদের উঠানে তরমুজের ফলন অত্যধিক ভালো হইয়াছে। ওপরের খোলসটা কচুপাতা সবুজ, ডোরাকাটা, ভিতরটা টকটকে লাল। কদাচিৎ তালু তাতানো গরম পড়িলে বরফকুচি দিয়া তরমুজের শরবত খাইতে যে কী ভালো লাগে! তুমি বেড়াইতে আসিলে অবশ্যই খেয়ে দেখিবে। লাল সবুজের মিশেলে এমন ফল আর আছে কী?

যখন বিদ্যুৎ প্রভাবিত হয়, আমাদের armature নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরিয়া যান, সেই মুহূর্তে ইলেক্ট্রিক আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্যারালাল হয়ে যাইবার কারণে কোনো বল প্রয়োগ হয় না। তবে armature তখনও নিজের মোমেন্টামের জন্য আরও ৯০ ডিগ্রি ঘুরিয়া যায়। ফাঁকা জায়গায় আসিয়া দুই তারের প্রান্ত আবার ব্রাশের সহিত সংযোগ স্থাপন করে। ফলাফল, কারেন্টের প্রবাহ আবার পূর্বের দিকে হইয়া যায়। অর্থাৎ, সে আবার ঘুরিতে শুরু করে। এইভাবেই মোটর চলিতে থাকে।

ইহার শক্তি বাড়ানো যায় শক্তিশালী চুম্বক, অনেক তার, তারের মাঝে বেশি প্যাঁচ ব্যবহার করিয়া, ভোল্টেজ বাড়াইয়া ইত্যাদি।

মোটামুটি ফ্যানের ব্যাপারে প্রায় পুরাটা জানিয়া গেলে। তবে এখন বাকি রয় কী করিয়া ফ্যানের মাথা এক পার্শ্ব থেকে অন্য পার্শ্বে ঘোরে সেটা নিয়া আলোচনা করা।

4 Bar Mechanism সম্পর্কে তুমি কতটুকু জান? আমি যেই ছবিখানা সংযুক্ত করিয়া দিব সেইখানে চারটি বার বা দণ্ড দেখিতে পাইবে। প্রতিটি একে অপরের সহিত সংযুক্ত। ইহার কিঞ্চিৎ সংযোগস্থল বা জয়েন্ট হইতেছে ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরিতে সক্ষম এবং চারটার মধ্যে তিনটে বার নড়াচড়া করিতে সক্ষম। যেই বারটি নড়িতে পারে না সেইটিকে বলে fixed bar। এইটার পাশে যেই বারটি সংযুক্ত থাকে সেইটাকে যদি মোটরের সহিত সংযোগ করিয়া দেওয়া যায় তবে সেটি ঘুরিতে আরম্ভ করিবে। যেই ছবিখানা দিয়াছি সেটার নীল অংশটি ধরা যাক fixed, আর যদি ধরি হলুদ অংশটি মোটরের সহিত সংযোগ করিয়া দেওয়া, তাহলে সেটি ঘুরিবে এবং দোল খাইতে শুরু করিবে ডান হইতে বামে, বাম হইতে ডানে।

মোটরের সহিত সরাসরি সংযোগ করা হইলে ইহা যে জোরে দোল খাইতে থাকিবে তাহাতে পুরা ফ্যান ভাঙিয়া মানুষকে আহত করিয়া ফেলিতে পারে। তাই অনেকগুলি ক্লকওয়ার্ক গিয়ার ইহার সহিত সংযুক্ত করিয়া ইহার পর মোটরের সহিত লাগানো গোল ঘূর্ণায়মান দণ্ডের সহিত লাগানো হয়। ইহাকে worm বলা হয়। আর ইহার সহিত যেই গিয়ার সরাসরি যুক্ত থাকে তাহাকে worm gear বলা হয়। এই ওয়ার্ম গিয়ারের সহিত একখানা পিন সংযুক্ত থাকে যাহা ওয়ার্ম গিয়ারকে নিম্নে আরেকটি গিয়ারের সহিত সংযুক্ত করে। এই পিন ওপরে টানিলে নিম্নের গিয়ারের সহিত ওয়ার্ম গিয়ারের কোনোই সংযোগ থাকে না, ফলে ফ্যানের মাথা একমুখী হইয়া থাকে। যেই পিনটা নিচে নামাইয়া দিই, সংযোগ স্থাপিত হয়, গিয়ার ঘুরে, বারগুলি ঘুরে; অতঃপর ফ্যানের মাথাও ঘুরিতে থাকে।

একখানা টেবিল ফ্যানের প্রকৌশল আমি খুবই পছন্দ করি। আশা করি আমি বোঝাইতে পারিয়াছি কেন ফ্যানকে সামান্য মনে করা উচিত নহে। আজকাল শুনিতেছি অনেক অত্যাধুনিক ফ্যান তৈয়ার হইতেছে। পাখা ছাড়াও না কি ফ্যান পাওয়া যাইতেছে? সেটা কীভাবে কাজ করে তাহা আমাকে জানাইয়া পত্র লিখিয়ো। তোমার পরিবারকে আমার স্নেহ ও সালাম দিয়ো। আর শীঘ্রই আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়ো। শরৎকালের কথা বলিতেছিলাম। এই শরৎ-এর মতোই অনিশ্চিত আমার জীবন, বৃদ্ধ শরীরটার ইঞ্জিন যে-কোনো দিনেই বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

ভালো থাকিও।
ইতি,
তোমার পত্রবন্ধু নানাজান

পুনশ্চ এবং তথ্যসূত্র:

মোটরের কাজ ভালোভাবে দেখিতে পার এইখানে, আর 4 Bar Mechanism দেখিতে পার এইখানে।

জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম অ্যান্ড্রয়েডের “Android” শব্দটা দ্বারা মূলত একধরণের 'পুরুষ' রোবটের রূপ বোঝায়। এর স্ত্রী বাচক শব্দ হলো "Gynoid"।
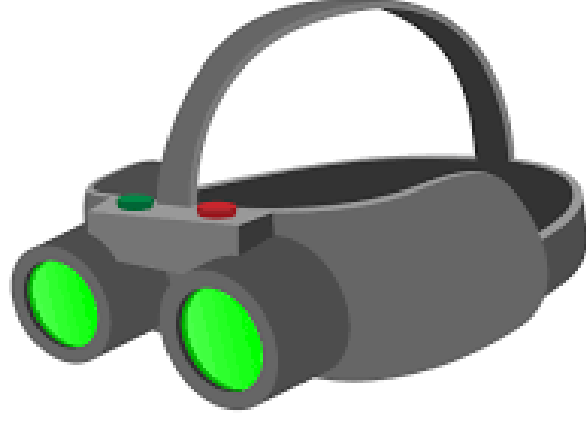
নাইট ভিশন চশমা

সৌমিক মন্ডল

হলিউডের মুভি আমরা কম-বেশি সবাই পছন্দ করি। আর মুভি যদি অ্যাকশন বা যুদ্ধের হয় তাহলে তো কথাই নেই। কিছু কিছু মুভিতে দেখা যায় রাতের কোনো যুদ্ধে একটা বিশেষ চশমা পরে যা দিয়ে অন্ধকারেও দেখতে পারে। অবশ্য বাংলা সিনেমায় এসব পাওয়া যাবে না। আমাদের নায়কদের চোখ মারাত্মক। তাঁরা এসব পরে লজ্জা পেতে চান না। যা-হোক, চলুন পড়ে আসি নাইট ভিশনের ইতিবৃত্ত।

নাইট ভিশন চশমা কী?

নাইট ভিশন চশমা নাম শুনলেই জিনিসটা কী তা বোঝা যায়। অর্থাৎ, যে চশমা দিয়ে অন্ধকারেও দেখা সম্ভব সেটাই নাইট ভিশন।

কিছু কিছু প্রাণী কীভাবে অন্ধকারে দেখতে পায়? আমরা কেন পাই না?

নাইট ভিশন নিয়ে জানতে গেলে আগে চোখ নিয়ে কিছু কথা বলতে হয়। আমরা সবাই জানি, আমাদের মানে মানুষের চোখে 'রড' ও 'কোন' কোষ নামে দুই ধরনের আলোকসংবেদী কোষ রয়েছে। এর মধ্যে রড কোষগুলো অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং খুব অল্প আলোয় কাজ করতে পারে কিন্তু রং শনাক্ত করতে পারে না। মূলত, এই রড কোষগুলো আবছা আলোয় দেখতে সাহায্য করে ঠিকই কিন্তু একদম ঘুটঘুটে অন্ধকারে আমরা দেখতে পাই না। তবে নিশাচর প্রাণীরা কিন্তু ঠিকই রাতে দেখতে পায়। এর কারণ নিশাচর প্রাণীদের চোখে ট্যাপেটাম লুসিডাম (Tapetum Lucidum) থাকে। এটি অনেকটা আয়নার মতো কাজ করে। এই ট্যাপেটাম কোনো আলোকে প্রতিফলিত করে আবার চোখেই পাঠিয়ে দেয়। ফলে তাদের রেটিনায় সাধারণের চেয়ে দ্বিগুণ আলো পৌঁছায়। শুধু তা-ই নয়, অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় এদের চোখে রড কোষের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। এজন্য খুব কম আলো বা অন্ধকারে এরা ভালোই দেখতে পায়।

নাইট ভিশনের ইতিহাস

১৯২৯ সালে হাঙ্গেরিয়ান পদার্থবিদ ক্যালমান টিহানি যুক্তরাজ্যের অ্যান্টি এয়ারক্রাফট ডিফেন্সের জন্য একটি ইনফ্রারেড সেনসিটিভ টেলিভিশন ক্যামেরা উদ্ভাবন করেন। নাইট ভিশন প্রযুক্তি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। ১৯৩৯ সালে জার্মান সেনাবাহিনী এ ধরনের ডিভাইসের সাথে পরিচিত হয়। ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে তারা প্রথম

পরীক্ষামূলকভাবে একটি ইনফ্রারেড নাইট ভিশন ডিভাইস ব্যবহার করে। পরবর্তীতে ভ্লাদিমির কে. জোওরিকিনস এবংরেডিয়ো কর্পোরেশন অফ অ্যামেরিকার হাতে এটি উন্নতি লাভ করে। ১৯৭০ সালের দিকে নাইট ভিশনে থার্মাল ইমেজিং সিস্টেম যুক্ত হয়। এভাবে আস্তে আস্তে এ প্রযুক্তি বিকশিত হয়েছে। বর্তমান সময়ের নাইট ভিশন পূর্বের তুলনায় ৫০,০০০ গুণ বেশি আলো ক্যাপচার করতে পারে।

কীভাবে কাজ করে?

আমরা যাকে ঘুটঘুটে অন্ধকার বলি, সেখানেও কিন্তু আলো থাকে। মানুষ ৪০০–৭০০ ন্যানোমিটারের মধ্যবর্তী তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো দেখতে পায়। আমরা যেটাকে অন্ধকার বলি সেখানেও কিন্তু ইনফ্রারেড বা আল্ট্রাভায়োলেট লাইট থাকতে পারে। এগুলো খালি চোখে দেখা যায় না। তাই যদি আমরা অন্ধকারে দেখতে চাই তবে এই আলোক রশ্মিকে ক্যাপচার করতে হবে, তারপরে সেই আলোকরশ্মির শক্তি আরও বাড়িয়ে বা বুস্ট করে চশমার সামনে ফেলতে হবে, যাতে চোখ তা দেখতে পায়। এখন প্রশ্ন হলো, বুস্ট কীভাবে করব?

আমরা বুস্ট করব ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করে। যদি আমরা আলোকে ইলেকট্রিসিটিতে পরিবর্তিত করে ইলেকট্রিসিটিকে বুস্ট করি ও বুস্ট করা আলোকে ইলেকট্রিসিটিতে পরিণত করি তবে অনেক সহজেই আগের চেয়ে উজ্জ্বল আলো পাওয়া সম্ভব। এতে রাতের ক্ষীণ আলোকে উজ্জ্বল করে, অন্ধকারেও দেখা সম্ভব হবে।

নাইট ভিশন দুটি প্রযুক্তিতে কাজ করে।
১. ইমেজ এনহ্যান্সমেন্ট প্রযুক্তি
২. থার্মাল ইমেজিং প্রযুক্তি

১. ইমেজ ইনহ্যানসমেন্ট প্রযুক্তি

নাইট ভিশন চশমা ইমেজ এনহ্যান্সমেন্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে অন্ধকারে অদৃশ্য আলোকরাশিকে সংগ্রহ করে এবং সেই আলোকে বুস্ট করে উজ্জ্বল করে তোলে। ফলে অন্ধকারে দেখা যায়। তবে অনেক সময় যথেষ্ট আলো না থাকায় এই প্রযুক্তি কাজ না করতেও পারে।

২. থার্মাল ইমেজিং প্রযুক্তি

থার্মাল ইমেজিং, ইমেজ এনহ্যান্সমেন্ট থেকে অনেক বেশি কার্যকর। এই প্রযুক্তি তাপের সাথে জড়িত। প্রত্যেকটি গরম বস্তু, সাথে মানুষের শরীর থেকে কিছু উত্তাপ ইনফ্রারেড লাইট আকারে নির্গত হয়। এখন থার্মাল ইমেজিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে চলা নাইট ভিশন চশমা সেই গরম বস্তু হতে নির্গত হওয়া ইনফ্রারেড লাইট ক্যাপচার এবং একটি দৃষ্টিক্ষেত্র তৈরি করে। থার্মাল ইমেজিং প্রযুক্তি তখন ব্যবহার করা হয়, যখন অন্ধকারে কোনো মানুষকে খোঁজা হয়, যদিও বেশিরভাগ নাইট ভিশন ডিভাইস ইমেজ এনহ্যান্সমেন্ট প্রযুক্তির ওপর কাজ করে।

নাইট ভিশনে সবুজ কেন দেখি?

আসলে মানুষের চোখ সবুজ আলো পছন্দ করে। আগেই বলেছি মানুষের চোখ ৪০০–৭০০ ন্যানোমিটারের মধ্যবর্তী তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো দেখতে পায়। অন্যদিকে, আমরা
লাল, নীল ও সবুজ – এই তিনটি প্রাথমিক রং উপলব্ধি করতে পারি। এই তিনটি রঙের মধ্যে নীলের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম (৪০০ nm) এবং লালের সবচেয়ে বেশি (৭০০ nm)। আর সবুজের জন্য এই মান ৫৫৫ nm এর, যা আমাদের দেখার রেঞ্জের মাঝামাঝি – বেশিও না, কমও না। তাই আমাদের চোখ অন্যান্য আলোর চেয়ে সবুজ আলোর দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে।
এ কারণেই নাইট ভিশন চশমা বা ক্যামেরা থেকে আসা ছবিকে গ্রিন স্ক্রিন করা হয়।

কতদূর দেখা যায়?

একটি ভালো মানের নাইট ভিশন গগলস দিয়ে একদম মেঘবিহীন, জোছনাবিহীন অন্ধকার রাতে ২০০ গজ পর্যন্ত দেখা সম্ভব।
তো, এই হলো আমাদের নাইট ভিশন চশমা।
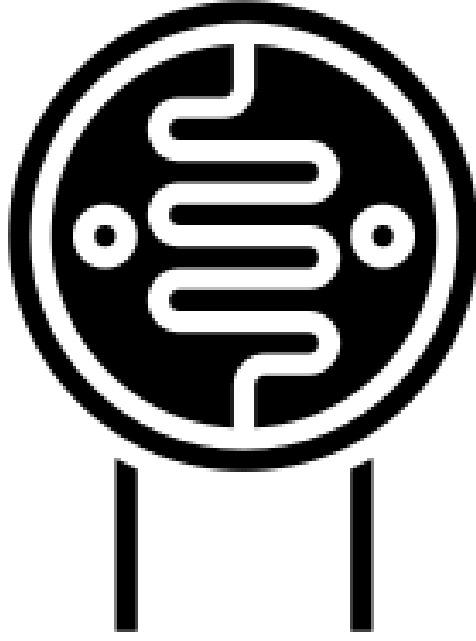
এলডিআর (LDR) সেন্সর

আজমাইন ইকতেদার

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সেন্সর অত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।বিভিন্ন ধরনের সেন্সর রয়েছে। তবে এই লেখনীতে বহুল ব্যবহৃত এলডিআর সেন্সর নিয়ে খুবই মৌলিক পর্যায়ে আলোচনা করা হবে।

ব্যবহারের ক্ষেত্র

রিমোট কন্ট্রোল সব কিছুতেই এই সেন্সর থাকে। যেমন: টেলিভিশন, এসি, ডিজিটাল ঘড়ি ইত্যাদি। আবার রাস্তায় যে সোলার লাইট থাকে সেখানেও এই সেন্সর ব্যবহার করা হয়।

এই এলডিআর সেন্সর কী?

এই এলডিআর বা LDR এর পূর্ণ নাম Light Dependent Resistors]।

এটা এমন পদার্থ দিয়ে তৈরি যার রোধ আলোর ওপর] নির্ভরশীল। অর্থাৎ, যদি সেন্সরের ওপর আলো পড়ে তখন এর রোধ কমে যায়। আবার অন্ধকার হলে রোধ বেড়ে যায়। মূলত এই সেন্সরগুলোতে ক্যাডমিয়াম সালফাইড (CdS) ব্যবহার করা হয়। এটি দামে সস্তা হওয়ায় এর ব্যবহার বেশি দেখা যায়। তাছাড়াও লেড সালফাইড (PbS), লেড সেলেনাইড (PbSe), ইন্ডিয়াম অ্যান্টিমোনাইড (InSb) ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এরা সবই অর্ধপরিবাহী।

এই পদার্থ গুলো কিভাবে কাজ করে?

এই এলডিআর সেন্সর উচ্চ প্রতিরোধের অর্ধপরিবাহী উপাদান দিয়ে তৈরি হয়। যখন আলো ডিভাইসে আঘাত করে, তখন ফোটনগুলি ইলেকট্রনগুলোকে শক্তি দেয়। ফলে ইলেকট্রনগুলো তাদের পরিবাহী ব্যান্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ পরিচালনা করে। তাই এদের রোধ অনেক কমে যায় ও পরিবাহীর ন্যায় আচরণ করে।
আবার অন্ধকারে ঠিক উলটো ব্যাপারটি ঘটে। তখন আলো না থাকায় ইলেকট্রনগুলো শক্তি পায় না। ফলে তাদের রোধ অনেক অনেক বেশি হয়। তাই তারা অপরিবাহীর ন্যায় আচরণ করে।

আচ্ছা এই সেন্সর দিয়ে এখন একটা বর্তনী তৈরি করা যাক।

বেসিক ধারণা

ইলেকট্রন: পরমাণুতে অবস্থিত নেগেটিভ চার্জ বিশিষ্ট কণা যা পরমাণুর কেন্দ্রের নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘোরে। ইলেকট্রনের প্রবাহই হলো বিদ্যুৎ প্রবাহ। তবে যেদিকে ইলেকট্রনের প্রবাহ হয় তার বিপরীত দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহ হয়।
ভোল্টেজ: বিভব পার্থক্য বা তড়িৎশক্তির পরিমাণ বোঝায়।
বর্তনী বা সার্কিট: তড়িৎ চলার পথ।
ট্রানজিস্টার: এটা অনেকটা ট্যাপের মতো কাজ করে। ট্যাপ খুলে দিলে যেমন পানি পড়বে, তেমনই এর বেসে অল্প একটু কারেন্ট দিলে এর

কালেক্টর দিয়ে বিদ্যুৎ বেসে প্রবেশ করবে ও অ্যামিটার দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির নাম:

1. BC557 transistor = আপনি অন্য ট্রানজিস্টারও ব্যবহার করতে পারেন
   (যেমন 2n2222 ট্রানজিস্টার)। তবে এর রোধ বিবেচনায় রাখতে হবে।
2. রোধ; 100kΩ ও 390Ω = প্রয়োজন অনুযায়ী রোধ ব্যবহার করতে হবে। তার , ট্রানজিস্টার, LED Light এর রোধগুলো বিবেচনায় আনতে হবে।
3. ব্যাটারি 9V = যে-কোনো ব্যাটারি ব্যবহার করা যায়। তবে তাতে ট্রানজিস্টার চালু করার মতো শক্তি থাকতে হবে।
4. 2V LED Light. যে-কোনো ভোল্টেজের লাইট বা অন্যকিছু ব্যবহার করতে পারেন। তবে তার ভোল্টেজ যেন ব্যাটারির ভোল্টেজের বেশি না হয় ।
5. Wire = আমি এখানে Soldering wire ও PCB board ব্যবহার করব।

বি.দ্র. আপনি এই যন্ত্রগুলো স্থানীয় বাজার থেকেই কিনতে পারবেন ।

বর্তনী

LDR এর প্রান্তদ্বয়কে চিত্রের ন্যায় ট্রানজিস্টারের বেস ও কালেক্টরের সাথে সংযুক্ত করতে হবে এবং এদের সাথে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্তের সংযোগ দিতে হবে, যাতে করে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত হতে বিদ্যুৎ সেন্সরে ও ট্রানজিস্টারের কালেক্টরে পৌছায় এবং আলোর উপস্থিতিতে সেন্সর এর রোধ কম থাকলে বিদ্যুৎ সেন্সর দিয়ে ট্রানজিস্টারের বেসে পৌঁছায়। এবার এলইডি লাইটকে ট্রানজিস্টারের অ্যামিটারের সাথে যুক্ত করতে হবে। রোধ ১ এর মাধ্যমে বিদ্যুতের ভোল্টেজ কমিয়ে এনে এলইডি লাইট দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবেশ করাতে হবে। অর্থাৎ, লাইটের পূর্বে রোধ লাগাতে হবে।

ধরি, আমরা ২ ভোল্টেজের এলইডি লাইট নিয়েছি। তাহলে আমাদেরকে এলইডি লাইট এর ভিতর দিয়ে ২ ভোল্টেজের প্রবাহই করাতে হবে। আমাদের কাছে ৯ ভোল্টেজের ব্যাটারি থাকলে আমরা ৭ ভোল্ট পরিমাণ চার্জকে রোধ এর মাধ্যমে কমিয়ে আনতে পারব। ফলে এলইডি লাইট এর মধ্য দিয়ে ২ ভোল্টেজের বিদ্যুৎ প্রবাহ হবে। ফলে লাইটটাও অক্ষত থাকবে এবং লাইট জ্বলে উঠবে। এবার লাইটটির শেষ প্রান্ত ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্তের সাথে যুক্ত করতে হবে
।

ব্যাটারির নেগেটিভ ও সেন্সরের মাঝে রোধ ২ লাগাতে হবে। রোধ ২-এ আপনি ১০ হাজার ওহম ব্যবহার করতে পারেন, তবে ১০০ হাজার ওহম সবচেয়ে ভালো হয়। এই রোধ ট্রিগার হিসাবে কাজ করে। (আপনি অন্যভাবেও এটা তৈরি করতে পারেন। আসলে এমনভাবে এই বর্তনী তৈরি করতে হবে যেখানে এলডিআর এর রোধের ওপরই সমস্ত বর্তনীর তড়িৎপ্রবাহ নির্ভর করবে।)

বর্তনীর কাজ

আলোর উপস্থিতিতে সেন্সর এর রোধ কম থাকবে এবং বিদ্যুৎ সেন্সর দিয়ে ট্রানজিস্টারের বেসে পৌঁছাবে। ফলে ট্রানজিস্টার অন হবে। আর বিদ্যুৎ পরিবহন শুরু হবে। ফলে লাইট জ্বলে উঠবে।

এবার অন্ধকার পর্যায় –

আলো না থাকলে সেন্সর এর রোধ অনেক অনেক বেড়ে যাবে ফলে বিদ্যুৎ পরিবহন প্রায় হবে না বললেই চলে। তাই ট্রানজিস্টারের বেসেও বিদ্যুৎ যাবে না। গেলেও খুবি কম পরিমাণে যাবে যেখানে একটা ট্রানজিস্টারকে সচল করার মতো শক্তি থাকে না। ফলে ট্রানজিস্টার অন হবে না। তাই সম্পূর্ণ বর্তনীতে বিদ্যুৎ পরিবহন হবে না, লাইটও জ্বলবে না।

কোথায় এই বর্তনী ব্যবহার করা হয়?

এটি সাধারণত রিমোট কন্ট্রোল সব কিছুতেই ব্যবহার করা হয়। আর রাস্তার লাইটের জন্য বর্তনী তৈরি করতে হলে শুধু এনপিএন ট্রানজিস্টার এর বদলে পিএনপি ট্রানজিস্টার ব্যবহার করতে হবে। তবে এটি তুলনামূলক একটু জটিল বর্তনী হবে।

(নিচের অংশ শুধু জানার জন্য। এটি মূল লেখার অংশ নয়)

এই বর্তনী দিয়ে অন্য কোনো সেন্সর তৈরি করা যায় কি না?

অবশ্যই যাবে। এই বর্তনী দিয়েই Touch sensor তৈরি করা যায়। শুধু LDRকে সরিয়ে দিয়ে ওখানে একটা গ্যাপ তৈরি করতে হবে। সেই গ্যাপে স্পর্শ করলে লাইট জ্বলবে মানে বর্তনীতে বিদ্যুৎ পরিবহন হবে। আবার হাত সরালে লাইট অফ হবে মানে বিদ্যুৎ পরিবহন হবে না। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে মোশান সেন্সরও তৈরি করা যায়।

এক্ষেত্রে কোনো বস্তু হতে যে অবলোহিত রশ্মি প্রতিফলিত হয় তা মোশান সেন্সর ডিটেক্ট করতে পারে।

Touch sensor এর ক্ষেত্রে একটা বিষয় লক্ষ রাখতে হবে যে আমাদের আলোচিত বর্তনীতে এলইডি লাইটের মধ্য দিয়ে ১৮ mA বিদ্যুৎ প্রবাহ হয়েছে। আপনার হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে সরাসরি ১০ mA বিদ্যুৎ প্রবাহ হলে আপনার মৃত্যু হবে। তাই উপযুক্ত রোধ ব্যবহার করে এই Touch sensor তৈরি করবেন।
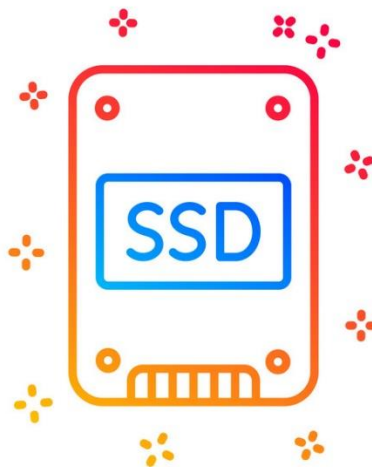
SSD কী এবং কেন?

রওনক শাহরিয়ার

"If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses." – **Henry Ford**

ফোর্ডের কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। ঠিক এই কারণে
বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে Solid State Drives (SSD) ট্র্যাডিশনাল হার্ড ড্রাইভের স্থান দখল করছে। এসএসডি ও হার্ড ড্রাইভ উভয়ই মেমোরি সিস্টেম হলেও দুটোর মৌলিক দিক দিয়ে সম্পূর্ন ভিন্ন।

হার্ড ড্রাইভের মতো এসএসডিতেও বিশাল আকারের ডেটা একটা দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা যায়, পাওয়ার অন বা অফ দুই অবস্থায়।

হার্ড ড্রাইভের মতো এসএসডিতে কোনো মুভিং পার্টস থাকে না এবং এটা অনেকটা ফ্ল্যাশ ড্রাইভের মতো কাজ করে। মোট কথায়, একটা এসএসডি এর সাথে USB ফ্ল্যাশ ড্রাইভ, এসডি কার্ড বা স্মার্টফোন ও ল্যাবলেটে থাকা মেমোরি চিপের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই।
মূলত ফ্ল্যাশ মেমরি দুই ধরনের –
১. নর
২. ন্যান্ড।

উভয়ের গ্রিডে ট্রান্সজিস্টর ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তবে সেলগুলোর সংযোগ ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন। নর ফ্ল্যাশ সেলে প্যারালালভাবে সংযুক্ত থাকে। আর ন্যান্ড ফ্ল্যাশ সেলে সিরিজভাবে। এ কারণে নর ফ্ল্যাশ সেলে অধিক পরিমাণে তারের সংযোগ থাকে, যা সেগুলোকে বড়ো এবং জটিল বানিয়ে দেয়। সেখানে ন্যান্ড সেলে খুব কম তারের সংযোগ লাগে এবং একটি চিপের মধ্যে বহু সংখ্যক ট্রান্সজিস্টর রাখা সম্ভব হয়। যার ফলে ন্যান্ড চিপ কিছুটা কম দামে এবং ফাস্ট রিড-রাইট করতে পারে।

এবার এসএসডি নিয়ে আসা যাক। বাজারে পাওয়া এসএসডিতে মূলত একটি হার্ডকেস ব্যবহার করা হয়। এটা বাহিরে বাহিরের বিভিন্ন বস্তুর আঘাত থেকে মেইন বোর্ডকে রক্ষা করে। এসএসডি এর মধ্যে বিভিন্ন অংশ –

ন্যান্ড ফ্ল্যাশ চিপ:
প্রতিটা এসএসডিতে থাকে কিছু ন্যান্ড চিপ। এইগুলোতেই মূলত ডেটা স্টোর হয়।

কন্ট্রোলার:
রিড-রাইটের ইন্সট্রাকশন ন্যান্ড চিপে পাঠায়।

ডি-র‍্যাম চিপ:
এটা সাধারণ কম্পিউটার র‍্যামের মতোই কাজ করে। অবস্থায়ীভাবে ডেটা এখানে যায়।
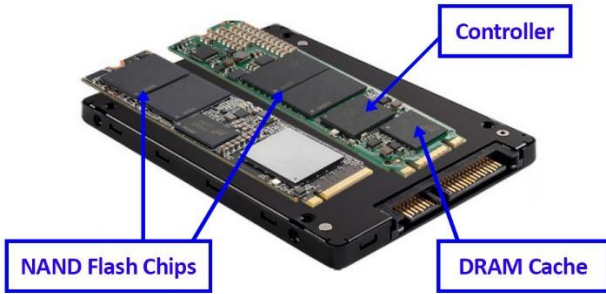
ন্যান্ড চিপ কীভাবে কাজ করে?
ন্যান্ড চিপের মধ্যে থাকে অসংখ্য ন্যান্ড সেল। এখানে ০/১ বিট রূপে ডেটা স্টোর হয়। এই সেলগুলো মূলত হয়ে থাকে মসফেটস ট্রান্সজিস্টরের মতো। সেখানে ডেটা ফ্লোটিং গেটের ওপরে জমা হয়। ইতোপূর্বে ব্যাঙাচির এই সংখ্যার প্রথম দিকে '**মেমোরি কার্ড বা এসডি কার্ড**' শীর্ষক লেখাটি পড়েছেন, তারা ব্যাপারটি আরো সহজে অনুধাবণ করতে পারবেন।

এসএসডিতে ন্যান্ড ফ্ল্যাশ চিপ হলো মূল মেমোরি। আর এর সেলগুলোকে বিভিন্নভাবে তৈরি করা হয়ে থাকে। এই সেলগুলো কত বিটের হবে তার ওপর রিড-রাইট স্পিড নির্ভর করে। বিট যত বেশি বাড়বে বিট প্যানাল্টি তত বাড়বে। অর্থাৎ, একটি গেট দিয়ে একাধিক বিট বের হতে একটু বেশি সময় লাগবে। সেলে যত বিট বাড়ছে ডেটা এক্সেস টাইমও তত বেড়ে যাবে। সেজন্য অনেক ন্যান্ড ফ্ল্যাশ চিপে ডি-র‍্যাম ক্যাশ ব্যবহার করা হয়, যাতে রিড রাইট স্পিড এ অতিরিক্ত বাফার হয়।
নিচে কয়েক ধরনের সেল নিয়ে আলোচনা করা হলো –

Slc:
প্রথমদিকের ন্যান্ড সেলগুলো তৈরি করা হয়েছিল slc সেল বা single level shell। এর মধ্যে মূলত একটি বিট থাকে। কিন্তু এতে খরচ অনেক বেশি হয়।

Mlc:
খরচের দিকে খেয়াল রেখে mlc বা multi level shell তৈরি করা হয়। মাল্টি মানে এখানে একাধিক নয় বরং একটি সেলের মধ্যে দুইটা বিট ধারণ করতে পারে তা বোঝায়। এর ফলে একই খরচে স্টোরেজ ডাবল হয়ে যায়। যদিও এতে খরচ খুব একটা সাধারণ মানুষের নাগালে আনা যায়নি।

Tlc:
tlc বা triple level shell বা একটি সেলে তিনটি বিট ধারণ করতে পারে। এই ধরণের চিপ বর্তমানে সাধারণ এসএসডিগুলোতে ব্যবহার করা হয়।

Qlc:
Qlc বা quad level shell একটি সেলে ৪টি বিট ধারণ করতে পারে। এমন চিপ যুক্ত এসএসডি এর দাম অনেক কম হয়ে থাকে।

Plc:
গত বছর ইন্টেল ও টোশিবা plc বা penta level shell সেল নিয়েও কাজ শুরু করার ঘোষণা দিয়েছে। এতে প্রতিটা সেলে ৫ বিট ধারণ ক্ষমতা থাকবে।
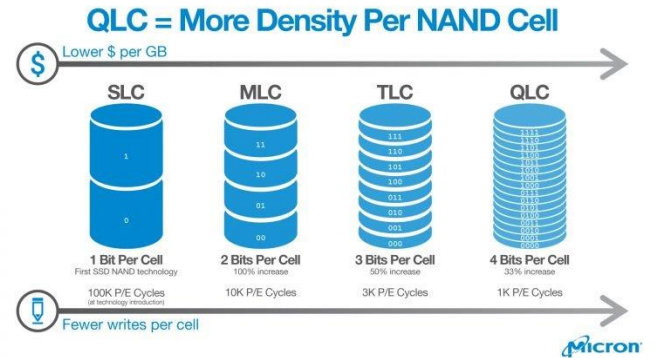
ন্যান্ড ফ্ল্যাশ চিপের মধ্যে থাকা বিভিন্ন অংশ যা উচ্চগতিতে ডেটা রাইট ও রিড করতে সহায়তা করে।
সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো –

ডাই (Die):
প্রতিটা ন্যান্ড ফ্ল্যাশ চিপে এক বা একাধিক ডাই থাকে। ছবির নীল কালার অংশটা হলো ডাই। একটা কমান্ড স্বাধীনভাবে থাকার এটাই শেষ স্টেজ।

প্লেন (plane):
ডাই এর মধ্যে একটা বা দুইটা প্লেন থাকতে পারে। ছবিতে গাঢ় নীল রংয়ের অংশটা প্লেন। ডেটা রিড-রাইটের ক্ষেত্রে দুইটা প্লেন একসাথে কাজ করতে পারে।

ব্লক (block):
একটা প্লেনের মধ্যে একাধিক ব্লক থাকতে পারে। ছবিতে পেস্ট কালারের অংশগুলো হলো ব্লক। আর ডেটা ইরেজ হয় এই ব্লক লেভেল-এ এবং রাইট হয় পেইজ লেভেল-এ। সেজন্য এখানে ১২৮/২৫৬ কিলোবাইট ডেটা ইরেজ হয়ে থাকে। অনেকগুলো পেইজের ডেটা এক সাথে প্রতিটা ব্লকে ইরেজ হওয়ায়, কোনো ফাইল ডিলিট করার সময় অতিরিক্ত ডেটা র‍্যাম এ চলে যায়। আবার ইরেজ হলে পুনরায় ডেটা স্টোর হয়।
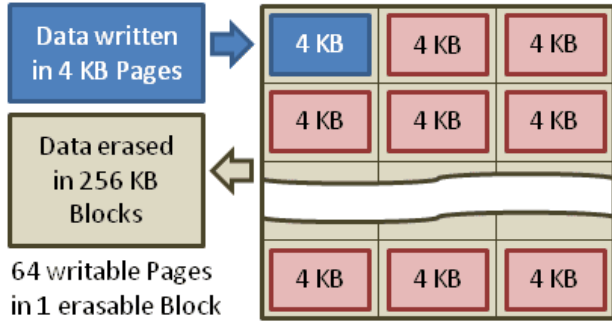
Typical NAND Flash Pages and Blocks

পেইজ (page):
ব্লকের মধ্যে প্রচুর পেইজ থাকে। ছবিতে হলুদ রঙয়ের ছোটো ছোটো খোপ হলো এক একটি পেইজ। এই পেইজের মধ্যে ডেটা রাইট হয়। একেকটা পেইজের আকার ২/৮/১৬ কিলোবাইট হয়ে থাকে।
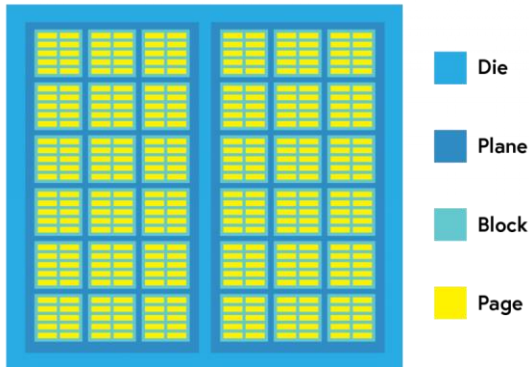
ডেটা ইরেজ করার সময় সেল এ আলাদা ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়। সময়ের সাথে ডেটা আদান প্রদানের জন্য বার বার ভোল্টেজের প্রবাহে ট্রান্সজিস্টর এর লাইফ স্প্যান ধীরে ধীরে কমে যায়। এজন্য এসএসডিতে এক ধরণের অ্যালগরিদম ব্যবহার করা হয়, যেন ডেটা ইরেজ যে পেইজে করা হয়েছে সেই পেইজ বাদে অন্যান্য ফাঁকা পেইজগুলোতে রাইট হয়। এভাবে যখন এসএসডিতে ধীরে ধীরে ডেটা পূর্ণ হয়ে যায়, তখন সেই ইরেজ হয়ে যাওয়া ব্লকের পেইজগুলোতে ডেটা রাইট হয়। এজন্য যে এসএসডি যত বেশি ব্যবহার করা হয়, তার আয়ু তত কমে আসে বা ডেটা রিড-রাইট স্পিড তত কমে যায়।
Slc এসএসডিতে সবচেয়ে বেশি সাইকেল থাকে এবং সেলে যত বেশি বিট ধারণ করবে, টোটাল সাইকেলের পরিমাণও তত কমে যাবে।
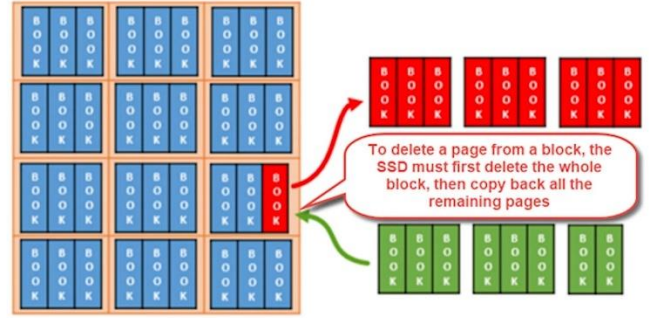
এখন এসএসডি এর গায়ে বিভিন্ন রকমের টেকনোলজির কথা উল্লেখ থাকে, যেগুলো এসএসডির মান ও লাইফ স্প্যান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এই টেকনোলজিগুলো হলো –

ট্রিম কমান্ড:
এই কমান্ডে হলো যখন একটি ডেটা মডিফাই করার কমান্ড দেওয়া হবে তখন যেটা কিছু জায়গাকে ইরেজ করবে। আবার যখন ডেটা মুভ করা হবে তখন সেই কমান্ডটা আবার পারফর্ম করবে। এতে করে কিছু ব্লক এ ইরেজ করার দরকার হয় না। যার জন্য এসএসডি এর লাইফস্প্যান কিছুটা বৃদ্ধি পায়।

গারবেজ কালেকশন:
যেহেতু ডেটা রাইট হয় পেইজ লেভেলে আর ইরেজ হয় ব্লক লেভেলে, সেজন্য ছোটো কোনো ফাইল রাইট করতেও পুরো ব্লক ইরেজ করে ফেলে। যার জন্য ছোটো ফাইল রাইট করার দরকার হলেও সেটা অনেক বড়ো জায়গা দখল করে ফেলে। একে রাইট অ্যামপ্লিফিকেশন বলে। গারবেজ কালেকশন এই অযথা জায়গা দখলকে কমিয়ে দেয়।

ওভার প্রভিশন:

রাইট এর ইমপেক্ট কমানোর জন্য এসএসডিতে ওভার প্রভিশন করা থাকে। যেটুকু স্টোরেজ ব্যবহার করা হয় তার থেকে কিছুটা বেশি স্টোরেজ ফাঁকা রাখা থাকে। যেটা সাধারণত ব্যবহার করা যায় না কিন্তু রাইট অ্যামপ্লিফিকেশন এর ইমপেক্ট কমিয়ে দেয়।

ওয়্যার লেভেলিং:
এটি একটি অ্যালগরিদম যা কোন কোন ব্লকে ডেটা ইরেজ হচ্ছে বা রাইট হচ্ছে তার খেয়াল রাখে। কোনো চিপে ডেটা কম রাইট হচ্ছে আবার অন্যগুলোতে বেশি হচ্ছে, এমনটা যেন না হয়ে সব জায়গাতে একটা ব্যালেন্সড পর্যায়ে থাকে, তা খেয়াল রাখে।

এবার এসএসডি এর পারফরম্যান্স নিয়ে আলোচনা করা যাক।
হার্ড ড্রাইভ ও এসএসডি পারফরম্যান্সের বিশাল পার্থক্য রয়েছে।
এসএসডি হার্ড ড্রাইভ থেকে প্রায় ১০ গুণ বেশি রিড স্পিড এবং ২০ গুণ বেশি রাইট স্পিড সম্পন্ন।
এটি অপারেটিং সিস্টেমকে প্রায় ১৫ সেকেন্ডে ওপেন করে, সাধারণ ফাইল রিড ৫০০ মেগাবাইট এর বেশি এবং প্রায় ১৫০ মেগাবাইট রাইট স্পিড হয়।
অ্যাপস, গেমস ও কম্পিউটারের অভারঅল পারফরম্যান্স হার্ড ড্রাইভ থেকে অনেক দ্রুত ও স্মুথ হয়।
আর আরেকটি বিষয় হলো, এর আকার, আকৃতি। এসএসডি আকারে ছোটো প্রায় ২.৫ ইঞ্চি এবং আকারে হালকা।

এর ফেইলিওর রেটও অনেক কম এবং এক্সট্রা ফিচার হিসেবে error-correcting code (ECC) থাকায় এসএসডিতে ইরোর হওয়ার সম্ভাবনা কম।

সমস্যা:
এবার এসএসডি এর সমস্যা নিয়ে আসা যাক।
এসএসডিতে থাকা ন্যান্ড ফ্ল্যাশ চিপের জন্য এর দাম হার্ডড্রাইভের দামের তুলনায় অনেক বেশি।
এবং ন্যান্ড ফ্ল্যাশ চিপ বেশি দীর্ঘস্থায়ী নয়। মূল কারণ ন্যান্ড চিপগুলোর নির্দিষ্ট সংখ্যক সাইকেল থাকায়। ওপরে আলোচনা হয়েছে কারণ নিয়ে।
প্রতি সাইকেলে লাইফস্প্যান কমতে থাকবে। একটি mlc ন্যান্ড ফ্ল্যাশ সেল ৩৫,০০০ বার রাইট/ইরেজ সাইকেল পর্যন্ত কাজ করবে। Mlc এর চেয়ে Tlc-তে বিট ধারণক্ষমতা বেশি হওয়ায় Tlc-তে সাইকেল আরও কম। অর্থাৎ, প্রতি জেনারেশনে সাইকেল সংখ্যা কমে আসছে।
এক্ষেত্রে হার্ড ড্রাইভের সাইকেল ও লাইফস্প্যান অনেক দীর্ঘ।

সাধারণত এজন্য অপারেটিং সিস্টেম ও অ্যাপসগুলো এসএসডিতে রাখা হয় এবং সাধারণ ফাইলগুলো হার্ড ড্রাইভে। এই কম্বিনেশন দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং এসএসডি এর ফাস্ট রেসপন্সের সুবিধা পাওয়া যাবে ও খরচও তুলনামূলক কম হবে।

১৯৮০ সালে উন্মুক্ত করা ১ জিবির হার্ড ড্রাইভের দাম ছিল ৪০,০০০ মার্কিন ডলার।

ফেইসবুক আইডি সুরক্ষিত রাখবেন কীভাবে?

মোহাম্মদ সাইফুল খান পলাশ

একটা ফেইসবুক আইডি মানেই অনেক স্মৃতি, আইডি হারিয়ে গেলে বা আইডি হ্যাক হলে আইডির মর্ম বোঝা যায়।

ধরেন, আপনি 'ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান' গ্রুপের একজন মেম্বার। এখানে আর্টিকেল লিখেন, পোস্ট করেন, উত্তর দেন, উত্তর পেতে আসেন।
আপনার আইডির সাথে অনেক মানুষ জড়িয়ে, অনেক তথ্যও।
এছাড়া আইডি হ্যাক হলে ব্ল্যাকমেইল, হ্যারাসমেন্টের শিকার হতে পারেন।
হঠাৎ আইডিটা নষ্ট বা হ্যাক হয়ে গেল। তখনকার অনুভূতি খুব বিব্রতকর এবং কষ্টদায়ক।

যা-হোক, কীভাবে আইডি নিরাপদ রাখবেন যাতে ফেইসবুক আইডি হ্যাক না হয় এবং নষ্ট হলে ঠিক করতে পারেন। সেসবের ব্যাপারে কিছু টিপস সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

(১) আপনার ফেইসবুক আইডির নাম এবং জন্ম-তারিখ, আপনার জাতীয় পরিচয়পত্র (NID), পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স বা অন্যান্য দাপ্তরিক কাগজপত্রের সাথে মিল রাখুন।

(২) ফেইসবুক আইডিতে মোবাইল নম্বরের পাশাপাশি অবশ্যই একটা ইমেইল আইডি যুক্ত রাখুন।

(৩) ফেইসবুক আইডির ইমেইল এবং জন্ম-তারিখের প্রাইভেসি অবশ্যই 'Only me' করে রাখুন। এতে করে কেউ নকল পরিচয়পত্র তৈরি করে আইডির অ্যাক্সেস নিতে পারবে না।

(৪) ফেইসবুক আইডিতে টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন চালু রাখুন। এজন্য ফেইসবুকে গিয়ে Settings→ Security and login→ Use two-factor authentication এ গেলে দুইটা অপশন পাবেন →
(ক) Authentication App
(খ) Text message (SMS) ।

দুটো অপশন দিয়েই টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন চালু করতে পারবেন।
এটা চালু করলে আপনার আইডি পাসওয়ার্ড জানার পরও কেউ লগ-ইন করতে গেলে কোড চাইবে যা আপনার দেওয়া Authentication App বা Mobile Number এর মেসেজ থেকে নিতে হবে। সেই কোড দেওয়া ছাড়া লগ-ইন করতে পারবে না।

(৫) ধরুন, আপনার আইডি মোটামুটি সিকিউরড; এরপরও কেউ আপনার জন্ম-তারিখটি জেনে গেল, ইমেইল এবং ফেইসবুকের পাসওয়ার্ডও জেনে গেল। এরপর সে চাইলেই টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন ভাঙতে পারবে। তো, সেটা রুখতে লাস্ট যে স্টেইপ নিবেন তা হলো Trusted Contact যুক্ত করে রাখা। এর জন্য Settings→Security Login→
Choose 3 to 5 friends to contact if you are locked out - এখানে গিয়ে কমপক্ষে ৩ জন বিশ্বস্ত বন্ধুকে সিলেক্ট করে রাখুন।

(৬) ফেইসবুকের নিজস্ব অ্যাপ না হলে অর্থাৎ, ব্রাউজারে ব্যবহার করলে কোনো ধরনের ফিশিং লিংকে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকুন।

লিংক অবশ্যই চেক করে নিবেন যে www.facebook.com কি না।
থার্ড পার্টি অ্যাপ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।

যেমন: : ১ ঘণ্টায় ১ হাজার টাকা ইনকাম করুন বা এই লিংকে আপনার ছবি আছে।
এক কথায়
www.facebook.com,
www.web.facebook.com,
www.m.facebook.com,
www.mbasic.facebook.com,
www.h.facebook.com,
www.fb.com
এই লিংকগুলো ছাড়া অন্য কোনো লিংকে লগ-ইন করবেন না। করেছেন তো গেছেন।

(৭) Unauthorised login notification চালু রাখুন।

(৮) ইনবক্সে পাওয়া কোনো অদ্ভুত ফাইল লিংক/পিকচার ফাইল লিংকে প্রবেশের আগে ভালো করে যাচাই করে নিন। বিশেষ করে ডেক্সটপ বা ল্যাপটপের ক্ষেত্রে বিষয়টির ব্যাপারে অত্যধিক সতর্ক থাকতে হবে।

উপরিউক্তিউ বিষয়গুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করলে আপনার আইডি হ্যাক হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বললেই চলে এবং সঠিক তথ্য দিয়ে থাকলে আইডি নষ্ট হলেও ঠিক করতে পারবেন ফেইসবুকের কাছে আবেদনের মাধ্যমে।।

পৃথিবীর ৭০০ কোটি মানুষের ৪০০ কোটি মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। মজার ব্যাপার হলো যেখানে ব্রাশ করে মাত্র ৩৫০ কোটি মানুষ।

কোয়ান্টাম কম্পিউটিং: প্রযুক্তি খাতে নতুন জায়ান্ট

সাঈদ হাসান

বিগত ৬০ বছরে কম্পিউটার ইন্ডাস্ট্রিতে বিশাল পরিবর্তন এসেছে। এছাড়াও এই ৬০ বছরে কম্পিউটারের যেটুকু উন্নতি হয়েছে, কম্পিউটারের সম্পূর্ণ ইতিহাসে তা ঘটেনি। এছাড়াও কম্পিউটার ইন্ডাস্ট্রিতে বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়েছে পূর্বের তুলনায় বহুগুণ!

সমস্যা সমাধানের জন্য অনন্য এক যন্ত্র কম্পিউটার। কম্পিউটার সেই কাজটি করে তথ্য সংরক্ষণ ও পরিচালনা করার মাধ্যমে। কিন্তু এখনো কিছু চ্যালেঞ্জ, কিছু সমস্যা রয়ে গেছে, যেগুলো জটিলতার কারণে সমাধান করা সম্ভব না। তাছাড়া সাধারণ কম্পিউটার ব্যবহার করে তা সমাধান করা প্রায় অসম্ভব।

কেন অসম্ভব? প্রথমেই বুঝতে হবে কম্পিউটার তথ্য সংরক্ষণ করে কীভাবে। কম্পিউটারের তথ্য প্রসেসিং হয় 'প্রসেসর'-এ যা কোটি কোটি ট্রানজিস্টর দিয়ে তৈরি। এই ট্রানজিস্টরকে আমরা একটা সুইচের সাথে তুলনা করতে পারি। সুইচ অন করে এর মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে এটি 1-কে সংরক্ষিত করে। সুইচ অফ করার মাধ্যমে এটি 0-কে সংরক্ষিত করে রাখে।

আর এই 1 ও 0 এর এর লম্বা সারির মাধ্যমে কোনো লেটার বা নাম্বার বা কোনো ইনফরমেশন সেইভ করা যায়। এই পদ্ধতিকে বাইনারি বলে। আর এই সারির প্রত্যেকটি 1 বা 0-কে বলা হয় 'বাইনারি বিট'। অর্থাৎ, বর্তমান ক্ল্যাসিক্যাল কম্পিউটার বাইনারি পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ ও পরিচালনা করে।

মানুষের চাহিদা অনুযায়ী এই প্রসেসর এর ক্ষমতা বাড়াতে হচ্ছে। এজন্য প্রতি বছর প্রসেসরে ট্রানজিস্টরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এ ধারা বজায় রাখাও সম্ভব নয়। আর আরও উন্নত প্রসেসর তৈরি করতে এর মধ্যে আরও বেশি ট্রানজিস্টর দিতে হবে। এর জন্য ট্রানজিস্টরকে আরও ছোটো করতে হবে। প্রসেসরকে আরও উন্নত করতে হলে এই ধারা বজায় রাখতে হবে।

এভাবে প্রতিনিয়ত ট্রানজিস্টর ছোটো করতে করতে অ্যাটমিক পর্যায়ে চলে যাবে। আর তখন পূর্বের মতো 'অন-অফ' করে তথ্য পরিচালনা করা যাবে না। ঠিক এই পরিস্থিতিতে আমাদের

প্রয়োজন পড়বে 'কোয়ান্টাম কম্পিউটিং'। অ্যাটমিক ট্রানজিস্টর জন্ম দেবে নতুন কম্পিউটার প্রযুক্তি 'কোয়ান্টাম কম্পিউটিং'-এর। প্রচলিত কম্পিউটার 'বাইনারি বিট'এর মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ ও পরিচালনা করে। কিন্তু কোয়ান্টাম কম্পিউটার তথ্য সংরক্ষণ ও পরিচালনা করে 'কোয়ান্টাম মেকানিকাল ফেনোমেনা' বা 'কোয়ান্টাম যান্ত্রিক ঘটনা' এর ওপর ভিত্তি করে। আর কোয়ান্টাম কম্পিউটার এটা করবে 'কোয়ান্টাম বিট' এর মাধ্যমে। এই বিশেষ বিটকে 'কিউবিট'ও বলে।

কোয়ান্টাম বিট কী তা নিয়ে আলোচনা হবে। তবে তার আগে কোয়ান্টাম তত্ত্বের দুএকটা বিষয় আলোচনা করব। বেশি তত্ত্ব টেনে এনে লেখাকে জটিল ও বড়ো করছি না।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব নিয়ে যাঁদের প্রাথমিক ধারণা আছে তাঁরাও জানেন যে-কোনো সময় আলোকরশ্মি এমন আচরণ করে যে এটি কোনো 'কণা'। আবার কোনো সময় এমন আচরণ করে যেন এটি 'তরঙ্গ বা ওয়েভ'। আমাদের দৃশ্যমান ও পরিচিত জগতে এমনটা কখনো দেখা যায় না বা কখনোও কোনোকিছু এমন 'ডুয়ালিটি' এর আচরণ করে না। যেমন আপনি কখনো দেখবেন না আপনার মোবাইল হঠাৎ চার্জার হয়ে গেছে। কিন্তু বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণার জগতে এটা স্বাভাবিক।

যা-হোক, কোয়ান্টাম তত্ত্বে এক চরম বিভ্রান্তিকর ও আলোচিত একটি উদাহরণ শ্রোডিঙ্গারের বিড়াল। কোয়ান্টাম তত্ত্বের এক অদ্ভুত বক্স যেখানে বিড়ালটি একইসাথে মৃত ও জীবিত! এই বিড়াল এত বড়ো পাবলিক ফিগার যে আশা করি যাঁরা এই লেখাটি পড়ছেন, তাঁরা মোটামুটি শ্রোডিঙ্গারের বিড়ালের গল্প জানেন। তাই বিস্তারিত এটা নিয়ে লিখছি না। আমাদের বিষয় 'কোয়ান্টাম কম্পিউটার'। শ্রোডিঙ্গার সাহেবের বিড়ালের উদাহরণ মনে থাকলেই হবে, এখানে লিখার প্রয়োজন দেখছি না।

যা-হোক, শ্রোডিঙ্গার সাহেব এই উদাহরণ ও জটিল হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলেন বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণার জগতে একটা কণা উনার বিড়ালের মতো আচরণ করে। কণাটি একই সাথে দুইটি না ততোধিক জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন দশায় থাকতে পারে। পাঠক হয়তো ভাবছেন এটা কোয়ান্টাম বিট বা কোয়ান্টাম কম্পিউটারের সাথে কীভাবে যুক্ত? হ্যাঁ, কোয়ান্টাম কম্পিউটারের ফান্ডামেন্টাল হলো 'বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণার আচরণ'!

দেখুন অ্যাটমিক ট্রানজিস্টরে আমরা অন অফ করে তথ্য সংরক্ষণ ও পরিচালনা করতে পারব না। একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণুর মধ্যে বিদ্যুৎ ইচ্ছামতো থামিয়ে রাখা বা প্রবাহিত করানো যাবে না।
তখন এই অ্যাটমিক ট্রানজিস্টর শ্রোডিঙ্গারের বিড়ালের মতো আচরণ করবে। ট্রানজিস্টর একই সাথে অন অফ অবস্থায় থাকবে!

একটি 'বাইনারি বিট' শুধুমাত্র একটি 1 অথবা 0 সংরক্ষিত করতে পারে। আর 'কোয়ান্টাম বিট বা কিউবিট' সংরক্ষণ করতে পারে; একই সময়ে 1 এবং 0, অথবা একটি 1 বা একটি 0, বা 1 বা 0 এর মধ্যে অসীম নাম্বার।

যদি ব্যাপারটা জটিল লাগে প্রথম থেকে চিন্তা করুন। একটা ট্রানজিস্টরের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ যদি অন থাকে তাহলে তার মধ্যে 1 সংরক্ষিত থাকে। আর যদি বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করা হয় তাহলে 0 সংরক্ষিত থাকবে। কিন্তু যে জায়গায় একটা ট্রানজিস্টর একই সাথে 'অন ও অফ'। অর্থাৎ, সেখানে একইসাথে 1 ও 0 সংরক্ষিত থাকবে। আবার শুধু 1 অথবা শুধু 0 সংরক্ষিত থাকবে। আবার 1 বা 0 এর মধ্যে অসীম নাম্বারও সংরক্ষিত থাকতে পারে। মূলকথা, এটি একই সময় একাধিক ভ্যালু স্টোর করে রাখতে পারবে, প্রসেস করতে পারবে।

1-0 এর সহাবস্থান 'কোয়ান্টাম কম্পিউটার' এর মূল শক্তি। একই সাথে 1 একই সাথে 0 এর প্রতিনিধিত্ব করার ফলে এটি একসঙ্গে বহু তথ্য সংরক্ষণ ও পরিচালনা করার ক্ষমতা রাখে।

ঠিক এই কারণে সাধারণ কম্পিউটার থেকে 'কোয়ান্টাম কম্পিউটারের' ক্ষমতা বহুগুণ।

একই সাথে বহু তথ্যের সংরক্ষণ ও পরিচালনা করার ক্ষমতার কারণে কোয়ান্টাম কম্পিউটারের শক্তি সাধারণ কম্পিউটার থেকে বেশি।

কিন্তু আমাদের এটা ভাবা উচিত না যে 'কোয়ান্টাম কম্পিউটার' যে কাজ করতে পারে, সাধারণ কম্পিউটার সেই কাজ করতে পারে না। কোয়ান্টাম কম্পিউটারের কাজ সাধারণ কম্পিউটার করতে পারবে, তবে এর জন্য বহু বহু গুণ বেশি শক্তি, সময় লাগবে।

বাইনারি বা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করার ফলে সাধারণ কম্পিউটারের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। বড়ো বড়ো বিচ্ছিন্ন ঘটনা, সমস্যা সমাধান মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ এর ওপর ভিত্তি করে করা যায় না।

কিন্তু এই জায়গায় 'কোয়ান্টাম বিট' ব্যবহার করে অনেক বড়ো বড়ো সমস্যা নিমেষেই সমাধান করা যাবে।
যে কাজ সাধারণ কম্পিউটার দিয়ে করতে কয়েকশ বছর লাগবে, হয়তো সেই কাজ কোয়ান্টাম কম্পিউটার দিয়ে করতে কয়েক মিনিট লাগবে।

কোয়ান্টাম কম্পিউটার ব্যবহার আমাদের কীভাবে উপকারে আসবে?
প্রথম যে উপকার আমাদের হবে তা ওপরে উল্লেখ করে দিয়েছি। সময় ও পাওয়ার বাঁচবে।
কোয়ান্টাম কম্পিউটার একই সাথে বিভিন্ন প্রসেস চালাতে পারবে। অনেকটা মাল্টি টাস্কিং ও মাল্টি ফোকাস এর মতো। এর জন্য একটা কাজ খুব দ্রুত সম্পন্ন করতে পারবে এই কম্পিউটার।

কোনো তথ্য আরও গভীর ও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে আউটপুট দিতে সক্ষম হবে কোয়ান্টাম কম্পিউটার। এর ফলে কোনো ডিএনএ এর ম্যাপিং ও তথ্য বিশ্লেষণ করে কোনো রোগের প্রতিষেধক বের করা সম্ভব হবে। আমাদের আক্ষেপ আরও ৮ থেকে ১০ বছর আগে গুগল বা অন্যান্য কোম্পানি 'কোয়ান্টাম কম্পিউটারের' প্রজেক্ট হাতে নিলে হয়তো 'কোভিড-১৯' এর একটা প্রতিষেধক আরও অনেক আগেই পেয়ে যেতাম।

কোয়ান্টাম কম্পিউটার ব্যবহার করে ডেটা এনক্রিপশনের নতুন পদ্ধতি বের করা যাবে৷ ফলে ডেটা নিরাপত্তা আরও জোরদার করা যাবে।

তবে আশার বিষয় হলো কোয়ান্টাম কম্পিউটার সাধারণ কম্পিউটারকে কখনো রিপ্লেস করবে না। কারণ অনেক কাজ আছে যা কোয়ান্টাম কম্পিউটার দিয়ে করা থেকে সাধারণ কম্পিউটার দিয়ে করা সুবিধাজনক হবে। কোয়ান্টাম কম্পিউটার অনেক ব্যয়বহুল। প্রযুক্তির খুব নিদারুণ ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। কোয়ান্টাম কম্পিউটার নিয়ে এক তুমুল প্রতিযোগিতা লেগে গেছে টেক জায়ান্টগুলোর মধ্যে। গুগলের ঝুলিতে আছে ক্ষমতাধর 'সিকোমা' যা ৫৩ কিউবিটস এর প্রসেসর সম্পন্ন। এই প্রজেক্টে কাজ করা বিজ্ঞানীদের দাবি, 'সিকোমা' একটি জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধান করেছে যা এখনকার সুপার কম্পিউটারগুলোর করতে প্রায় ১০,০০০ এরও বেশি বছর লাগত। অবশ্য আইবিএম গুগলের এই দাবি মানছে না। যুক্তরাষ্ট্র কোয়ান্টাম কম্পিউটিং-এ প্রায় ১.২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে। টেক খাতে এগিয়ে চীনও থেমে নেই। ৪০ কোটি ডলারের কোয়ান্টাম ল্যাব তৈরি করেছে তারা। বড়ো বড়ো বিজনেস ম্যাগনেটরা এখন কোয়ান্টাম কম্পিউটার-এ বিনিয়োগের দিকে ঝুঁকছেন।

এসব থেকে অনুমান করাই যাচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ঘটতে যাচ্ছে 'কোয়ান্টাম কম্পিউটার'-এর হাত ধরে। অবশ্য আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স-এর ওপর ভিত্তি করেও চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হবে। 'কোয়ান্টাম কম্পিউটার' আর 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স' মিলে চমৎকার ও একইসাথে ভয়ংকর কিছু হওয়ার কথা!

সব উদ্ভাবনই মানুষের উপকারের জন্য করা। কিন্তু এর মাঝেও এগুলোর অপব্যবহার মানুষের জন্য উদ্বেগজনক হয়ে দাঁড়ায়। কোয়ান্টাম কম্পিউটারও তার ব্যতিক্রম হবে না। এর অপব্যবহার মানুষের জন্য বয়ে আনতে পারে চরম দুর্ভোগ। কোয়ান্টাম কম্পিউটিং মানবজাতির জন্য উদ্বেগজনক হবে কী হবে না তা নির্ভর করছে এটি কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তার ওপর।
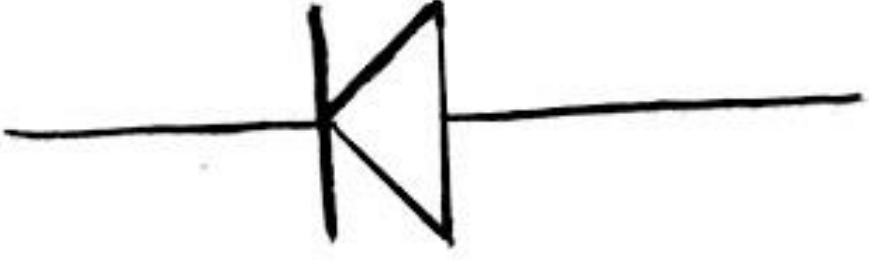
ডায়োড

কাইফ রহমান

মাহির ভাই, পানি ছাড়া আপনি বাঁচতে পারবেন?
না।
বায়ু ছাড়া আপনি বাঁচতে পারবেন?
না, আরে ভাই তুমি কি বুঝ না এগুলো ছাড়া বাঁচা যায় না?

একটু দাঁড়ান ভাই। লাস্ট কোয়েশ্চেন একটা। ডায়োড ছাড়া আপনি বাঁচতে পারবেন?
অ্যাহ! এইটা আবার কী? খায় না কি মাথায় দেয়?
এটা খায়ও না, মাথায়ও দেয়না। এইটা ছাড়া পৃথিবীর সব কম্পিউটার, মোবাইল এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস অচল। আমি তো মোবাইল কম্পিউটার ছাড়া বাঁচতে পারব না। এখন আপনি বলেন ডায়োড ছাড়া কি আপনি বাঁচতে পারবেন?অসম্ভব। একটা বিষয় খেয়াল করেছেন, বায়ু সমুদ্রে বাস করে যেরকম আমরা বায়ুকে ভুলে যাই, ঠিক তেমনই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ডায়োড ব্যবহার করা হলেও আমরা ডায়োড সম্পর্কে জানতে ভুলে যাই।

হুমম, আচ্ছা আমাকে ডায়োড সম্পর্কে একটু খুলে বলো।
একটু বড়ো হবে। ধৈর্য আছে আপনার?
হ্যাঁ, অবশ্যই। যেখানে কিছু জানা যাবে, শেখা যাবে সেখানে ধৈর্য এবং সময় দুটোই দেওয়া উচিত আমাদের।
একদম ঠিক বলেছেন।

এবার বলো, ডায়োড কাজ করে কীভাবে?
বলছি। তবে তার আগে সেমিকন্ডাক্টর, n-টাইপ, p-টাইপ ডোপিং সম্পর্কে জানতে হবে।
ঠিক আছে।
প্রথমে সেমিকন্ডাক্টর সম্পর্কে বলি। যে-সকল মৌলের পরমাণুতে স্বাভাবিক অবস্থায় মুক্ত ইলেকট্রন দেখা যায় না কিন্তু তাপ দিলে

ইলেকট্রন মুক্ত হয়, তাদের সেমিকন্ডাক্টর বলে। যেমন: সিলিকন, জার্মেনিয়াম ইত্যাদি। অর্থাৎ, সেমিকন্ডাক্টর হচ্ছে কন্ডাক্টর আর ইনসুলেটর এর মাঝামাঝি। কন্ডাক্টরে স্বাভাবিকভাবেই মুক্ত ইলেকট্রন থাকে, যেখানে ইনসুলেটরে মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না। ইনসুলেটর এর ভ্যালেন্স এবং কন্ডাকশন ব্যান্ড এর গ্যাপ সেমিকন্ডাক্টরের চেয়ে বেশি হওয়ায় ইনসুলেটরে সেমিকন্ডাক্টরের মতোই তাপ দেওয়া হলে ইলেকট্রন মুক্ত হয় না।

দাঁড়াও, দাঁড়াও ভ্যালেন্স ব্যান্ড, কন্ডাকশন ব্যান্ড মানে কী?
বলছি। পদার্থের পরমাণুর শেষ কক্ষপথে অবস্থিত সকল ইলেকট্রনের শক্তি একই স্তরে থাকে না। এরা ভিন্ন ভিন্ন স্তরে থাকে। তাই এদের শক্তির ভিন্ন ভিন্ন স্তরকে একটি ব্যান্ড বা পাল্লা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। অন্যদিকে যখন ইলেকট্রনসমূহ তাপ দেওয়ায় বা অন্য কোনো কারণে উত্তেজিত হয়ে মুক্ত হয় তখনও ওই সকল ইলেকট্রনের শক্তি একই স্তরে থাকে না। তাই তাদের শক্তির ভিন্ন ভিন্ন স্তরকে একটি ব্যান্ড বা পাল্লা দিয়ে নির্দেশ করা হয়। একেই কন্ডাকশন ব্যান্ড বলে। এখন ভ্যালেন্স ব্যান্ড আর কন্ডাকশন ব্যান্ড এর মধ্যে যে পার্থক্য তাকেই ব্যান্ড গ্যাপ বলে। এখন ইনসুলটরের ব্যান্ড গ্যাপ সেমিকন্ডাক্টরের চেয়ে অনেক বেশি হওয়ায়, যে তাপ দিলে সেমিকন্ডাক্টর কিছু ইলেকট্রনকে মুক্ত করে, সেই তাপে ইনসুলেটর ইলেকট্রন মুক্ত করতে পারে না।

বুঝলাম। ক্যারি অন।

হুমম। তা এখন ডায়োড তৈরি করতে n-টাইপ, p টাইপ ডোপিং করে জোড়া দিতে হয়। এখন আসি n-টাইপ, p টাইপ ডোপিং কী।

তার আগে বলো, ডোপিং কী এবং কেন করা হয়?
গুড কোয়েশ্চন। বোঝার সুবিধার্থে সিলিকনের n-টাইপ এবং p-টাইপ ডোপিং বিবেচনা করা যাক। আমরা জানি, একটি সিলিকন চারটি সিলিকনের সাথে ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এমতাবস্থায় যদি আমরা সিলিকনকে তাপ দিই তাহলে কিছু মুক্ত ইলেকট্রন আমরা পাব। কিন্তু আমাদের যখন কন্ডাক্টিভিটি বাড়ানোর জন্য বেশি পরিমাণ ইলেকট্রন লাগবে তখন আমরা কী করব? এই সমস্যা সমাধানের জন্যই ডোপিং করা হয়, যাকে খাঁটি বাংলায় 'ভেজাল মেশানো' বলা হয়। এখন প্রশ্ন হলো কী ভেজাল মেশানো হয়। এক্ষেত্রে এমন পদার্থের পরমাণু মেশানো হয় যাতে করে মুক্ত চার্জ পাওয়া যায়। কারণ আমরা জানি, মুক্ত চার্জের প্রবাহ বলতেই বিদ্যুৎ প্রবাহকে বোঝানো হয়।

আচ্ছা, এখন তুমি মুক্ত ইলেকট্রনের জায়গায় মুক্ত চার্জ বলছ কেন?
আপনার মনোযোগের প্রশংসা করতে হয়। একটু পরেই বুঝতে পারবেন। আমরা যদি চারটি সিলিকনের মাঝে একটি পঞ্চযোজী ফসফরাস পরমাণু আনি তাহলে ফসফরাস পরমাণুটি একটি ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে চারটি সিলিকনের সাথে চারটি ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে বন্ধন তৈরি করবে। অর্থাৎ, একটি ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা যদি কোটি কোটি ফসফরাস ডোপিং করি তাহলে কোটি কোটি মুক্ত ইলেকট্রন পেয়ে যাব খুব সহজেই। একে n-টাইপ ডোপিং বলে। কেন বলে সেটা পরে বলছি। তার আগে p-টাইপ ডোপিং কী সেটা জেনে নেওয়া যাক। যদি চারটি সিলিকনের মাঝে একটি ত্রিযোজী পরমাণু, যেমন বোরন আনা হয় তাহলে বোরনের তিনটি ইলেকট্রন তিনটি সিলিকনের তিনটি ইলেকট্রনের সাথে শেয়ার করবে। কিন্তু আরেকটি সিলিকনের একটি ইলেকট্রন যে শেয়ার করা হলো না। তাই একটি হোলের সৃষ্টি হবে যেটি পজিটিভ চার্জ ক্যারিয়ার।

হোল বিষয়টা বুঝলাম না। আরেকটু স্পষ্ট করলে ভালো হয়।
অবশ্যই। আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। হোল হচ্ছে একটি পরমাণুর নির্দিষ্ট স্থানে ইলেকট্রনের অনুপস্থিতি। যেমন - বোরন তার সর্বশেষ কক্ষপথের তিনটি ইলেকট্রন তিনটি সিলিকনের সাথে শেয়ার করেছে। ফলে চতুর্থ সিলিকনের একটি ইলেকট্রন কিন্তু শেয়ার হয়নি। এজন্য চতুর্থ সিলিকন আর বোরনের মাঝে ইলেকট্রনের অনুপস্থিতি দেখা যায়, একেই হোল বলে। যেহেতু হোল ইলেকট্রনের অনুপস্থিতি, তাই এর চার্জ পজিটিভ। এখন এই হোল পূরণের জন্য চতুর্থ সিলিকন থেকে একটি ইলেকট্রন আসে। যার ফলে ওই সিলিকনে আবার একটি ইলেকট্রনের ঘাটতি দেখা দেয়, তথা হোল দেখা যায়। ফলে আবারও পাশের সিলিকন থেকে ইলেকট্রন আসে হোল পূরণের জন্য এবং এই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। খুব ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় ইলেকট্রন হোলকে পূর্ণ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট দিকে চলাচল করছে ঠিকই, কিন্তু একটু ভিন্নভাবে যদি ভাবা হয় তাহলে বলা যায় ইলেকট্রনের বিপরীত দিকে হোল চলাচল করছে। অর্থাৎ, হোল এখানে পজিটিভ চার্জ ক্যারিয়ার। এরকম ডোপিংকে p-টাইপ ডোপিং বলা হয়।

আহ! এখন ক্লিয়ার হলাম। এবার বলো n-টাইপ, p-টাইপ ডোপিং বলা হয় কেন?

দেখেন, একটি বিষয় ভালো করে বুঝতে হবে এখানে যে, উভয় প্রকার ডোপিং-এ চার্জ ক্যারিয়ার হিসেবে ইলেকট্রন এবং হোল থাকে। কারণ সিলিকনকে যখন তাপ দিতে থাকা হয়, তখন সেটি কিন্তু ইলেকট্রন ছেড়ে দেয়। ফলে যেখানে ইলেকট্রন থাকার কথা ছিল সেখানে একটি হোল সৃষ্টি হয়। এই হোলকে পূর্ণ করার জন্য পাশের সিলিকন থেকে একটি ইলেকট্রন আসে এবং আবারও হোলের সৃষ্টি হয় এবং তা পূর্ণ করার জন্য পাশের সিলিকন থেকে ইলেকট্রন আসে। আর এভাবেই এই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। বিপরীতভাবে চিন্তা করলে হোলও মুভ করছে , তথা চার্জ ক্যারিয়ার হিসেবে কাজ করছে। এখন n-টাইপে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা, হোলের চেয়ে বেশি। কারণ ডোপিং-এর আগে থেকেই মুক্ত ইলেকট্রন এবং হোল ছিল। কিন্তু যখন পঞ্চযোজী ফসফরাস দিয়ে ডোপিং করা হয় তখন ফসফরাস একটি ইলেকট্রন ছেড়ে দেয়। এখন কোটি কোটি ফসফরাস ডোপিং করলে কোটি কোটি মুক্ত ইলেকট্রন পাওয়া যাবে। ফলে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা হোলের চেয়ে বেশি হবে। অন্যদিকে p-টাইপে হোলের সংখ্যা মুক্ত ইলেকট্রনের চেয়ে বেশি। কারণটা আপনি বলতে পারবেন?

হ্যাঁ। ডোপিং-এর আগে মুক্ত ইলেকট্রন এবং হোলের সংখ্যা সমান থাকে। কিন্তু যখন ত্রিযোজী বোরন ডোপিং করা হয় তখন একটি হোলের সৃষ্টি হয়। তাই যদি অসংখ্য বোরন ডোপিং করা হয়, তাহলে অসংখ্য হোলের সৃষ্টি হবে। ফলে হোলের সংখ্যা মুক্ত ইলেকট্রনের চেয়ে বেশি হবে। ঠিক হয়েছে না?

একদম ঠিক বলেছেন! সুতরাং, যেহেতু ইলেকট্রনের চার্জ নেগেটিভ, তাই যে ডোপিং-এ মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা হোলের থেকে বেশি তাকে n-type ডোপিং বলা হয়। অন্যদিকে, হোলের চার্জ পজিটিভ হওয়ায় যে ডোপিং এ হোলের সংখ্যা, মুক্ত ইলেকট্রন-এর চেয়ে বেশি তাকে p-টাইপ ডোপিং বলা হয়। বুঝলেন?

হ্যাঁ, তার মানে n-টাইপ ডোপিং-এর চার্জ নেগেটিভ এবং p-টাইপ ডোপিং-এর চার্জ পজিটিভ।

না, না। n-টাইপ ডোপিং-এর মুক্ত চার্জ নেগেটিভ এবং p-টাইপ ডোপিং-এর মুক্ত চার্জ পজিটিভ। সামগ্রিকভাবে চার্জ কিন্তু নিউট্রাল থাকে, ডোপিং করার পরেও।

কীভাবে?

দেখেন, যখন n-টাইপ ডোপিং-এ ফসফরাস একটি ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় তখন কিন্তু এটি পজিটিভ হয়ে যায়। অর্থাৎ, যতগুলো ফসফরাস একটি করে ইলেকট্রন ছেড়ে দিবে, ততগুলো ফসফরাসের পজিটিভ আয়নের সৃষ্টি হবে। অন্যদিকে, p-টাইপ ডোপিং-এ হোল সৃষ্টি হওয়ার পর বোরন একটি করে ইলেকট্রন গ্রহণ করে নেগেটিভ হয়ে যায়। অর্থাৎ, যতগুলো হোল সৃষ্টি হয় ততগুলো বোরনের নেগেটিভ আয়নের সৃষ্টি হয়। ফলে নেগেটিভ এবং পজিটিভ চার্জের সংখ্যা সমান হয়। আর এ কারণেই সামগ্রিকভাবে চার্জ নিউট্রাল থাকে।

ও, বুঝলাম।

এখন আসি ডায়োড বলতে কী বুঝায়। যদি সংজ্ঞা দিই তাহলে বিষয়টা এরকম দাঁড়ায় যে, ডায়োড একটি ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস যা দুই প্রান্ত বিশিষ্ট হয় এবং মূলত তড়িৎ প্রবাহকে একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। আমরা সিলিকন দিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করি। প্রথমত সিলিকনের একটি খণ্ডকে দুইটি প্রান্তে ভাগ করব। এর এক প্রান্ত n-টাইপ ডোপিং করা হবে এবং অন্য প্রান্ত p-টাইপ ডোপিং করা হবে। এখন আমরা জানি যে n-টাইপ ডোপিং এ চার্জ ক্যারিয়ার ইলেকট্রনের সংখ্যা, p-টাইপ ডোপিং-এর চেয়ে বেশি। তাই ব্যাপন প্রক্রিয়ায় মুক্ত ইলেকট্রন, n-টাইপ থেকে p-টাইপের দিকে যাবে। অন্যদিকে p-টাইপ ডোপিং-এ হোলের সংখ্যা, n-টাইপের চেয়ে বেশি হওয়ায় ব্যাপন প্রক্রিয়ায় হোল, p-টাইপ থেকে n-টাইপের দিকে যাবে। ইলেকট্রন এবং হোল যখন যথাক্রমে p-টাইপ ও n-টাইপ ডোপিং-এর খণ্ডে যাবে, তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটবে। n-টাইপ ও p-টাইপের সংযোগস্থলের আশেপাশের ইলেকট্রন ও হোলগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ-ইলেকট্রন যখন সংযোগস্থল পার করে p-টাইপে প্রবেশ করবে তখন সেখানকার হোলগুলোর সাথে মিলে ধ্বংস করে দিবে। এখন একটি মজার ঘটনা ঘটবে। এতক্ষণ সংযোগস্থলের কাছাকাছি p-টাইপ ডোপিং-এর স্থির নেগেটিভ বোরন আয়নগুলো নিজেদের চার্জের প্রভাব দেখাতে পারছিল না। কারণ-মুক্ত হোলগুলোর পজিটিভ চার্জ। কিন্তু যখনই n-টাইপ থেকে আসা ইলেকট্রনগুলো সংযোগস্থলের কাছাকাছি p-টাইপ ডোপিং-এর হোলগুলোকে ধ্বংস করে দিলো তখন সংযোগস্থলের কাছাকাছি

নেগেটিভ বোরন আয়নগুলো সক্রিয় হয়ে উঠবে, তথা নিজেদের প্রভাব দেখাতে পারবে।

কীভাবে?

যখন n-টাইপ থেকে ইলেকট্রনগুলো p-টাইপের দিকে আসতে যাবে তখন নেগেটিভ বোরনের ইলেকট্রিক ফিল্ডের কারণে বিকর্ষিত হবে। ফলে p-টাইপের দিকে ইলেকট্রন আর যেতে পারবে না। একইভাবে সংযোগস্থলের কাছাকাছি n-টাইপের ইলেকট্রনগুলো হোল দ্বারা ধ্বংস হওয়ার পর সংযোগস্থলের কাছাকাছি n-টাইপের পজিটিভ ফসফরাস আয়ন, p-টাইপ থেকে n-টাইপের দিকে হোল আসতে বাধা দিবে , তথা বিকর্ষণ করবে। এখন এই সংযোগস্থলের কাছাকাছি উভয় পাশেই যে বাধা প্রদানকারী অঞ্চলের সৃষ্টি হয়, তাকে ডিপ্লেশন লেয়ার বলে। এখন এই ডায়োডের n-টাইপ ডোপিং-এর সাথে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত এবং p-টাইপ ডোপিং-এর সাথে ব্যাটারীর পজিটিভ প্রান্ত যোগ করলে, ব্যাটারীর নেগেটিভ প্রান্ত n-টাইপ ডোপিং-এর মুক্ত ইলেকট্রনগুলোকে বিকর্ষণ এর কারণে একটি ধাক্কা দিবে। যার ফলে মুক্ত ইলেকট্রনগুলো ডিপ্লেশন লেয়ার পার করে p-টাইপ ডোপিং-এ প্রবেশ করবে। ফলে ডিপ্লেশন লেয়ার চিকন হয়ে যাবে। আবার ব্যাটারীর পজিটিভ প্রান্ত এই মুক্ত ইলেকট্রনগুলোকে আকর্ষণ করবে। এভাবে ইলেকট্রনের প্রবাহ সৃষ্টি হবে। তদ্রুপভাবে ব্যাটারীর পজিটিভ প্রান্ত হোলকে বিকর্ষণ করবে। ফলে হোল ডিপ্লেশন লেয়ার পার করে n-টাইপ ডোপিং-এ প্রবেশ করবে এবং ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত দ্বারা আকর্ষিত হবে। এভাবে হোলের প্রবাহ দেখা যাবে। এখন উভয়ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে চার্জের প্রবাহ হচ্ছে। ফলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে। একে ফরওয়ার্ড বায়াস বলা হয়। কারণ, মুক্ত চার্জগুলো সামনের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে ব্যাটারির ভোল্টেজ অবশ্যই ডিপ্লেশন লেয়ারের ইলেকট্রিক ফিল্ড এর চেয়ে বেশি হতে হবে। তা না হলে মুক্ত চার্জগুলো ডিপ্লেশন লেয়ার পার করতে পারবে না।

তাহলে কি বিদ্যুৎ দুই দিকে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে না?

না, না! বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে যেদিকে হোল প্রবাহিত হচ্ছে।

কেন? ইলেকট্রনের দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে না কেন?

দেখেন, যখন ইলেকট্রন সামনের দিকে এগুচ্ছে তখন কিন্তু পেছনের দিক পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে। এভাবে ইলেকট্রন সামনের দিকে আগাতে আগাতে পিছনের দিকে ক্রমান্বয়ে পজিটিভ চার্জ সৃষ্টি করছে। তাহলে বলা যায় ইলেকট্রনের প্রবাহের বিপরীত দিকে পজিটিভ চার্জের প্রবাহ হচ্ছে। মূলকথা, ইলেকট্রিক্যালি একটি নেগেটিভ চার্জ বাম থেকে ডানে যাওয়া যে কথা, একটি পজিটিভ চার্জের ডান থেকে বামে যাওয়া সেই একই কথা। যখন বিদ্যুৎ আবিষ্কার হয়, তখন কেউ জানত না যে ইলেকট্রনের প্রবাহের কারণেই বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়। তখন মনে করা হতো পজিটিভ চার্জের প্রবাহই বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক। এজন্যই বলা হয়ে থাকে ইলেকট্রন প্রবাহের দিক প্রচলিত বিদ্যুৎ প্রবাহের দিকের বিপরীত। এজন্য হোল যে দিকে প্রবাহিত হয় সেই দিকটিকেই বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক বলা হয়। যদি বিদ্যুৎ আবিষ্কারের সময়ই সবাই জানত যে ইলেকট্রন প্রবাহের কারণেই বিদ্যুৎ প্রবাহ হয়, তাহলে ইলেকট্রন প্রবাহের দিককেই বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক বলা হতো। বুঝলেন?

হ্যাঁ, ফুললি ক্লিয়ারড।

তাহলে একটা প্রশ্ন করি। বলেন তো মূল কারেন্ট কিসের সমান হবে?

হোল প্রবাহের কারণে তৈরি হওয়া কারেন্টের সমান হবে।

হলো না। উত্তর হচ্ছে হোল এবং ইলেকট্রনের কারণে তৈরি হওয়া কারেন্ট।

কীভাবে?

হোল এবং ইলেকট্রন বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়। এখন ধরুন, পাঁচটি হোল বাম থেকে ডানে এবং পাঁচটি ইলেকট্রন ডান থেকে বামে প্রবাহিত হচ্ছে। একটু আগেই বলেছি একটি ইলেকট্রনের ডান থেকে বামে যাওয়া যে কথা, একটি পজিটিভ চার্জের বাম থেকে ডানে যাওয়া একই কথা।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো দশটি পজিটিভ চার্জ বাম থেকে ডানে গেল। প্রথম পাঁচটি পজিটিভ চার্জ হচ্ছে হোলের এবং পরের পাঁচটি পজিটিভ চার্জ সৃষ্টি হয়েছে পাঁচটি ইলেকট্রনের ডান থেকে বামে যাওয়ার কারণে। তাই মোট কারেন্ট হোল এবং ইলেকট্রনের কারণে সৃষ্ট হওয়া কারেন্টের সমান হবে। আশা করি এবার ফুললি ক্লিয়ার্ড।

হ্যাঁ।

এবার আসি যদি n-type-কে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্তের সাথে এবং p-টাইপকে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্তের সাথে যোগ করা হয় তাহলে কী হবে।

এক্ষেত্রে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত মুক্ত ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করবে এবং নেগেটিভ প্রান্ত হোলকে আকর্ষণ করবে। ফলে ডিপ্লেশন লেয়ার আরও বড়ো হয়ে যাবে এবং বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না। যেহেতু মুক্ত চার্জ বিপরীত দিকে পিছনের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, তাই একে রিভার্স বায়াস বলা হয়। এখন আপনাকে একটি প্রশ্ন করি। বলেন তো ডিপ্লেশন লেয়ার বড় হওয়ার কারণ কী?

মুক্ত চার্জগুলো ব্যাটারির উভয় প্রান্তে আকর্ষিত হলে, একটি বড়ো অঞ্চলজুড়ে স্থির ফসফরাস এবং বোরন আয়ন উন্মুক্ত হয়ে যাবে। কারণ এখন তাদের নিষ্ক্রিয় রাখার জন্য কোনো ইলেকট্রন বা হোল নেই। ঠিক বললাম?
একদম। ডায়োড এভাবেই কাজ করে।

আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন যে এভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য এত কাহিনি না করে সরাসরি কন্ডাক্টর ব্যবহার করলেই তো হয়?
আমি এই প্রশ্নটার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। দেখেন কপার, সিলভার ইত্যাদি কন্ডাক্টরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুক্ত ইলেকট্রন পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট পরিমাণ কন্ডাক্টিভিটি পাওয়া যাবে। এখানে আপনার হাতে কোনো কন্ট্রোল থাকবে না। কিন্তু আপনি যদি ডোপিং বেশি করেন তাহলে কন্ডাক্টিভিটি বেশি হবে এবং কম করালে কম হবে। এর মানে হচ্ছে আপনার হাতে কন্ট্রোল আছে। মোবাইল, কম্পিউটার ইত্যাদি যন্ত্রে কারেন্টের কন্ট্রোল রাখা খুবই দরকার। আপনি বলতে পারেন যে তাপ দিলে তো কন্ডাক্টরেরও কন্ডাক্টিভিটি বাড়ে। কিন্তু এই তাপ দিলে তো আপনার মোবাইল কম্পিউটার আর বাঁচবে না। আবার যদি কন্ডাক্টিভিটি কমানো লাগে, তাহলে কী করবেন। এজন্যই সেমিকন্ডাক্টর ব্যবহার করা হয় এবং এত কাহিনি করা হয়।
একদম ঠিক বলেছ তো। এভাবে তো ভেবে দেখিনি। তুমি ভাই খুব ভালো বোঝাও। এত কিছু জানো কীভাবে?
এটা কে আপনি এত কিছু ভাবছেন! এটা এমন কিছুই না। এগুলো আমি ইন্টারের বই পড়ে আর ইউটিউবে অন্যরকম পাঠশালার সোহাগ ভাইয়ের সেমিকন্ডাক্টর & ইলেকট্রনিক্স প্লেলিস্ট দেখে শিখেছি।

ওহ! খুব ভালো। বিজ্ঞানের প্রতি তোমার ভালোবাসা দেখে আমি অনুপ্রাণিত হলাম।
ইটস মাই প্লেজার। আপনি অনেক ধৈর্যশীল। জানার প্রতি আপনার আগ্রহ দেখে আমি মুগ্ধ। যা-হোক, আজ উঠি। অন্য একদিন ট্রানজিস্টর কী সেটা বলবনি। ডায়োড ব্যবহার করেই ট্রানজিস্টর তৈরি করা হয়। এই ট্রানজিস্টর সব মোবাইল, কম্পিউটার ইত্যাদি ইলেকট্রনিক ডিভাইসে ব্যবহার করা হয়। তাই বলতে পারেন ট্রানজিস্টরের অপর নাম জীবন।
হ্যাঁ, তা আর বলতে। অপেক্ষায় থাকলাম।
আচ্ছা, আসি তাহলে।
ওকে বাই।

মাইক্রোসফট, অ্যাপল, অ্যামাজন, এইচপির মতো বড়ো বড়ো টেক জায়ান্টগুলোর শুরু হয় গ্যারেজে!

গ্রহাণুদের গল্প ২

হৃদয় হক

"If the Earth gets hit by an asteroid, it's game over. It's control-alt-delete for civilization." - **Bill Nye**

গ্রহাণুদের গল্প সিরিজের দ্বিতীয় পর্বে স্বাগত!

গ্রহাণুর কথা বললেই আমাদের মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষপথের মাঝে থাকা একজোট মহাজাগতিক বস্তুর কথা মনে পড়ে যায় যারা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ঘোরে। আর এই জোটকে বলা হয় 'গ্রহাণু-বেষ্টনি', যাদের উৎপত্তি নিয়ে আমি গত পর্বে আলোচনা করেছি। যা-হোক, এখন আমরা সেই বেষ্টনির ভেতরে ঢুকব, একটু বেশিই ভেতরে।

বেষ্টনির অন্তরে

১৮৬৬ সালের কথা, ডেনিয়েল ক্রিকউড নামের এক জ্যোতির্বিদ এই গ্রহাণু বেষ্টনির ভেতরে নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় কিছু ফাঁক দেখতে পেলেন। এরপর এই ফাঁকা জায়গা নিয়ে তিনি তদন্ত শুরু করলেন। আর তদন্ত শেষে তিনি যে রিপোর্ট দিলেন তাই পরবর্তীতে সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। দেখা যাক তিনি কী পেলেন। ক্রিকউড এর মতে, এই গ্যাপের প্রধান আসামি হলো আমাদের বড়োভাই বৃহস্পতি। এই গ্যাপের মধ্যে থাকা গ্রহাণুদের বৃহস্পতি তার মাধ্যাকর্ষণ বলের দাদাগিরি দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছেন। বৃহস্পতির সাথে যেসব গ্রহাণুদের সূর্যকে প্রদক্ষিণের সম্পর্ক নির্দিষ্ট সাধারণ ভগ্নাংশ বা অনুপাতে ছিল তাদের সবকয়টাকে তাড়িয়ে দিয়ে বৃহস্পতি এই ফাঁকা জায়গা তৈরি করে নেয়। এজন্য এ জায়গাগুলো অস্থিতিশীল। আর এই অত্যাচার সইতে না পেরে গ্রহাণুগুলো জায়গাটা খালি করে চলে যায় তুলনামূলক স্থিতিশীল জায়গায়। অর্থাৎ, এরা কক্ষপথ পরিবর্তন করে ফেলে। ব্যাপারটাকে আরও ভালোভাবে বোঝা যাক।

ধরি, একটা গ্রহাণু আছে। এখন আমাদের বড়োভাই বৃহস্পতি সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে যে সময় নেয়, সেই সময়ে উক্ত গ্রহাণুটা সূর্যের চারদিকে তিন বার ঘুরে আসে। ফলে গ্রহাণুটি বৃহস্পতির প্রবল মাধ্যাকর্ষণ বলের কবলে পরে, তাও একবার না, তিন বার ঘোরার সময় ৩ বার। আর একে অনুপাতে প্রকাশ করলে হয় ৩:১। এ ঘটনাকে বলা হয় রেজোন্যান্স (resonance)। আর এভাবে প্রায় ১ মিলিয়ন বছর ধাক্কা খেতে খেতে গ্রহাণুগুলো তাদের গতিপথ পরিবর্তন করে। এরা অবশ্য আরও বেশি উপবৃত্তাকার পথ ধারণ করে। তবে ফলস্বরূপ সেখানটায় থেকে যায় খালি জায়গা। আর এই খালি জায়গাকে বলা হয় ক্রিকউড গ্যাপ (Kirkwood Gap)। এসব গ্যাপের মধ্যে ৪:১ এর র‍্যাজোনেন্সটা বেশ শক্তিশালী। বুঝতেই পারছেন, বৃহস্পতি সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে এখানের গ্রহাণুগুলা সূর্যের চারদিকে চার বার ঘুরে আসে পারত। যা-হোক, ৪:১ আর ৩:১ ছাড়াও, ৫:২, ৭:৩, ২:১ সহ কিছু ছোটো ছোটো ক্রিকউড গ্যাপ আছে। ৩:১ এর নাম হেস্টিয়া (Hestia), আর ২:১ এর নাম হেকুবা (Hecuba)।

ক্রিকউড গ্যাপকে অনেকসময় ৩টা জোনেও ভাগ করা হয়।

জোন-১: অধিকতর অন্তবর্তী গ্রহাণু-বেষ্টনি (The inner asteroid belt), এর সীমানা হল ৪:১ রেজোনেন্স থেকে ৩:১ রেজোন্যান্স পর্যন্ত।

জোন-২: মধ্যবর্তী গ্রহাণু-বেষ্টনি (The middle asteroid belt), এর সীমানা জোন-১ এর শেষ থেকে ৫:২ রেজোন্যান্স পর্যন্ত।

জোন-৩: বহিঃস্থ গ্রহাণু-বেষ্টনি (The outer asteroid belt), এর সীমানা জোন-২ এর শেষ থেকে ২:১ রেজোন্যান্স পর্যন্ত।

আরেকটা কথা, অনেকেই হয়ত নানা মুভিতে দেখেছেন যে নায়ক ভিলেনকে আক্রমণ করার জন্য মহাকাশে স্পেইসশিপ নিয়ে এই গ্রহাণু-বেষ্টনির মধ্য দিয়ে বড়ো বড়ো গ্রহাণুর ছোটো ছোটো ফাঁকফোকর দিয়ে বেড়িয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবে এই বেষ্টনির অধিকাংশই ফাঁকা। আর এরা একে অপর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত যে, আপনি যদি একটি গ্রহাণুর ওপর দাঁড়ান তাহলে সেখান থেকে আপনার চোখ যদি সবচেয়ে ভালোও হয় তাও খালি চোখে অন্য একটি গ্রহাণুর দেখা পাওয়া মুশকিল। আর এরা সংখ্যায় বেশি হলেও মোটেও অত বড় নয়। আপনি যদি সব গ্রহাণুগুলো একত্র করেন তাহলে তার আকার আমাদের চাঁদের চেয়ে ছোটো হবে। গ্রহাণু-বেষ্টনির মোট ভর চাঁদের ৪% যা প্লুটোর থেকেও কম। এরা যে মঙ্গল থেকেও কম ভরের তা এমনেতেই বোঝা যায়, তা নাহলে এরা মঙ্গলের চলার পথে বেশ অসুবিধা ঘটাত, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

যা-হোক, আগামি ব্যাঙাচিতে পরবর্তী পর্ব নিয়ে কথা বলব। কাকে নিয়ে? কী নিয়ে? তা পরের পর্বেই দেখা যাক।

মাইক্রোসফটের তৈরি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের আসল নাম ছিল ইন্টারফেস ম্যানেজার।

আসছে নতুন ইন্টারনেট

মোহাম্মদ নওয়াজ উদ্দিন

এখনো অনেক লোক আছে যারা ইন্টারনেট বলতে শুধু ফেইসবুক আর গুগলকেই বুঝে। আমাদের প্রায় সকলেরই গুগল ও ফেইসবুক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। আর এসব অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য আমাদের নিজেদের কিছু ব্যক্তিগত তথ্য ফেইসবুক ও গুগলকে দিতে হয়, যেমন - আমাদের নাম, ঠিকানা, জন্মতারিখ ইত্যাদি ইত্যাদি। আর তারা তাদের সেবার জন্য যেসব মোবাইল অ্যাপস আছে সেই মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করার জন্য আমাদের মিডিয়া, জিপিএস লোকেশন, ক্যামরা ও মাইক্রোফোন ইত্যাদি অ্যাক্সেস তাদের দিতে হয়। মিডিয়া অ্যাক্সেসের মাধ্যমে তারা চাইলে আমাদের মোবাইলের সমস্ত অডিয়ো, ভিডিয়ো এবং ফটো তারা দেখতে ও সংগ্রহ করতে পারে। লোকেশন অ্যাক্সেসের মাধ্যমে তারা আমাদের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারে এবং ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন অ্যাক্সেসের মাধ্যমে তারা আমাদের না জানিয়ে আমাদের দেখতে ও শুনতে পারে। এককথায় বলতে গেলে, আমাদের মোবাইলের আংশিক নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতেই থাকে। এখন হয়তো বলতে পারেন এমনটা তো সব অ্যাপসই পারে, তবে শুধু গুগল আর ফেইসবুকের কথা কেন বলছি? তো সেই বিষয়ে একটু পরে আসছি। তো কখনো কি একটা বিষয় খেয়াল করে দেখেছেন আমাদের এতসব তথ্য দিয়ে তারা কী কী করতে পারে? অথবা আমাদের তথ্য তাদের কাছে কতটা নিরাপদ?

ফেইসবুক, গুগলের মতো বড়ো বড়ো টেক জায়ান্টদের আয়ের মূল উৎসই হলো বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন দেখানোর জন্য Google ও Facebook-এ দেওয়া আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য বিজ্ঞাপনদাতারা ব্যবহার করে। তাছাড়া পৃথিবীতে ৯০% ইন্টারনেট ব্যবহারকারী গুগল সার্চ ইউজ করে এবং YouTube, Gmail, Play Store এর মতো সেবা ব্যবহার করে। এগুলা এখন এমন হয়ে হয়ে গেছে যে এগুলো না থাকলে মোবাইল আছে বলে মনেই হয় না।

এখন আসি কেন শুধু Facebook আর Google এর কথাই বলছি? এমনটা নয় যে শুধু Facebook আর Google ইন্টারনেট এককেন্দ্রিক করে নিয়েছে এবং ইউজারের পার্সোনাল ডেটা ইউজ করে। বিষয়টা সব টেক জায়ান্টের ব্যাপারে খাটে। তবে আগেই বলেছিলাম অনেকের কাছে ইন্টারনেট মানেই হলো গুগল ও ফেইসবুক। তার হয়তো বেশ অনেক কারণও রয়েছে, যেমন -
একজন সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী হিসেবে ইন্টারনেটে আমাদের কী কাজ রয়েছে?
বন্ধু/বান্ধবদের সাথে যোগাযোগ রাখা, বিনোদনের জন্য ছবি/ভিডিয়ো দেখা, নিজের মতামত অন্যদের সাথে শেয়ার করা, কোনো তথ্য অনুসন্ধান করা ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এসবের জন্য গুগল ও ফেইসবুক হলো সবচেয়ে সহজ ও সেরা মাধ্যম সেটা আমাদের মানতেই হবে। কিন্তু তার মানে এই না তার জন্য তারা আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য যথেচ্ছা ব্যবহার করবে এবং ইন্টারনেটের এই বিশাল ক্ষেত্রকে এককেন্দ্রিক করে রাখবে।

এইসবের মধ্যেও ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন সুখবর এসছে। আর তা হলো "আসছে নতুন ইন্টারনেট Inrupt"।

তো কী এই inrupt?

Inrupt হচ্ছে এমন একটা প্রযুক্তি যার মাধ্যমে ব্যবহারকারী তার নিজের তথ্যের নিয়ন্ত্রণ নিজেই করতে পারবে। আর এর জন্য হোস্ট হবে ইউজার কম্পিউটারই। অর্থাৎ, ব্যবহারকারীর তথ্য তার কম্পিউটারেই সেইভ থাকবে এবং প্রত্যেক ব্যবহারকারীর থাকবে আলাদা আলাদা Solid ID ও Solid PodsI আর Solid Pods এর তথ্য হবে পাবলিক।

আর এই inrupt এর স্বপ্নদ্রষ্টা হলেন Berners-Lee, আর এই ব্যক্তিটিই হলেন নেভিগেশন সিস্টেম world wide web (WWW) এর নির্মাতা। অনেকে তাকে ইন্টারনেটের জনকও বলে থাকে। Facebook, Google-দের মতো টেক-জায়ান্টদের এই অধিপত্যে তার ভালো লাগে না, তাই তিনি চান এটাকে নতুন করে সাজাতে। সেই হিসাবে কাজও শুরু হয়ে গেছে। এখন শুধু অপেক্ষার পালা।

সর্বোপরি এটা বলা যায় যে, বড়ো বড়ো টেক জায়ান্টরা Berners Lee এর নতুন ইন্টারনেটকে স্বাগত জানাবে না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে আমাদের মতো সাধারণত ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের জন্য এটা খুশির খবর বইকি।

১৯৬৪ সালে Doug Engelbart এর তৈরি করা পৃথিবীর প্রথম মাউস ছিল কাঠের।

মিয়াও! বিড়াল ও রসায়ন

মার্জিয়া মেহজাবিন তন্বি

আজকে আলোচনা করা যাক বিড়ালের রসায়ন নিয়ে। না, বিড়ালকে গলিয়ে কোনো রসায়ন না। এইতো, কেন বিড়ালে কিছু মানুষের অ্যালার্জি থাকে, কেন বিড়ালের মূত্র দুর্গন্ধযুক্ত হয়, কেন বিড়াল catnip গাছের পাতা পছন্দ করে, এসবের পেছনের রসায়ন নিয়ে আলোচনা হবে।

যেসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে:

১। কেন বিড়ালে কিছু মানুষের অ্যালার্জি থাকে?
২। কেন বিড়ালের মূত্র দুর্গন্ধযুক্ত হয়?
৩। কেন বিড়াল catnip গাছের পাতা পছন্দ করে?*

আমি লেখাটির স্বার্থে বিড়ালের ওপর পর্যবেক্ষণ করে কিছু বিষয় লক্ষ করেছি।
১। বিড়ালে আসলেই কিছু মানুষের অ্যালার্জি আছে,
২। বিড়ালের মূত্র আসলেই দুর্গন্ধ হয়ে যায় কিছুক্ষণ পরেই, বিশেষ করে কোনো সলিড ফ্লোরের ওপর যেখানে শোষিত হয় না,
৩। আর catnip গাছ খুঁজে নিয়ে এটাও দেখেছি যে বিড়াল আসলেই catnip খুবই পছন্দ করে। তাছাড়া রিসার্চ হিসেবে প্রায়

৬০–৭০ শতাংশ বিড়ালই মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখায় catnip এর বিপরীতে।
৪। বিড়ালের মূত্রে কমপক্ষে ২টা যৌগ আছে যেগুলোর নামকরণের উৎস বিড়াল।

বিড়ালে অ্যালার্জি

আপনার যদি বিড়ালে অ্যালার্জি থাকে তাহলে আপনি একা নন। বিভিন্ন দেশের জরিপে দেখা গেছে যে, সাধারণ জনসংখ্যার ১০ থেকে ৩০ শতাংশের বিড়ালে অ্যালার্জি থাকে। World Health Organisation (WHO) এর তথ্য মতে, ৮ ধরনের অ্যালার্জি শনাক্ত করা গেছে যেগুলোর জন্য বিড়াল দায়ী। আর এদেরকে Fel d 1 থেকে Fel d 8 হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। Fel d হলো ল্যাটিন শব্দ 'Felis domesticus'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ যার ইংরেজি অর্থ 'domestic cat' বা বাংলাতে 'পোষা বিড়াল'।
এই ৮ ধরনের বিড়াল অ্যালার্জির মধ্যে Fed d 1 হলো প্রাথমিক পর্যায়ের এবং সবচেয়ে বেশি কমন অ্যালার্জি। ৬০ থেকে ৯০ শতাংশের ক্ষেত্রেই এটি দেখা যায়। Fed d 1 বিড়ালের ত্বকে তেল উৎপাদনকারী গ্রন্থি দ্বারা উৎপাদিত একটি সিক্রেটোগ্লোবিন (secretoglobin) প্রোটিন থাকে। এটা তাদের চামড়া, পশম এবং লালায় পাওয়া যায়, যদিও এর সঠিক জৈবিক ফাংশন এখনো অজানা।

"Secretoglobin (SGCB) হলো এ ধরনের ছোটো, alpha-helical, disulfide linked, dimeric প্রোটিন।"

বিড়ালের মৃত চামড়া যেগুলো মাইক্রোস্কোপিক পর্যায়ের সেগুলো বিড়ালের হাঁটাচলার মাধ্যমে খুব সহজেই আশেপাশে ছড়ায়। এর ফলে বিড়াল যেখানেই যাক না কেন Fel d 1 খুব সহজেই ছড়াতে পারে। আর ছড়ানোর সময় খুব ভালোমতোই ছড়ায়। আমেরিকার বাড়িগুলোতে এক জরিপে দেখা গেছে যে ৯৯% বাড়িতেই Fel d 1 এর সন্ধান মিলেছে।

Fel d 1 নিঃশ্বাসের মাধ্যমে নিলে অ্যালার্জির সমস্যা শুরু হয়। মূলত যাদের অ্যালার্জি আছে তারা একটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পাঠিয়ে দেয়। এতে Fel d 1 এর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে। এই অ্যান্টিবডি মাস্ট কোষ (mast cells) থেকে হিস্টামিন রিলিজ করে। যার ফলস্বরূপ হাঁচি সহ বিভিন্ন অ্যালার্জির লক্ষণ তৈরি করে।

Mast cell: মাস্ট কোষ (mastocyte বা এক ধরনের labrocyte নামেও ডাকা হয়) হলো আমাদের দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য এক ধরনের টিস্যু কোষ।

পুরুষ বিড়াল মেয়ে বিড়াল থেকে বেশি Fel d 1 উৎপন্ন করে। আবার নিউটারড পুরুষ বিড়াল (অণ্ডকোষ কেটে ফেলা পুরুষ বিড়াল) মেয়ে বিড়ালের তুলনায় কিছু মাত্রায় কম উৎপাদন করে। কিন্তু যতই কম উৎপন্ন করুন না কেন, সেটা অ্যালার্জির লক্ষণ প্রকাশের জন্য পর্যাপ্ত। তো এখানে সেটা যুক্তিসঙ্গতভাবে খুব একটা পার্থক্য গড়ে দেয় না। যদিও প্রায়শই বলা হয়ে থাকে যে বিড়ালের কয়েকটি প্রজাতি কম Fel d 1 তৈরি করতে পারে, কিন্তু এ কথার সঙ্গে শক্ত কোনো প্রমাণ নেই।

বিড়ালের মূত্রের দুর্গন্ধ

Fel d 1-8 নাকের মধ্যে প্রবেশ করলে কোনো গন্ধ না পেলেও বিড়ালের মূত্রের ক্ষেত্রে ঠিকই পাবেন।

আর এটির জন্যও সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক ব্যাখ্যা বিদ্যমান। বিড়ালের তাজা মূত্র বা সদ্য বিসর্জন দিয়েছে এমত অবস্থায় আসলে তেমন গন্ধ নেই। কিন্তু সেটা তো আর বেশি সময় তাজা থাকে না। ব্যাকটেরিয়ারা তো আর তাদের কাজ থামিয়ে রাখে না। তো ব্যাকটেরিয়া সেই মূত্রের রাসায়নিক উপাদানগুলি ভেঙে সেই দুর্গন্ধযুক্ত যৌগগুলি উৎপন্ন করে।

এই দুর্গন্ধের চাবিকাঠি হলো বিড়ালের মূত্রে পাওয়া একটি বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিড, যার নাম ফেলিনিন (felinine), IUPAC নাম: (2R)-2-Amino-3-(3-hydroxy-1,1-dimethylpropyl)thiopropanoic acid।
তো তারপর এনজাইম ফেলিনিনকে ভেঙে ফেলে, ভাঙনে অ্যামোনিয়া, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং MMB (3-methyl-3-sulfanylbutan-1-ol) উৎপন্ন হয়। অ্যামোনিয়া তো তীব্র গন্ধ থাকার জন্য বিখ্যাত সেটা আমরা জানি, কিন্তু সালফার বহনকারী যৌগ অর্থাৎ, MMB বিড়ালের মূত্রের দুর্গন্ধের জন্য বড়ো ভূমিকা পালন করে।

ফেলিনিন শুধু একা ভূমিকা পালন করে না। বিড়ালের মূত্রে 4-methyl-4-sulfanylpentan-2-one নামের আরেকটি যৌগ পাওয়া যায়, যেটাও অনেক ক্ষেত্রে দায়ী। যৌগটিকে সাধারণত 'cat ketone' নামে সম্বোধন করা হয়। তবে বিড়ালের মূত্র ছাড়াও এ যৌগটি অন্য জায়গায় পাওয়া যায়।

এখন একটা ট্রিক বলি, যদি আপনার বাসাতে পোষা বিড়াল থাকে এবং সেটা যদি যেখানে-সেখানে মূত্র বিসর্জন করে তাহলে enzyme-based cleaner ব্যবহার করতে পারেন। এতে গন্ধও দূর হবে আর বিড়াল ওখানে আর যাবে না মূত্র বিসর্জন দিতে।

ক্যাটনিপ

এখন কথা বলা যাক, কেন বিড়াল ক্যাটনিপ (catnip) খুব পছন্দ করে। এটা আসলে বড়ো একটা আলোচনা, এটা নিয়ে অন্য একদিন বিশদ আলোচনা করা যাবে। তবে সংক্ষেপে বলতে গেলে নেপিটাল্যাকটোন (nepetalactone) নামের একটি যৌগ ক্যাটনিপে পাওয়া যায়, যেটি বিড়ালের ওপর এরকম অদ্ভুত প্রভাবের কারণ ঘটায়। মূলত যৌগটি নাসিকার (nasal tissue) রিসেপ্টরের সাথে যুক্ত হয়ে মস্তিষ্কে এমন একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যা প্রাকৃতিক সেক্স ফেরোমোনের জন্য তৈরি প্রতিক্রিয়ার সদৃশ্য। Olfactory fatigue বা noseblindness অবস্থা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে।

তো সে হিসেবে ক্যাটনিপের প্রতিক্রিয়া মাত্র ১০–১৫ মিনিট সময়টুকুই থাকে, যেহেতু ১০–১৫ মিনিট পরেই olfactory fatigue অবস্থা তৈরি হয়। আর ক্যাটনিপ ৭০ শতাংশ বিড়ালের ওপর কার্যকরী প্রভাব ফেলতে পারে। আর ছোটো বিড়ালের বাচ্চাদের ওপর প্রভাব ফেলে না যেহেতু তাদের মস্তিষ্ক সেক্স ফেরোমোনের প্রতিক্রিয়া তৈরি পর্যন্ত ডেভেলপ হয়নি।

ক্যাটনিপই কিন্তু একমাত্র উদ্ভিদ না যেটা বিড়ালদের খুব পছন্দ। এক গবেষণায় দেখা গেছে যে এমন আরও অনেক রয়েছে যার ফলে একই প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। এর মধ্যে valerian নামক গুল্মের শিকড় এবং পাতা, silver vine (যাকে cat powder-ও বলা হয়) এবং tatarian honeysuckle অন্যতম। এ সকল উদ্ভিদে নেপিটাল্যাকটোন (nepetalactone) যৌগের উপস্থিতি নেই, তবে অ্যাক্টিনিডিনের (actinidine) অনুরূপ অণু রয়েছে যা একই ধরনের প্রভাব তৈরি করে।

ক্যাটনিপ পাতার প্রতি বিড়ালের অসাধারণ এবং মজাদার প্রতিক্রিয়া ভিডিয়ো দেখতে ভিজিট করুন

https://go.bangachi.com/I8CHEM
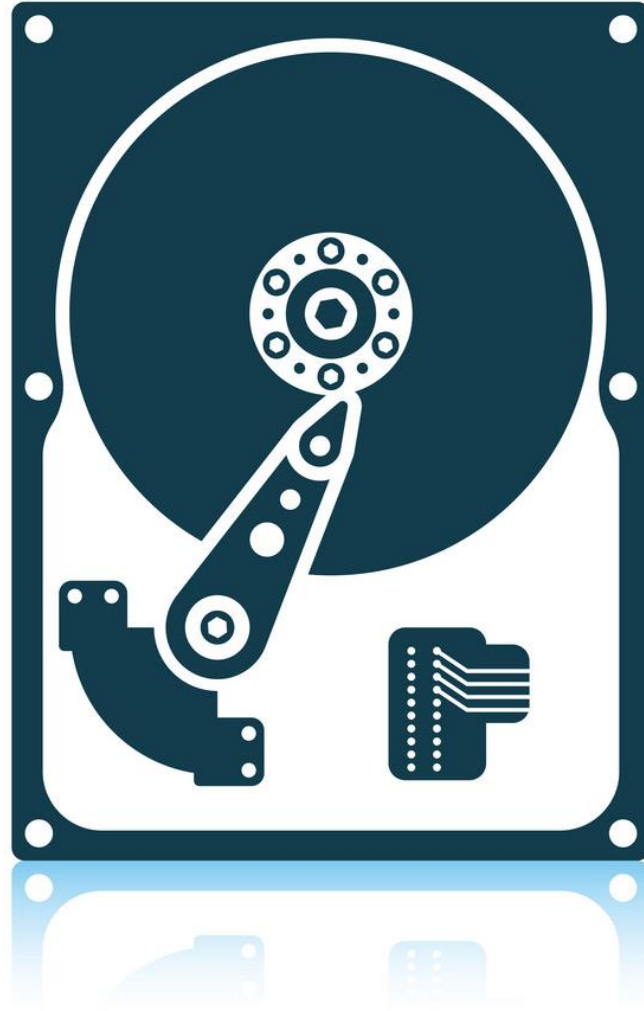
হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ

রওনক শাহরিয়ার

Hard disk drive বা HDD হলো সবচেয়ে প্রচলিত এবং পুরোনো মেমোরি সিস্টেম যেখানে তড়িৎ চুম্বকীয় চার্জ সম্পন্ন সারফেসে বিপুল পরিমাণ ডেটা স্টোর করা হয়। বর্তমানে ব্যবহার করা কম্পিউটারের হার্ড ড্রাইভ বিলিয়ন বিলিয়ন বাইট ধারণ করতে সক্ষম।

একটি হার্ড ড্রাইভ হলো এক সেট ডিস্কের সমাহার যা দেখতে ফোনোগ্রাফ রেকর্ডের মতো। ঘূর্ণায়মান অবস্থায় প্রতিটা ডিস্কে তড়িৎ চুম্বকীয়ভাবে ডেটা স্টোর হয় ট্র্যাক ও সার্কেল অংশে। ফোনোগ্রাফের হাতের মতো একটি হেড আছে, যা তুলনামূলকভাবে স্থির এবং তথ্য রিড বা রাইট করে থাকে ট্র্যাক থেকে। ডিস্ক ঘোরার সময় দুই দিকে থাকা দুটো হেড একই সাথে ডেটা রিড ও রাইট করতে পারে। প্রতিটা রিড বা রাইট করার ডেটা লোকেটের দরকার হয় যাকে 'সিক' বলা হয়। তবে ডিস্কের ডেটা আগে থেকেই ক্যাশ করা থাকে, যা ডেটা লোকেট আরও দ্রুত করে।

ইতিহাস:

১৯৫৭ সালে প্রথম আইবিএম কম্পিউটারে 3.75 MB-এর প্রায় ২০ ইঞ্চির এক বিশাল আকৃতির হার্ড ড্রাইভের ব্যবহারের মাধ্যমে এর যাত্রা শুরু হয়। তবে প্রথম পার্সোনাল হার্ড ড্রাইভ ১৯৭৯ সালে বাজারে আসে, যার আকৃতি ছিল 5 MB।

তবে ৩.৫ ইঞ্চি ড্রাইভ Rodime সর্বপ্রথম তৈরি করে ১৯৮৩ সালে এবং ল্যাপটপের জন্য ২.৫ ইঞ্চি হার্ড ড্রাইভ ১৯৮৮ সালে তৈরি হয় যার সাইজ ছিল 20 MB।

তবে সেটাগেট ২০০৬ সালে প্রথম বারের মতো ডিস্কে প্রতি ইঞ্চিতে ৬০০ জিবি ডেটা স্থানান্তরে সফল হয় এবং হিটাচি এর চার বছর পর ৫০০ জিবির হার্ড ড্রাইভ বের করতে সমর্থ হয়।

২০১৩ সালে সেটাগেট ৫ টেরাবাইট এর হার্ড ড্রাইভ বাজারজাত করে এবং কয়েক বছরের মধ্যে তারা ১০, ১২ এমনকি ১৬ টেরাবাইট ধারণক্ষমতা সম্পন্ন হার্ড ড্রাইভ আনে।

তবে স্টোরেজের ক্ষেত্রে মেমোরি এবং হার্ড ড্রাইভের অনেক বড়ো পার্থক্য আছে। আর এই পার্থক্য মূলত আকার, বিশাল স্টোরেজ, ডেটা ট্রান্সফার গতি, সুলভ মূল্যসহ অন্যান্য বিষয়গুলো জড়িত।

হার্ড ড্রাইভের মূল অংশগুলো ক্যাসিং এর মধ্যে থাকে। এই ক্যাসিং শক্ত ও মজবুত হওয়ায় ভেতরের অংশকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে। হার্ড ড্রাইভের মূল অংশগুলো হলো–

Platters:

হার্ড ড্রাইভে অনবরত ঘূর্ণায়মান একটি ডিস্ক থাকে যেটা প্লেটার নামে পরিচিত। এটা মূলত অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি। এর ওপর নিকেল, কোবাল্ট ও প্লাটিনামের কোটিং দেওয়া থাকে যেন চুম্বকীয় ধর্ম প্রকাশ পায় এবং তার ওপর কার্বন এর কোটিং থাকে যা দ্রুত ঘুরতে সাহায্য করে। একটি হার্ড ড্রাইভে মোট ছয়টি ডিস্ক থাকতে পারে। এটা মিনিটে ৪,৮০০/৫০০/৭,২০০/১৫,০০০ বার ঘুরে রিড ও রাইট করতে পারে।

Read-write head:

এটি একটি ইলেকট্রোম্যাগনেট এবং রিড-রাইট আর্মের সাথে সংযুক্ত ও প্লেটারের ওপর-নিচে থাকে। প্লেটার থেকে দূরত্ব 5 nm এর মতো হয়, ডিস্কের সাথে একেবারে লাগানো থাকে না। লাগানো থাকলে প্লেটারের ক্ষতি সাধন করবে। এই হেডের দুটো অংশ থাকে, যার একটি ম্যাগনেটাইজ করে রাইট করে, আরেকটা ডেটা রিড করে। আর এই দুই অংশ একটি প্লেটারের ওপরে, অন্যটি নিচে থাকে।
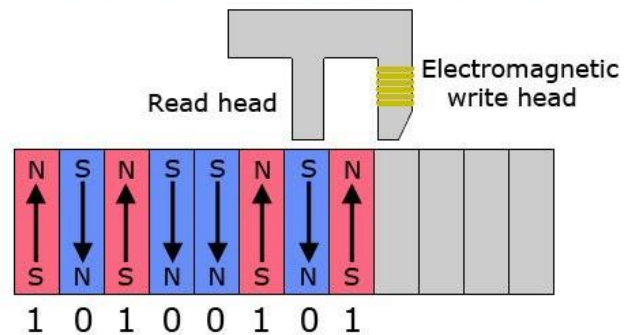
Read-write arm:

এটি বাহুর মতো যার শেষ প্রান্তে রিড-রাইট হেড থাকে। এটি অত্যন্ত দ্রুত মুভ করতে পারে যার ফলে প্লেটারে রিড-রাইট করতে সুবিধা হয়।

Central spindle

এটি প্লেটারকে নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরতে সাহায্য করে।

Actuator:

এটি রিড-রাইট আর্মকে ডিস্কের নির্দিষ্ট অংশে নিতে সহায়তা করে। বর্তমানে এটিতে ভয়েস কয়েল ব্যবহার করা হয়, যা

ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পদ্ধতিতে অত্যন্ত দ্রুত রিড ও রাইট হেডকে নাড়াচাড়া করতে সহায়তা করে।

Small spindle:
এটি রিড ও রাইট আর্মকে আটকে রাখে এবং প্লেটারের ওপর সঠিক জায়গায় রাখতে সহায়তা করে।

Plug connector:
এটি হার্ড ডিস্কের বাইরে থাকে যা পিসির সার্কিট বোর্ড এর সাথে হার্ড ডিস্ককে সংযুক্ত করে।

Flexible connector:
এটি সার্কিট বোর্ড থেকে রিড-রাইট হেডে ডেটা ট্রান্সফারে সহায়তা করে।
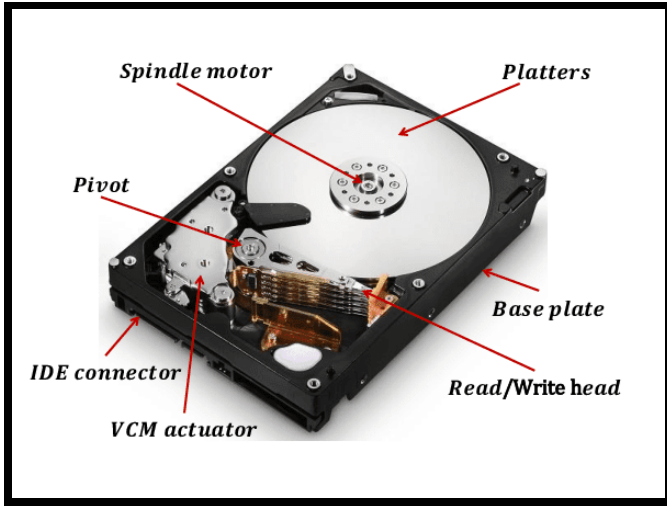
হার্ড ডিস্ক কীভাবে কাজ করে?
প্লেটারের মধ্যে থাকে প্রচুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাতব অংশ এবং সেই ক্ষুদ্র অংশে ডেটা স্টোর হয় চুম্বকীয় প্যাটার্নে, যার প্রতিটা অংশকে বিট বলা হয়। এই অংশগুলো ম্যাগনেটাইজ করা যায়, উত্তর বা দক্ষিণ দিকে। এই উত্তর-দক্ষিণ দিক মূলত ০/১, যা কম্পিউটার বুঝতে পারে।

প্লেটারকে নির্দিষ্টভাবে ভাগ করা যায়, যা সেক্টর ও ট্র্যাকস নামে পরিচিত। ডেটা স্টোর হয় প্লেটারের এই সেক্টর ও ট্র্যাকসে। ট্র্যাক হলো একটি বৃত্তাকৃতির অংশ, নিচের ছবির হলুদ অংশটির মতো। আর সেক্টর হলো ট্র্যাকের ছোটো একটি অংশ, ছবির নীল মার্ক করা অংশের মতো। আবার অনেকগুলো সেক্টর মিলে তৈরি হয় ক্লাস্টার। এতে কোথায় ডেটা রিড করতে হবে বা কোথায় রাইট করতে হবে অথবা ডিলিট করতে হবে তা পিসি সহজে নির্ণয় করতে পারে।
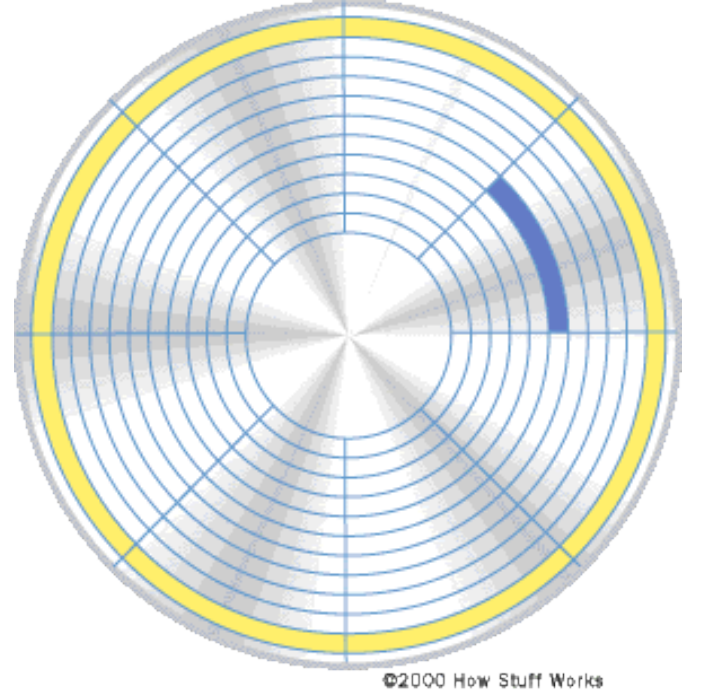
এখন ডেটা রাইট হয় রিড-রাইট আর্মের ওপরে থাকা ছোট্ট তড়িৎচৌম্বক দিয়ে। এই চৌম্বক নির্গত ফিল্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিটের চুম্বকীয় দিক পরিবর্তন করতে সক্ষম। এভাবে দিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ডেটা স্টোর করা হয়।

ডিস্কের বিপরীতে থাকা রিড হেডের চৌম্বকক্ষেত্র প্লেটারের ইমপাসল বুঝতে পারে এবং প্লেটারের চুম্বকীয় দিককে পাঠযোগ্য বা ০/১ এ কনভার্ট করে। আর প্লেটারের নির্দিষ্ট সেক্টরে রাইট হওয়ায় কম্পিউটার বুঝতে পারে নির্দেশিত ফাইলটা কোথায় আছে এবং রিড করা দরকার।

তবে এখানে প্রশ্ন থাকতে পারে একটি A কে বাইনারি করলে দাঁড়ায় 01000001 বা ৮টা সংখ্যা।
এই হিসেবে ১ এমবির একটা ছবিতে প্রায় ৮০ লক্ষ সংখ্যার জন্য সমপরিমাণ বিট দরকার হয়।

তবে এত বিশাল পরিমাণ ডেটা কীভাবে স্টোর করা সম্ভব হয়?

আসলে আমরা যা রাইট করি, প্লেটারের মধ্যে করি। প্লেটারকে বিশাল বড়ো বানানো সম্ভব হলেও এতে বহু জটিলতা থাকে। সেজন্য প্লেটারের এরিয়াকে বড়ো না করে একে আরও ঘন করা হচ্ছে বা প্রতি ইঞ্চিতে কতটা বেশি বিট ঢোকানো সম্ভব হবে তা নিয়ে গবেষণা চলছে।

বর্তমানের হার্ড ড্রাইভে প্রতি ইঞ্চিতে ৬০০ গিগাবিট পর্যন্ত ডেটা স্টোর করা সম্ভব। এটা প্রথম আইবিএম হার্ড ড্রাইভের চেয়ে প্রায় ৩০ কোটি গুণ বেশি।

বেশি ডেটা স্টোর এর আরও কিছু কারণ আছে, যেমন: রিড-রাইট হেডে থাকা ম্যাগনেটটি প্লেটারের যত কাছে থাকবে, ম্যাগনেটের আকার তত ছোটো হবে। আর এর আকার যত ছোটো হবে, তত বেশি বিট রিড-রাইট সম্ভব হবে। এতে স্টোরেজের পরিমাণও বড়ো করা সম্ভব।

আর হার্ড ড্রাইভের পারফরম্যান্স বোঝা যায় দুইভাবে।

ডেটা রেট:

প্রতি সেকেন্ডে সার্কিট বোর্ডে কত বাইট ডেটা পাঠাতে সক্ষম তা বোঝায়। সাধারণ গতি সেকেন্ডে ৫–৩০ এমবি হওয়াটা কমন।

সিক টাইম:

সিক টাইম হলো সার্কিট বোর্ড এ কমান্ড দেওয়ার কত সময় পর হার্ড ডিস্ক ফাইলের প্রথম বিট পাঠাতে পারে সেটা। ১০–৩০ মিলিসেকেন্ড এখানে কমন একটা বিষয়।

হার্ড ড্রাইভের সমস্যা:

হার্ড ড্রাইভে অনেক কারণে সমস্যা হতে পারে। এই সমস্যাগুলোকে ছয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা:

Electrical failure:

এমনটা হয় যখন অতিরিক্ত ভোল্টেজ হার্ড ডিস্কের সার্কিটকে ড্যামেজ করে এবং রিড-রাইট হেড বা সার্কিট বোর্ড ফেইল করে। যদি হার্ড ডিস্ককে পুনরায় অন করা হয়, এটি ডেটা রিড-রাইট বা বুট করতে পারে না।

Mechanical failure:

এমনটা হতে পারে হার্ড ডিস্কে জোরে আঘাত লাগলে বা পড়ে গেলে এবং একে খোলা বা জোড়া দেওয়ার সময়। এমনটা হলে রিড-রাইট হেড প্লেটারে আঘাত করে এবং প্লেটারে ড্যামেজ করে।

Logical failure:

এমনটা হয় যখন হার্ড ড্রাইভের সফটওয়্যার ঠিকমতো রান করতে না পারে। ম্যালওয়ার বা ভাইরাস, অ্যাপ্লিকেশন ঠিকমতো বন্ধ না করলে বা ঠিকমতো পিসি বন্ধ না করলে, মানুষের ভুলে হার্ড ড্রাইভ ফাংশন করার ফাইল ডিলিট করলে এমন সমস্যা হতে পারে।

Bad sector failure:

যদি প্লেটারের কোনো সমস্যা হয় তবে সেই নির্দিষ্ট এরিয়ার ডেটা অ্যাক্সেস করা সম্ভব হয় না। এই সমস্যা খুব কমই হয়ে থাকে। তবে সময় অতিবাহিত হতে হতে এমন ত্রুটি বেড়েই যায়। যার ফলে ক্র্যাশ, ফাইল অ্যাক্সেস না থাকা বা হ্যাং ও ল্যাগ করা যখন হার্ড ডিস্কে কিছু করা হয়।

Firmware failure:

কোনো ড্রাইভে সফটওয়্যার মেইনটেনেন্স টাস্ক সম্পাদন করছে এবং হার্ড ডিস্ককে সেই সময় অন্য কম্পিউটারে কানেক্ট করা হয় তবে সেটা করাপ্টেড বা ঠিকমতো কাজ করে না। এই রকমের সমস্যা বুটআপে প্রবলেম বা কম্পিউটার হার্ড ড্রাইভ আইডেন্টিফাই করতে পারে না।

Multiple unknown failures:

সময়ের সাথে এমন সমস্যা হতে পারে। যেমন: বিদ্যুতের সমস্যা থাকলে মেকানিক্যাল ফেইলিউর হতে পারে যা রিড-রাইটে সমস্যা করে। আবার এর জন্য লজিক্যাল ফেইলিউরও হতে পারে যা প্লেটারে ব্যাড সেক্টরের কারণে হয়।

একটি তালার আত্মকথা

প্রজেশ দত্ত

"যে চাবি দিয়ে অনেকগুলো তালা খোলে
তাকে বলে মাস্টার কি,
আর যে তালা অনেকগুলো চাবিতে খোলে সে এক কথায় একটা বাজে তালা, আর কিছু না।"
– **কবি ফেসবুকানন্দ**

একটা প্রশ্ন দিয়ে আজকের আলোচনা শুরু করি। একটা চাবি যখন মাস্টার-কি হিসেবে কাজ করে তখন সে কৃতিত্ব কি চাবির না কি তালার? তো শুরু করতে যাচ্ছি আজকের গল্প 'একটি তালার আত্মকথা।'

আমি হুসাইন্না, আমি একটি পিন টাম্বলার তালা। আমার অবস্থান মিস নিশাতের বেডরুমের দরজায়। মিস নিশাত রোজ সকালে উঠে তাড়াহুড়ো করে অফিসে চলে যান। কোনো কোনো দিন তো যাওয়ার আগে তিনি ভুলে যান আমাকে লক করতে। কিন্তু সমস্যা নাই, বাইরে ফ্ল্যাটের মূল দরজায় আমার বদ্দা আছেন। আমার বদ্দাকে লক করে গেলেই হয়।

অনেকেই মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হন, অনেকগুলো তালার চাবি দেখতে হুবহু একরকম হলেও সব চাবি দিয়ে সব তালা খোলা যায় না কেন? এর পেছনে আসলে খুব সহজ একটা মেকানিজম আছে। তবে সেটা বুঝতে হলে আগে বুঝতে হবে আমার অভ্যন্তরীণ শারীরিক গঠন।

আমার একদম বাইরের অংশে রয়েছে একটা নলাকার প্লাগ

। ওই প্লাগ দিয়েই আপনারা চাবি প্রবেশ করান। তারপর চাবি ঘুরিয়ে আমাকে খোলার বা বন্ধ করার চেষ্টা করেন। আপনি যখন চাবি সঠিকভাবে সেট করে ঘোরান দেন তখন আমার ওই নলাকার প্লাগই রোটেট করে। আপনাকে আমার একটা সিক্রেট বলি। যদি অন্য কোনো চাবি প্রবেশ করিয়ে আমাকে খুলতে চান তবে ওই প্লাগ দেখবেন রোটেট করবে না। ফলে আপনি আমাকে আনলকও করতে পারবেন না। লাইফ প্যারাহীন।

এই যে নলাকার প্লাগ দিয়ে এত বড়ো চাবি প্রবেশ করান, এই পথটাকে বলে কি-ওয়ে। আমার কি-ওয়ে আমার চাবির ব্লেডের সমান লম্বা।

এই কি-ওয়ের সাথে যুক্ত থাকে পিন। এজন্যই আমার নাম পিন টাম্বলার তালা, বুঝলেন কাকু? এই পিন দুই ধরনের।

১) কি-পিন

২) ড্রাইভার পিন

সবার নিচে থাকে কি-পিন, এর ওপরে থাকে ড্রাইভার পিন, তার ওপরে থাকে স্প্রিং। এই স্প্রিং সংকুচিত-প্রসারিত হয় বলেই কি-পিন এবং ড্রাইভার পিন একটা সরলরৈখিক পথে (কি-ওয়ের সাথে উল্লম্বভাবে) নড়াচড়া করতে পারে। যখন চাবি প্রবেশ করানো হয় তখন এই পিনগুলো সজ্জিত হয়। চাবির গঠন না জানা পর্যন্ত এটা আলোচনায় আনা যাবে না। উঁহু।

আমার গঠনে আর তেমন কিছু বলার নেই। আপাতত, এবার আমার চাবির গঠন বলি। আমার চাবির যে অংশটা আপনারা ওই দুই আঙুল দিয়ে চেপে ধরেন ওটার নাম হেড, ওইটা নানারকম ডিজাইনের, শেপের হতে পারে। এটা শুধুই সৌন্দর্যবর্ধক একটা বিষয়। হেডের সাথে থাকে আসল অংশ, লম্বা-চ্যাপটা পাতের মতো। এই লম্বা গঠনের আবার দুইটা অংশ। আমাদের যেমন মাথার পরে আসে কাঁধ তেমনই এরও আছে কাঁধ (সোলডার), যেটা ব্লেড আর হেডকে জুড়ে রাখে। এই সোলডার ব্লেডের তুলনায় একটু বেশিই মোটা হয়ে থাকে। সোলডারের সাথে যুক্ত থাকা ব্লেড পুরোটাই প্লাগ দিয়ে প্রবেশ করে আমার কি-ওয়ে জুড়ে অবস্থান নেয়।

এই ব্লেডের একপাশ খাঁজকাটা। এই খাঁজের উঁচু অংশগুলোর নাম রিজ আর নিচু অংশগুলোর নাম নচ। এই রিজ আর নচ মোটেও সুষম না। এর কারণ আমার কি-পিন। আমার কি-পিনগুলো মোটেও একই সাইজের না; কোনোটা ০.৭ সে.মি. লম্বা পিন, কোনোটা ০.৫ সে.মি., কোনোটা ০.৪ সে.মি.। তো, খাপে খাপ খাওয়ানোর জন্য নচগুলোও তেমনভাবে কাটা হয়। ব্লেডের যে পাশে খাঁজ কাটা তার অপর পাশ ব্লেডের তুলনায় একটু খাটো দৈর্ঘ্যে। ফলে ব্লেডের একটা ছোট্ট বর্ধিত অংশ চোখে পড়ে যার নাম টিপ (Tip)।

আমার এবং আমার চাবির মোটামুটি সব গুরুত্বপূর্ণ অংশ ব্যাখা করা শেষ। হয়তো এতক্ষণে আপনি মিয়া বুঝেও গেছেন তালা-চাবি কীভাবে কাজ করে। না বুঝলে মুড়ি কিনে দিচ্ছি আপনাকে। যা-হোক, এবার সিরিয়ালি পুরো ঘটনাটা বলি, যখন নিশাত আমাকে লক করতে চায় তখন মূলত কী হয় আমার সাথে?

ক্রাশকে দেখলে যেমন বুকের মধ্যে ধুকফুক করে, তেমনই কিছু একটা হয় আমার মধ্যে। ঢালু টিপ থাকায় চাবি খুব সহজে প্রবেশ করে প্লাগ দিয়ে। এরপর চাবি যত অগ্রসর হয় কি-ওয়ে বরাবর তত কি-পিনগুলো রিজের ঠ্যালায় কিছুটা ওপরে উঠে যেয়ে স্প্রিংকে সংকুচিত করে; পরমুহূর্তে যেই আবার রিজ সরে যায় এবং কি-পিন চাবির নচে পড়ে, সেটা আবার নেমে আসে। একসময় এই ওঠানামা শেষে চাবির ব্লেড পুরোটা আমার কি-ওয়েতে প্রবেশ করে।

নলাকার কি-ওয়ে ঘূর্ণনযোগ্য। চাবি প্রবেশ করিয়ে যখন আপনি ঘোরান দেন তালা খোলার জন্য তখন এই নলাকার কি-ওয়েই ঘোরে। আগেই বলেছি আমার চাবির নচ আমার কি-পিনের সাথে হিসেব করে বানানো। ধরুন, আমার কি-পিন আছে পাঁচটা। যথাক্রমে ০.২, ০.৩, ০.৪, ০.৫, ০.৬ সে.মি. লম্বা কি পিন। এখন চাবি দেওয়ার আগে স্প্রিংয়ের চাপে সবগুলো কি-পিন কি-ওয়ের নিম্নাংশের সাথে লেগে থাকে। এখন প্রতিটা তালার মতো আমারও আছে শিয়ার লাইন। এই শিয়ার লাইন কী জিনিস? এটা হলো আমার নলাকার কি-ওয়ের ওপরের অংশের সীমানা (Outer case)। যখন সবগুলো কি-পিন শিয়ার লাইনের বরাবরে চলে আসে তখন কি-ওয়ে ঘূর্ণনযোগ্য হয়। তার আগে কি-ওয়ে ঘুরতে হলে এই কি-পিন বা এর ওপরের ড্রাইভার পিনের সাথে তালার বিভিন্ন অংশ বাধা পায়। এখন কি-পিনগুলোকে ঠেলে ওপরে তুলতে হবে শিয়ার লাইন অবধি। যখন চাবি প্রবেশ করে তখন চাবির প্রেসারে এই কি-পিনগুলো ওপরে ওঠে। আগেই বলেছিলাম নচগুলো সুষম না, বিভিন্ন সাইজের কি-পিনকে এক লাইনে আনতে নিচ থেকে কতটুকু ওপরে তুলতে হবে সেটা হিসেব করেই নচগুলো কাটা হয়। একই রকম দেখতে অন্য কোনো চাবি দিয়ে খোলার চেষ্টা করলে কি-পিনগুলো এই শিয়ার লাইন বরাবর ওঠে না পার্ফেক্টলি। তাই কি-ওয়ে ঘোরে না, তালাও খোলে না।

প্রশ্ন হলো, ড্রাইভার পিনের কাজ কী? মঞ্চে আসছে এবার সবার চোখের মণি, অনেকগুলো তালা খুলতে সক্ষম আপনাদের 'মাস্টার-কি'।

মিস নিশাতের মাথায় হঠাৎ ভূত চাপছে। তিনি চান বাড়ির সব তালা এক চাবি দিয়েই খুলবেন। তিনি চাবি নিয়ে গেলেন দোকানে, দোকানদারকে বললেন চাবিটা এমন করে দিতে যেন বাড়ির সব তালা খোলা যায়। দোকানদার মাথা চুলকে বললেন, "ইয়ে ম্যাডাম, এর জন্য তালাগুলোতে পরিবর্তন আনতে হবে, চাবি দিয়ে কিতা করুম?"। মিস নিশাতের তো গেল মাথা গরম হয়ে। "মজা পাইছেন আপনারা? নাম দিছেন মাস্টার-কি, ক্রেডিট সব চাবির আর আইসা এখন লেকচার দেন যে তালায় পরিবর্তন করতে হবে, চাবির কোনো কাজ নেই, আপনাদের নামে মামলা করা দরকার।" দোকানদার তো পুরা থ।
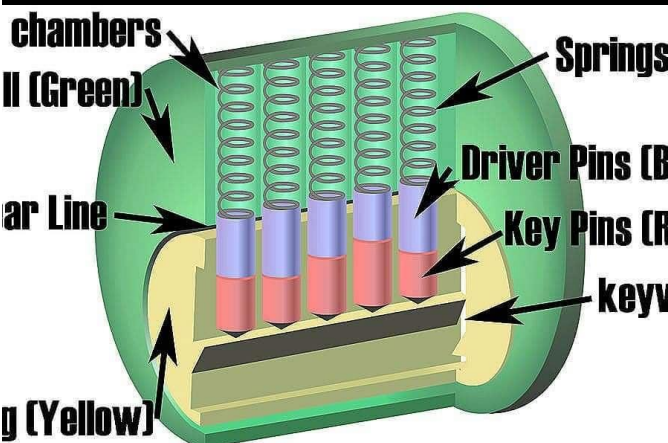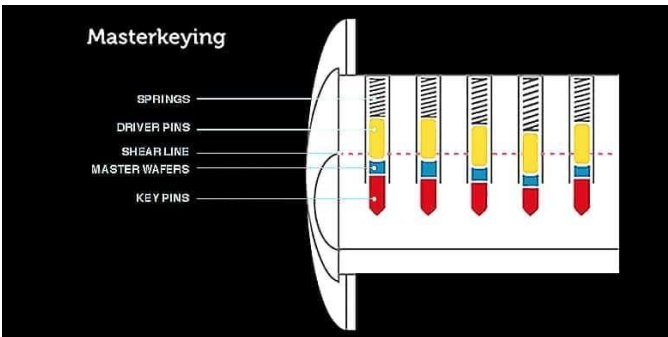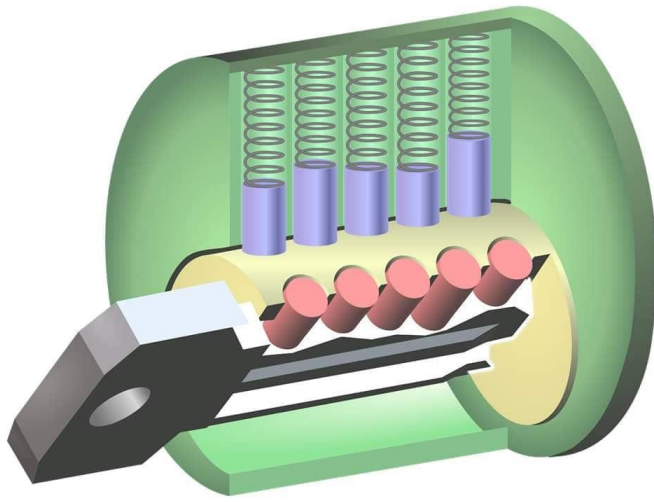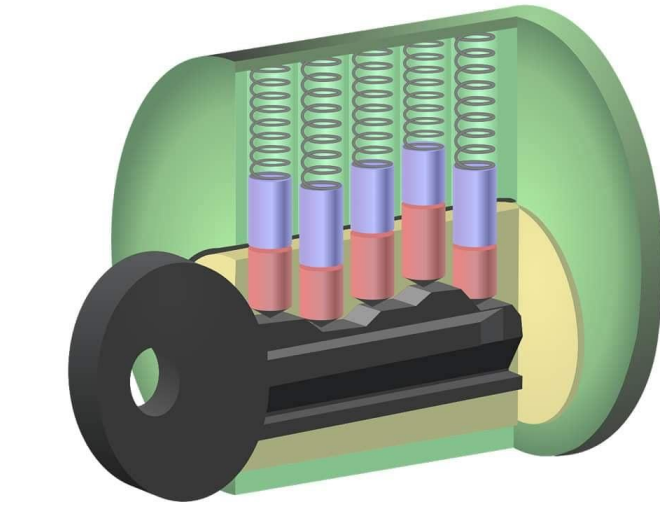
যা-হোক, পরের দিন দোকান থেকে লোক এসে আমাকে নিয়ে গেল। সাথে আমার 'চোডো বাঙ্গ' আর 'বদ্দা'-কেও। আমাদের তিনজনকে যেন এক চাবি দিয়ে খোলা যায় সেই ব্যবস্থা করা হবে। এই ব্যবস্থা করার জন্য মূল পরিবর্তন যেটা আনা হবে সেটা আমাদের ড্রাইভার পিনে। যে চাবি দিয়ে তিনটা তালা খোলা হবে সেটা যখন আমার কি-ওয়েতে প্রবেশ করানো হয়, তখন আমার তিনটা কি-পিন শিয়ার লাইনে পৌঁছায়, কিন্তু বাকি দুইটা কি-পিন অতটা উঁচুতে ওঠে না। ফলে আমি আনলক হই না। দোকানদার ব্যাডা করল কী, আমার ওউ দুইটা কি-পিনের ওপর ড্রাইভার পিনটা পালটে দুইটা করে ড্রাইভার পিন বসিয়ে দিলো। ফলে যেটা হলো, ওই কি-পিন দুইটা শিয়ার লাইনে না পৌঁছালেও ওর ওপরে বসানো প্রথম ড্রাইভার পিনটা শিয়ার লাইনে পৌঁছে যায়। ফলে কি-ওয়ে ঘূর্ণনযোগ্য হয়। একটু সমীকরণ দিয়ে ক্লিয়ার করে দিই
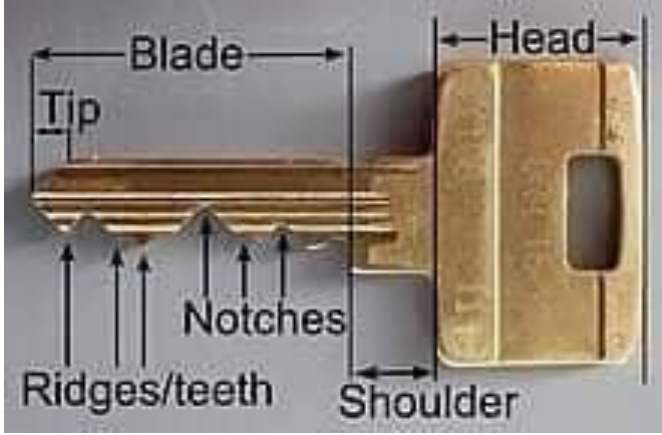
আমার চাবি দিয়ে আমাকে খোলার সময় –

ক) চাবি + কি-পিনের দৈর্ঘ্য = শিয়ার লাইন

মাস্টার-কি দিয়ে আমায় খোলার সময় –

ক) চাবি + কি-পিনের দৈর্ঘ্য < শিয়ার লাইন (কি-ওয়ে ঘোরে না, তালা খোলে না)

খ) চাবি + কি-পিনের দৈর্ঘ্য + প্রথম ড্রাইভার পিনের দৈর্ঘ্য = শিয়ার লাইন।

মাস্টার-কি এর জন্য ব্যবহৃত এই অতিরিক্ত ড্রাইভার পিনের আদুরে নাম আবার 'মাস্টার ওয়েফার।' ন্যাকামি যত্তসব।

এভাবেই মাস্টার-কি দিয়ে আমার বদ্দা আর চোডো বাঙ্গকে আনলক করার জন্যও প্রয়োজনীয় সাইজের একাধিক ড্রাইভার পিন বসানো হয়েছে।

যেসব তালা অনেকগুলো চাবি দিয়ে খোলা যায় সেসব তালায় অনেকগুলো করে ড্রাইভার পিন ব্যবহৃত হয়। ভিন্ন চাবির জন্য ভিন্ন ড্রাইভার পিন শিয়ার লাইনে পৌঁছায় এবং তালা আনলক হয়।

বিষয়টা ভিজ্যুয়ালাইজেশনে সমস্যা হলে এই ভিডিয়োটি আপনার জন্য: https://youtu.be/smIdInCQ-kU

তাহলে যে বিষয়টা দাঁড়ালো –

১। মাস্টার-কি দিয়ে তালা খোলার জন্য তালার ড্রাইভার পিন সংখ্যায় পরিবর্তন আনা হয়।

২। একাধিক চাবি দিয়ে একটা তালা খোলার জন্য ওই তালায় একাধিক ড্রাইভার পিন ব্যবহৃত হয়। তাহলে এতে চাবির কী কৃতিত্ব, মিয়া? এইসব ভুগিচুগি 'ফলস অ্যানালজি' বাদ দিন। জীবন সুখী করুন। ধন্যবাদ।

1^{∞} কেন অসংজ্ঞায়িত?

আশারাফুল ইসলাম মাহি

আমরা জানি, গণিতে ৭টি অসংজ্ঞায়িত (অনির্ণেয় শ্রেণিভুক্ত) ব্যাপার আছে। তার মধ্যে যেন হুট করেই এই 1^{∞} সবার মনে চলে আসে। সাধারণভাবে যুক্তি দিয়ে বলা যায় যে,

$1^{2} = 1×1 = 1$

$1^{100} = 1×1×1× .... ×1$ 100টা 1 গুণ

$= 1$

$1^{n} = 1$

তাহলে, $1^{\infty} = 1$ কেন নয়?

কোনো ভুল? না, নেই। ঠিকই আছে।

গণিতে একটা কিছু অসংজ্ঞায়িত হওয়া মানেই দুইটি প্রমাণিত নিয়মের বিরোধ লাগা,

মানে দুই নিয়মে দুই ফলাফল আসা।

আমরা ব্যাপারটাকে অন্যভাবে চিন্তা করে 1^{n} এর জন্য আরেকটা নিয়ম খুঁজে বের করতে চাচ্ছি।

একটা সংখ্যা 2 কে রুট করব।

তাহলে,

$\sqrt{2} = 1.414213562...$

$\sqrt[3]{2} = 1.259921...$

$\sqrt[4]{2} = 1.1892...$

....

$\sqrt[143]{2} = 1.00485...$

$\sqrt[144]{2} = 1.00482...$

এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, যত বড়ো রুট করা হচ্ছে তত মানটা 1 এর কাছে চলে আসছে। এখানে খুব কম দেখানো হয়েছে। বড়ো বড়ো মান দিয়ে 2 কে রুট করলে দেখবেন, মানটা 1 এর কাছে আসতে থাকবে। সবচেয়ে বড়ো মান দিয়ে রুট করলে মান আসবে তাহলে 1। তার মানে আমরা বলতে পারি, $\sqrt[\infty]{2} = 1$ 2 এর ইনফিনিটি তম রুট = 1 *(লিমিটের ধারণা আনিনি কিছু বিশেষ কারণে)।
শুধু 2 না, অন্য যে-কোনো সংখ্যা x নিয়ে বেশি বেশি মান দিয়ে রুট করলে 1 এর কাছে আসতে থাকবে।
সাধারণভাবে লেখা যায়,

$\sqrt[\infty]{x} = 1$

Or, $X^{1/\infty} = 1$ *(মনে করুন, এটা জাস্ট সূচকের নিয়মে এনেছি।)
Or, $x = 1^{\infty}$

তাহলে এবার পাওয়া গেল, $1^{\infty} = x$
মানে 1^{∞} এর মান যা খুশি হতে পারে!
আমরা আগে দেখিয়েছিলাম যে, $1^{\infty} = 1$ হওয়া উচিত। এখন প্রমাণ করলাম 1^{∞} = যা খুশি তাই।
দুই নিয়মের বিরোধ—তাই সংজ্ঞায়িত হবে না।

বাকি ছয়টি আগামি ব্যাঙাচিগুলোতে প্রকাশিত হবে।

১৯৫৬ সালে প্রথম হার্ড ড্রাইভ বের হয়। যেটা ৫ মেগাবাইট সমতুল্য। মজার বিষয় হলো, এই মেমরি সিস্টেমের ওজন ছিল প্রায় ১ টন।

বুলবুল আর সেরিনার বাচ্চা কী উড়ন্ত মাছ হবে?

মনিফ শাহ চৌধুরী

১.

বুলবুল আর সেরিনা দাঁড়িয়ে আছে জেনিফার ফার্টিলিটি এন্ড এথিক্যাল এডিটিং সেন্টারের সামনে। চোখ ভরা আশা আর ব্যাংক ভরা টাকা নিয়ে তারা প্রবেশ করল চাকচিক্যময় দালানের ভেতরে।

বুলবুল আর সেরিনা দুজনেই Cystic Fibrosis এর ক্যারিয়ার। অর্থাৎ, তাদের Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Channel বা CFTR protein তৈরি করার যেই জিন, সেখানে একটা allele recessive। মানে যদি স্বাভাবিক allele-কে F ধরি আর অস্বাভাবিক allele-কে f, তাহলে তাদের জিনে allele এর জোড়া হবে Ff । আর যেহেতু একটা gamete বা sex cell-এ একটাই allele থাকবে, তাই তাদের প্রতিটা gamete হয় F বহন করবে নয়তো f । উল্লেখ্য, এই Cystic Fibrosis রোগটা বা CF হলো একটা homozygous recessive জোড়াবন্ধনের ফল। মানে একটা জিনে যতক্ষণ না দুইটা allele-ই f থাকবে, ওই মানুষটার রোগ হবে না।

তাহলে, সেরিনা আর বুলবুলের বাচ্চার এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কত? এটার জন্য জেনেটিক ডায়াগ্রাম আঁকতে হবে। আপাতত, এখানে সহজে বলা যাক।

সেরিনার gamete = F অথবা f

বুলবুলের gamete= F অথবা f

তাহলে, (F, f)×(F, f) = FF, Ff, Ff, ff

তার মানে দাঁড়াচ্ছে চার ভাগের এক ভাগ চান্স হচ্ছে বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ থাকবে। কোনো রোগী allele থাকবে না। দুই ভাগের মাঝে রোগী allele থাকবে তবে তাদের কোনো ক্ষতি বা প্রভাব করবে না। কারণ আগেই বলেছি, এই রোগ হতে হলে দুটো allele ই recessive বা f হতে হবে। এদের ক্যারিয়ার বলা হয়। মানে তারা বাহক। পরিশেষে, একভাগ বা ২৫% চান্স হচ্ছে সে রোগাক্রান্ত হবে ff।

সেরিনা আর বুলবুল কি এই রিস্ক নেবে তাদের সন্তানের সাথে? কখনোই না। এই রোগের ফলে CFTR প্রোটিন ঠিকমতো কাজ করে না। ফল্টি প্রোটিন। আর এই প্রোটিনের কাজ হলো কোষের ভেতরে আর বাইরে ক্লোরাইড আয়নের (Cl^-) যাওয়া আসা নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে গেলে mucus শক্ত হয়ে যায়। সহজে সরানো যায় না। Mucus মানে কফ। তো এটা সহজে না সরাতে পারলে শ্বাসনালী চিকন হয়ে বাতাস ফুসফুস পর্যন্ত পৌঁছাতে বাধা দেবে। মানুষটা শ্বাসকষ্টে ভুগবে আজীবন।

Mucus কি শুধু এই শ্বাসনালীতেই থাকে? পাঁচ সেকেন্ড সময় দিলাম, ভাবুন আর কোথায় থাকে?

.

.

.

.

.

পাঁচ সেকেন্ড শেষ। আমাদের চেহারার পেছনে খুলির ফাঁকা জায়গায় mucus থাকে। এখানে শক্ত হয়ে গেলে মাথাব্যাথা, সাইনোসাইটিস ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেবে। আমাদের Pancreas যে এনজাইম তৈরি করে সেগুলো একটা টিউব বা নালী দিয়ে বের হয়ে intestines-এ যায়। কিন্তু এই টিউবে থাকা Mucus ব্লক হয়ে গেলে এনজাইম যেতে পারে না, তাই খাবার ঠিকমতো হজম হয় না। মানুষটাকে বেঁচে থাকতে হলে প্রচুর খাবার খেতে হয়।
আবার স্পার্ম ডাক্ট আর Cervix-এও mucus থাকে। এগুলো ব্লক হয়ে যাওয়া মানে infertile বা বন্ধ্যা হয়ে যাওয়া। এছাড়াও কানে শোনার ক্ষেত্রে সমস্যা, ঘাম তৈরি করা গ্ল্যান্ডগুলো দিয়ে আয়ন বের হওয়া, পলিপাস ইত্যাদি বহুত, সহজার্থে বহুত সমস্যা নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় দুর্ভাগা CF পজিটিভদের। শুধু এই CF নিয়েই ছোটোখাটো বই লেখা যাবে, তবে আজকের আর্টিকেলের বিষয় এটা নয়। এ বিষয়ে পড়তে চাইলে লিংক ১ আর ২ দেখুন।

তো, সেরিনা-বুলবুল দম্পতিতে ফেরা যাক।
তারা সচেতন শিক্ষিত যুগল। এর জন্যেই বিয়ের আগে কাউন্সিলিং করে জেনে নিয়েছে একে অপরের কোনো সমস্যা আছে কি না। জীবনের কয়েকটা বছর একসাথে অতিবাহিত করার পর একটা সন্তানের আকাঙ্ক্ষা তাদের মনে উঁকি দিয়ে ওঠে। তবে সন্তানের জীবনের সাথে ২৫% এর জুয়া তারা খেলতে রাজি নয়।

জেনিফার সেন্টারে এর সমাধান আছে। তারা জিন এডিটিং করে। ভ্রূণের মাঝে কোনো অসঙ্গতি বা অস্বাভাবিকতা থাকলে তারা সেটা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরিয়ে স্বাভাবিক allele বসিয়ে দেন। এইক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি আসলে বছর দশেক আগে আবিষ্কার হওয়া CRISPR এর এক টেক।

CRISPR কি?

এটা একটা ডিএনএ সিকুয়েন্স যেটা ব্যাক্টেরিয়াদের থেকে পাওয়া যায়। এটা ব্যবহার করে ডিএনএর নির্দিষ্ট জায়গায় কাটা যায়। ব্যাক্টেরিয়া এগুলো কোথা থেকে পেল? ব্যাক্টেরিওফেজ ব্যাক্টেরিয়াদের আক্রমণ করে নিজেদের যেই ডিএনএ ফেলে রেখে যায় সেগুলো থেকেই এটা পাওয়া গেছে। এটার সাথে নিউক্লিয়াসের একটা এনজাইম, Cas9, ব্যবহার করে ডিএনএকে নির্দিষ্ট জায়গায় কাটার সূচনা করেন জেনিফার ডুডনা (Jennifer Doudna)।

তাঁর এই প্রযুক্তির নাম ছিল CRISPR-Cas9।
পরে এটাকে উন্নত করা হয় Cas9-এর বদলে Cpf1 এনজাইম ব্যবহার করে। উন্নত করার দরকার কী ছিল? Cas9 ডিএনএ'র দুটো সাইড বা strand একই জায়গায় কাটত। যার ফলে জায়গাটা ভোঁতা হয়ে থাকত। নতুন জিন যোগ করা কঠিন হয়ে পড়ত। কিন্তু Cpf1 একটা সাইডের strand-কে যেখানে কাটে অপর সাইডে একটু আগে বা পরে কাটে। তাই একটা strand ছোটো আরেকটা বড়ো হয় এবং নতুন জিন সহজে জোড়া লাগানো যায়।

সেরিনা আর বুলবুল তাদের শুক্রাণু আর ডিম্বানুর স্যাম্পল দিলো। বুলবুলের জন্য ব্যাপারটা সহজ হলেও সেরিনাকে কয়েক ঘন্টা অপারেশন থিয়েটারে অজ্ঞান থেকে ১৫টা ডিম্বানু দিতে হলো। এর কম ডিম্বানু মানে শিশু জন্মের চান্স প্রচুর কম, আর বেশি নিলে শরীরের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তাই ১৫-ই হল আদর্শ সংখ্যা, সন্তান জন্মানোর চান্স ৪০%।

জেনিফার ফার্টিলিটি সেন্টারের কাজ কী?

টেস্ট টিউবে তাদের gamete নিয়ে হালকা ইলেক্ট্রিসিটি দিয়ে শুক্রাণু আর ডিম্বানুকে নিষিক্ত করা। এইক্ষেত্রে শুধু সেই gamete নেওয়া হবে যেগুলোতে কোনো recessive allele নাই। ব্যাপারটা সহজ তবে বাচ্চা জন্মানোর চান্স আরও কমে যায়। আশা করা যায় সেরিনা আর বুলবুলের ভাগ্য ভালো।

এখানে কোনো এডিটিং এর ব্যাপার নেই। তাই ফার্টিলিটি সেন্টারের ডক্টর আমাদের দম্পতিকে প্রস্তাব দিলো তারা কোনো এডিটিং করাতে চায় কি না। যেমন, তাদের ভ্রূণের CCR5 জিনে কিছু পরিবর্তন এনে দিলে তাদের সন্তানের কোনোদিন এইডস হবে না।
সেরিনা আর বুলবুল একটু ভাবার জন্য সময় নিল। আমরা তাঁদের সময় দিই।

ততক্ষণ কথা বলা যাক এমন জিন এডিট করে সন্তান জন্ম দেওয়া আসলেই হয়েছে কি না পৃথিবীতে। অর্থাৎ, জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার করা কোনো মানুষ কী আসলেই আছে?

আপনারা সম্ভবত ক্রিসপার বেবিদের নাম শোনেননি। লুলু আর নানা তাদের নাম। ২০১৮ সালের নভেম্বরে জন্ম নেয় এই আশ্চর্য সন্তান দুটি। এর নেপথ্যে আছে হি জিয়ানকুই নামের এক চাইনিজ বিজ্ঞানী।

ঘটনাটা ঘটে এভাবে, ২০১৭ সালে এক দম্পতি যাদের একজন HIV positive, তাদের এই বিজ্ঞানী অফার করেন একটা এক্সপেরিমেন্টে অংশ নিতে যা সফল হলে তাদের সন্তানের HIV হবে না। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই রাজি হয়ে যান। অবশ্যই পুরো এক্সপেরিমেন্টটা ছিল গোপন এবং অবশেষে যেদিন ২০১৮তে বাচ্চা দুটো জন্ম নেয় তারপর হি নিজেই এই এক্সপেরিমেন্টের কথা বিশ্বে জানিয়ে দেন। তিনি সফলভাবে সেই প্রোটিন চ্যানেলের জিনের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন যেই চ্যানেল ব্যবহার করেই HIV কোষে প্রবেশ করে। বাচ্চা দুটো সম্পূর্ণ সুস্থ বলে জানানো হয়।

২.

সেরিনা আর বুলবুল ভাবল আপাতত টাকা অপচয় করে লাভ নেই। শুধু সুস্থ সন্তান জন্ম নেক আগে।

জেনিফার সেন্টারে এথিক্যাল এডিটিং করানো হয়। তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে আনএথিক্যাল এডিটিং কোনগুলো?

জিন এডিটিং ব্যাপারটা নিয়ে সবসময়ই মানুষের দ্বিমত ছিল। যাঁরা এর পক্ষে কথা বলেন তাদের মত হলো, "যেহেতু এটা ব্যবহার করে আমরা অনেক দুর্ভাগা বাচ্চাদের মরণব্যাধি থেকে মুক্তি দিতে পারি তাই এই প্রযুক্তি ব্যবহার না করা বরং খারাপ কাজ হবে। Down's Syndrome, HIV, Rett's disease, CF ইত্যাদি নানান অসুখ থেকে মুক্তি মিলতে পারে সহজেই।"

অপরদিকে, যাঁরা এর বিরুদ্ধে বলেন তাদের মতে, "যেহেতু সাফল্যের রেট খুবই কম তার মানে অনেক ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যায় একটা ভ্রূণ সফলভাবে এডিট করতে। তারা এটা অমানবিক মনে করেন।"

সবচেয়ে খারাপ বিষয় হলো, ভবিষ্যতে বাবা মা তাদের সন্তানদের নিজেদের ইচ্ছেমতো এডিট করতে চাইতে পারেন। কসমেটিক এডিটিং বা তাদের চেহারা/সৌন্দর্য বিষয়ক ব্যাপারগুলো নিজেদের মতো নির্ধারণ করতে পারেন। চোখের রং, চুলের রং থেকে শুরু করে হাড়ের ঘনত্ব, চোখে রড-কোনের ডেনসিটি, এমনকি করপাস কলোসামের সাইজ সবকিছুই পরিবর্তন করতে পারবে। ভবিষ্যতের পৃথিবীতে তখন বৈষম্য সৃষ্টি হবে। একদল, যারা এডিট করা, উন্নত। আরেকদল, যাদের পর্যাপ্ত সুবিধা নেই এডিটিং এর জন্য।

৩.

পাঁচ বছর পর।

সেরিনা আর বুলবুল দাঁড়িয়ে আছে অখ্যাত এডিটিং সেন্টারের সামনে। চারিদিকে সবাই তাদের সন্তানদের এত প্রশংসা করে যে শুনতে শুনতে কান পচে গেছে সেরিনার। এখন তার বাচ্চাকে নিয়েও মানুষ কথা বলবে। ভিটেবাড়ি বিক্রি করে টাকা নিয়ে এসেছে ও। তাদের বাচ্চাকে সর্বোচ্চ নিখুঁতভাবে তৈরি করে নেবে।
সামনের ভবনের চেয়েও তাদের চোখ চকচক করছে।

৪.

টাইটেলটা মিসলিডিং না। জাফর ইকবাল স্যারের দুটো বই আমার খুব পছন্দ। একটা ইকারাস আরেকটা সেরিনা। দুটো পড়েননি? পড়ে ফেলুন।

ইকারাসকে তো চেনেনই। মোমের পাখা পিঠে লাগিয়ে পিতার আদেশ অমান্য করে সূর্যের পানে উড়াল দিয়েছিল। মোম গলে গেলে নিচে সমুদ্রে পড়ে যায়।

ইকারাস বইয়ের মূল চরিত্র বুলবুল। সে একটা এক্সপেরিমেন্টের ফসল। তার জিনে হাজারটা পরিবর্তন করে তার পিঠে পাখা তৈরি করা হয়েছে। শরীরের হাড়গুলো আশ্চর্য রকম হালকা যাতে সে উড়তে পারে। গল্প তার বেড়ে ওঠা নিয়ে এবং এক পর্যায়ে লোকচক্ষু থেকে বেঁচে থাকতে এক ঘন জঙ্গলওয়ালা দ্বীপে নির্বাসন নেয়।

সেরিনার গল্পও অনেকটা একই রকম। তার শরীরে এডিট করে তাকে চামড়া দিয়ে পানির নিচে নিঃশ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। শেষতক সেও সমুদ্রে থাকে।

বুলবুল আর সেরিনার ব্যক্তিত্ব আলাদা। এই দুই বই যারা পড়েছে তারা হয়তো কোনোদিন ফ্যান্টাসি করেছে যে বুলবুল আর সেরিনার দেখা হয়েছে। তারা একে অপরের সঙ্গী হয়েছে। আমিও করেছি।

আমার ফ্যান্টাসি একদিন সেরিনা বঙ্গোপসাগরের নিচ থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসছে। তার শরীরে লাল-নীল শিরা-ধমনী স্পষ্ট ফুটে উঠেছে যেন শরীরে কেউ নিপুণ দক্ষতার সাথে উল্কি এঁকে রেখেছে। সে ধীরে ধীরে এক পা দু পা করে উঠে আসে দ্বীপের মাটিতে। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে নেয় সে। কত বছর কেটে গেছে বুকে শ্বাস নিতে? দুবছর? টলমল করতে থাকা পায়ের দিকে কেউ তাকালে মনে করত সে গন্ধরাজের বনের মাঝে মাতাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ ওপরে গাছের মাঝে খসখস শব্দ শোনা গেল। তারপর আরেকটা, তারপর আরেকটা। পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। তারা কি এমনই না কি আজ একটু বেশিই তৎপর তারা?

পেছনে ফিরে আবার সমুদ্র পানে তাকাল সেরিনা। তার ঘোলাটে মায়াবী চোখ বাতাসে মানিয়ে নিতে সময় নিচ্ছে। এরপর আবার জঙ্গলের দিকে এগোতেই দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক ফেরেশতা। সুঠাম দেহ, পরনে অল্প কাপড় শুধু কোমড়ের নিচে ঢাকার জন্য। আর তার বিশাল পাখা দুদিকে ছড়িয়ে আছে। দুজন অনেক্ষণ একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

- "তুমি কি কোনো ফেরেশতা? আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি কেন? আমার জান নিয়ে যেতে এসেছ?" সেরিনাই নিরবতা ভাঙল।

ছেলেটা আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তার স্বচ্ছ চোখের কাছে হার মানবে পাথরের ওপর টলমল করা পানিও। এরপর সুকণ্ঠে ছেলেটা বলে উঠল,

"আমার নাম বুলবুল। আপনার?'

ডিবাগিং

নাঈম হোসের ফারুকী

যারা ছোটোকাল থেকে তিন গোয়েন্দা, ফেলুদা এসব পড়ে পড়ে গোয়েন্দা হওয়ার স্বপ্ন দেখো, তাদের জন্য দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো একটা কাজ হতে পারে প্রোগ্রামিংয়ের ডিবাগিং। এককথায় বাগ খুঁজে সেটাকে দূর করা। ডিবাগিং কখনও সহজ, কখনও জটিল, কখনও মাথার চুল ছেঁড়ার মতো ভয়াবহ হতে পারে।

ছোটোখাটো সিনট্যাক্স ডিবাগিং সহজ। কোডে সিনট্যাক্স ভুল করলে IDE নিজেই লাল দাগ দিয়ে দেয়। ধরো সেমিকোলন মিস গেছে, IDE এমনিতেই ধরে দেবে। এরপর আছে রান এক্সেপশন। কোড রান করতে গিয়ে কোনো জায়গায় শূন্য দিয়ে ভাগ হলো, অ্যারে আউট অভ বাউন্ড হলো, এগুলো সাধারণত একেবারে কোডে পয়েন্ট করে দেয়। আর ট্রাই ক্যাচ থাকলে তো কথাই নেই।

এরপর আসা যাক লজিক্যাল এররের কথায়। তুমি কোড সব ঠিক লিখেছ, কিন্তু লজিকে সমস্যা। ধরো, লিপ ইয়ার বের করার কোড লিখছ, কিন্তু "চারশো দিয়ে ভাগ গেলে লিপ ইয়ার হয় না"–এই কেইস মিস করে গেছ। প্রোগ্রাম উলটা পালটা আউটপুট দিচ্ছে। এ ধরনের বাগ মেশিন তোমাকে ধরে দেবে না, চিন্তা করে বের করতে হবে।

এবার আসি অন্য ধরনের কিছু প্রবলেমে। আমি প্রায় ৭ বছর ধরে সফটওয়্যার ডেভলপমেন্ট করছি। এই সাত বছরে বহু বিচিত্র ডিবাগিং অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি। ধরো তোমাকে কয়েক লাখ লাইনের অন্যের লেখা কোড হাতে দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো। এই কোডের সমস্যা আছে, খুঁজে বের করতে হবে। কী করবা? এসব ক্ষেত্রে মাঝে মাঝেই প্যাটার্ন খুঁজে খুঁজে ওয়াইল্ড গেইস করা ছাড়া উপায় থাকে না।

কিছুদিন আগে উদ্ভট একটা প্রবলেমে পড়লাম। কয়েক ঘণ্টা মাথা নষ্ট করলাম, কোড দেখে মনে হচ্ছে সব ঠিক আছে, কিন্তু কাজ করে না। খুঁজে খুঁজে দেখা গেল fileId নামে একটা ভ্যারিয়েবল আছে, সেটা কোনোভাবেই ঠিক মান পাচ্ছে না। কেউ কি মাঝপথে রিসেট করে দেয় এটাকে? মেমোরি করাপশন হচ্ছে? অবশেষে বাগ ধরা পড়ল। ওই ক্লাসে আসলে দুইটা ভ্যারিয়েবল আছে, fileid আর fileId. একটা নিজের, আরেকটা পৈতৃক সূত্রে পেয়েছে। কোনো এক ডেভলপার সেই প্রজেক্টে কাজ করতে যেয়ে আগের ভ্যারিয়েবল খেয়াল না করে নতুন আরেকটা ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে, একই নামে। বুঝো ঠ্যালা!

আরেকবার দেখলাম, সি প্লাস প্লাসে কিছু ভ্যারিয়েবল একটা পর্যায়ে এসে অটো ০ হয়ে যাচ্ছে। হুদাই। অনেক্ষন গুঁতোগুঁতি চলল। কেউ এই ভ্যারিয়েবল ধরে না, ছোঁয় না কিন্তু এরা ০ হয়ে যায়। কাহিনী কী? অবশেষে ধরা পড়ল, পাশের একটা একশো সাইজের অ্যারেতে দুইশো সাইজের ডেটা ঢুকছে। জাভাতে হলে এক্সেপশন দিতো, সি এসবের ধার ধারে না। সে আশেপাশের ভ্যারিয়েবলের বারোটা বাজাচ্ছে।

এরকম হাজার হাজার গল্প হয়তো মনে করে বলতে পারব। যদি বলো একজন ডেভলপারের লাইফের এক কথায় অভিজ্ঞতা কী–উত্তর হচ্ছে, স্ট্রেইসফুল লাইফ। কখনো একটা বড়ো প্রবলেম সলভ হলে খুব তৃপ্তি আসে। আর বিশাল একটা সময় কাটে প্যারায়। প্রোগ্রামিং সবার স্যুট নাও করতে পারে।

ওরা আসছে

হাম্মাদ চৌধুরী

১.

বিজ্ঞানী রড একপ্রকার অস্থিরতা নিয়ে তাঁর নিজের আবিষ্কৃত টাইম মেশিনে বসে পড়লেন। তাঁর চোখে-মুখে অস্থিরতা। কোথায় যাবেন তা ঠিক করতে পারছেন না। অবশেষে তিনি স্থির করে ফেললেন তিনি কোথায় যাবেন। সুদূর ভবিষ্যতে চলে গেলেন তিনি। তবে পৌঁছানোর পর যে দৃশ্যটা দেখলেন, সেটার জন্য তিনি মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বুঝতে পারছেন না, কী হচ্ছে। কোনোমতে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে নিরাপদ আশ্রয় নিলেন। তিনি নীরবে বসে বসে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছেন। তিনি লক্ষ করলেন, মানুষেরা দলবল নিয়ে সসার থেকে যুদ্ধ করছে। যে প্রাণীগুলোর সাথে মানবজাতি যুদ্ধ করছে, সেই প্রাণীগুলোকে বিজ্ঞানী রড আগে কখনো দেখেননি। শুধু অনুমান করতে পারছেন যে প্রাণীগুলো মানবজাতি থেকে অস্ত্রে-শস্ত্রে পিছিয়ে তাই মানবজাতির মোকাবিলা করতে পারছে না। তবে তারা পৃথিবীর দখলের সিদ্ধান্ত নিল কেন?

২.

"এই! তুমি লোকাচ্ছো কেন? লুকিয়ে থাকতে হলে Keplar 22b গ্রহেই রয়ে যেতে!”

আচমকা এমন কথায় চমকে উঠলেন রড । তিনি প্রথমে ভালো করে দেখে নিলেন।

"নাহ! এটা এলিয়েন নয়, এটা মানুষ।"

তিনি কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, "শোনেন ভাই, আমি অতীত থেকে এসেছি । আমি জানিনা এখানে কী হচ্ছে।"

লোকটা অবাক হয়ে বিজ্ঞানী রডের দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল,
- তাহলে টাইম ট্রাভেল করে এই গ্রহে কেন আসছেন?

- আরে ভাই! এটাই তো আমার গ্রহ। মানবজাতি তো এখানেই থাকে ।

লোকটা হাসতে হাসতে বলল, " মানবজাতি তো Keplar 22b গ্রহে থাকে। আমরা তো এখানে পৃথিবী দখল করতে এসেছি। এটা তো নিনাস প্রাণীদের আবাসের গ্রহ।"

মুহুর্তের মধ্যে বিজ্ঞানী রড বুঝে গেলেন কী হচ্ছে। কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে মানবজাতির প্রাচীন ইতিহাস। তিনি আর অপেক্ষা না করে তাড়াতাড়ি তাঁর টাইম মেশিনে চড়ে বসলেন।

৩.

বিজ্ঞানী রড ফিরে এলেন তাঁর নিজের সময়ে। ২০৩৬ সালে। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর নিজের টেলিস্কোপে চোখ দিলেন।

ধেয়ে আসছে নিনাস জাতি!

এক রহস্যময় অন্ধকার জগৎ

সোহানুর রহমান সৌমিক

শিরোনাম পড়ে কী ভাবছেন? না, আমি ডার্ক এনার্জি কিংবা ডার্ক ম্যাটার নিয়ে কিছু লিখছি না এই পোস্টে; এর সম্পর্কে মোটামুটি বিজ্ঞানমনস্ক প্রায় সবারই কিছু না কিছু জ্ঞান আছে। আর এই বিষয়ে শুধু একটা সার্চ করলেই হাজার হাজার আর্টিকেল, পোস্ট পাওয়া যায়। আমি বরং বলব অন্য এক অন্ধকার জগৎ নিয়ে, সে জগৎ সাধারণ মানুষের কাছে খুবই অন্ধকার, আর রহস্যময় একটা জগৎ। আবার অনেক মানুষের কাছে সেটা ডালভাত, সহজ সরল জিনিস। হ্যাঁ, ডার্ক এনার্জি কিংবা ডার্ক ম্যাটার নয়, সেটা হচ্ছে ডার্ক ওয়েব।

ইন্টারনেট সম্পর্কে যদি কিছুটা জ্ঞান থাকে, তাহলে আপনি হয়তো ডার্ক ওয়েব সম্পর্কে কিছু জেনে থাকবেন। কতই না রহস্যময় এক বস্তু! ভেবে ভেবে হয়তো কূল-কিনারা পাননি। এখানে সাধারণ কোনো মানুষ প্রবেশ করতে পারে না; প্রবেশ করতে পারলেও কোন দিক থেকে কী বিপদ আসবে সেটা টেরও পাওয়া যাবে না।

যাহোক, এটা ছিল ভনিতা। এবার আসল কথায় আসি।

কী এই ডার্ক ওয়েব?

ডার্ক ওয়েব হলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের একটা ছোটো অংশ, যেরকম আমাদের চেনা-জানা সাধারণ সারফেস ওয়েবও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের খুবই ছোটো একটা অংশ (আমরা সাধারণত যে ওয়েবের সাথে পরিচিত, নিত্যদিন যে ইন্টারনেট ব্রাউজ করি সেটাই সারফেস ওয়েব হিসেবে পরিচিত)।

ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা চলে। এর সবচেয়ে বড়ো অংশটি হলো ডিপ ওয়েব। পুরো ওয়েবের ৯০% এরও বেশি হলো ডিপ ওয়েব। আর সবচেয়ে ছোটো অংশ হলো আমাদের চেনা-জানা সারফেস ওয়েব।

আপনি গুগল, ইয়াহু, বিং, ডাকডাকগো ইত্যাদি সমস্ত সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ করলে আপনার সামনে যত রকমের রেজাল্ট আসা সম্ভব, তার সমস্ত কিছুই সারফেস ওয়েবের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রায় সীমাহীন সারফেস ওয়েবটিই হলো ইন্টারনেটের সবচেয়ে ছোটো অংশ!

আর বাকি থাকল একটা ভাগ, সেটার নামই ডার্ক ওয়েব। এটাও মূল ওয়েবের ছোটো অংশ। তবে সারফেস ওয়েবের চেয়ে বড়ো। এখানে আপনি চাইলেই প্রবেশ করতে পারবেন না। প্রবেশ করতে হলে আপনার বিশেষ কিছু সফটওয়্যার, ব্রাউজার লাগবে। আর গুগলে সার্চ করলে তো কখনোই ডার্ক ওয়েবের কোনো সাইট রেজাল্ট হিসেবে পাবেন না। কেননা শুধু গুগল কেন, কোনো সার্চ ইঞ্জিনই ডার্ক ওয়েবের কোনো সাইটের নাগাল পায় না। সার্চ ইঞ্জিনের দৌড় শুধু সারফেস ওয়েব পর্যন্তই। না পারে ডার্ক ওয়েব পর্যন্ত পৌঁছাতে, না পারে ডিপ ওয়েব পর্যন্ত পৌঁছাতে।

প্রচুর সিকিউরিটি থাকার কারণে এখানে সাধারণত এমন সব লোকের আনাগোনা থাকে, যারা খুবই গোপনে কাজ কারবার চালাতে চায়। যেমন: সরকারি সংস্থা, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা, হ্যাকার, অবৈধ ব্যবসায়ী ইত্যাদি।

ডার্ক ওয়েবে আপনি বিভিন্ন নিষিদ্ধ বইপত্র থেকে শুরু করে ভাড়াটে খুনি পর্যন্ত ভাড়া করতে পারবেন, যারা কিছু টাকার বিনিময়ে আপনার শত্রুকে খতম করতে সদা প্রস্তুত। ডার্ক ওয়েবে রয়েছে রেড রুমের মতো জায়গা, যেখানে আপনি কিছু টাকার বিনিময়ে মানুষের ওপর চালানো অমানুষিক টর্চারের দৃশ্য সরাসরি দেখতে পারবেন। এখানে আপনি পাবেন বিশুদ্ধ মাদক দ্রব্য। কিনতে পারবেন বন্দুক, পিস্তল। এই সমস্ত জিনিস কেনা-বেচার এক জনপ্রিয় সাইট ছিল সিল্ক রোড (Silk Road)। এই সাইটে আপনি সকল প্রকার অবৈধ জিনিসপত্র পেয়ে যাবেন, মাদকদ্রব্য থেকে শুরু করে রাইফেল, পিস্তল পর্যন্ত। যদিও এই সাইটের মালিক বর্তমানে ধরা পড়ে জেলে জীবন কাটাচ্ছেন, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন এখন। তাই এই সাইটটি এখনো আছে কিনা তা আমি জানি না।

জাল পাসপোর্ট চান? কম দামে আইফোন কিনতে চান? কোনো ঝামেলা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেনশিপ চান? কারো কোনো জিনিস চুরি করা দরকার, কিন্তু নিজে পারছেন না? ভাড়াটে চোর দরকার? সবই পাবেন।
এখানেই শেষ নয়, পাবেন গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র। বিভিন্ন হ্যাকিং টিউটোরিয়াল এখানে রমরমিয়ে বিক্রি হয়। শিশু পর্নোগ্রাফি, টর্চার করার দৃশ্য ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রশ্ন আসবে, ভাই আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে ডার্ক ওয়েবে খালি অবৈধ কাজ কারবারই হয়। ভালো কিছু হয় না এখানে?
অবশ্যই হয়, এই যেমন ধরুন, এখানে আপনি গুরুত্বপূর্ণ অনেক বই পাবেন, এর জন্য বিভিন্ন সাইট আছে। সে বইগুলোর অনেক-ই আপনি সারফেস ওয়েবে পাবেন না।
এখানে আছে ইউটিউবের মতোই TorTube, যেখানে লাখ লাখ ভিডিও পেয়ে যাবেন বিভিন্ন রকমের, আছে ফেইসবুকের মতো সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট ইত্যাদি।

কি ধরনের সিকিউরিটি থাকে ডার্ক ওয়েবে?

আপনি যদি অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারী হোন, তাহলে কখনো না কখনো ভিপিএন ব্যবহার করেছেন আপনি। কী করে আসলে এই ভিপিএন? কীভাবে এটি কাজ করে?

ভিপিএন আসলে ভায়ার মতো কাজ করে। ধরুন আপনি google.com এ ঢুকতে চান, সেক্ষেত্রে আপনাকে ব্রাউজারে যেতে হবে, এরপর অ্যাড্রেস বারে অ্যাড্রেসটি লিখতে হবে, তারপর এন্টার চাপতে হবে। ব্রাউজার এরপর কী করে? ব্রাউজারটি সার্ভারে রিক্যুয়েস্ট পাঠায় যে আপনি গুগলে ভিজিট করতে চাচ্ছেন, সার্ভার সেই রিক্যুয়েস্ট গ্রহণ করলে আপনি স্ক্রিনে গুগল দেখতে পান। এক্ষেত্রে আপনার ফোন আর সার্ভারের মাঝে অন্য কিছু

নেই, তাই খুব সহজেই আপনার ফোনের আইপি অ্যাড্রেস থেকে আপনাকে ট্র্যাক করে ফেলা যাবে। কিন্তু ভিপিএন আপনার ফোন আর সার্ভারের মাঝখানে একটা ভায়া হিসেবে কাজ করে, অর্থাৎ, আপনি গুগলে যেতে চাইলে, সেই রিক্যুয়েস্ট প্রথমে ভিপিএন-এর সার্ভারে যায়, তারপর ভিপিএন সার্ভার থেকে গুগলে রিক্যুয়েস্ট পাঠায়। কাজেই এক্ষেত্রে গুগল সার্ভারের মনে হবে আপনি না, ভিপিএন-এর সার্ভার থেকেই রিক্যুয়েস্ট পাঠানো হয়েছে। তাই গুগল সার্ভার সরাসরি আপনার আইপি পায় না। আপনাকে ট্র্যাক করতে হলে একটি ধাপ পার হয়ে এসে তারপর আপনাকে ট্র্যাক করতে পারবে। কাজেই বুঝতে পারছেন ভিপিএন ব্যবহার করার কারণে আপনাকে ট্র্যাক করা আগের থেকে সামান্য কষ্টকর হয়ে গিয়েছে।

ডার্ক ওয়েবে ঠিক এরকম ব্যবস্থাই রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে আসল ব্যবহারকারীকে ট্র্যাক করতে হলে একটা ধাপ নয়, অনেকগুলো ধাপ পার করে আসতে হবে। কাজেই এক্ষেত্রে আসল ব্যবহারকারীকে ট্র্যাক করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।
আর এই অতিরিক্ত সিকিউরিটির কারণে ডার্ক ওয়েব অনেক স্লো। আপনি যদি ডার্ক ওয়েবে কখনো প্রবেশ করে থাকেন, তাহলে নিশ্চই খেয়াল করেছেন যে ডার্ক ওয়েবের একেকটা পেজ লোড হতে অনেক সময় লাগে।

ইন্টারনেটে ডার্ক ওয়েব লিখে সার্চ করলে আপনি এমন এমন তথ্য পাবেন, যেগুলো পড়লে আপনার রক্ত হিম হতে বাধ্য। আর সার্চটি যদি একটু কষ্ট করে ইউটিউবে করেন, তাহলে আপনি ধরেই নিন ছোটোখাটো কিছু রক্ত হিম করা থ্রিলার মুভি দেখে ফিরবেন। ডার্ক ওয়েব নিয়ে অনেক অতিরঞ্জিত তথ্যে ইন্টারনেট ভরা...

কিন্তু তাদের সবই কি সত্যি?
উত্তর হচ্ছে - না। ডার্ক ওয়েবের মাধ্যমে প্রচুর অবৈধ কাজ কারবার চলে সেটা ঠিক আছে, কিন্তু এর মানে এই নয় যে আপনি একবার ডার্ক ওয়েব/ডিপ ওয়েবে প্রবেশ করলে আপনি আর বের হতে পারবেন না, ডার্ক ওয়েবে প্রবেশ করলে আপনি সবকিছু সাধারণ সারফেস ওয়েবের মতোই পাবেন এবং সামান্য ঘোরাঘুরি করে বেরও হয়ে আসতে পারবেন। এতে তেমন কোনো সমস্যা নেই।

কিন্তু ডার্ক ওয়েব সম্পর্কে যেসব রক্ত হিম করা তথ্য আপনি দেখছেন, তার সবই কি মিথ্যা?
এর উত্তরও, না। যেহেতু ডার্ক ওয়েবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবৈধ কাজ চলে, তাই সেখানে প্রায় সকল সাইটেই গোয়েন্দারা ওঁৎ পেতে থাকে। ধরুন আপনি সিল্করোড সাইটে ঘোরাঘুরি করছেন, আপনি শুধু দেখছেন সেখানে কী কী পাওয়া যায়, কোনোকিছু কেনার ইচ্ছা নেই আপনার। কিন্তু সেখানে ওঁৎ পেতে থাকা কোনো গোয়েন্দার মনে হঠাৎ প্রশ্ন জাগতেই পারে যে আপনি কেন এই সাইটে এসেছেন। এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য সেই গোয়েন্দা আপনার পিছু লাগতে পারে। আপনাকে ট্র্যাক করতে পারে, আপনার ফোন/কম্পিউটার কে ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত করে দিতে পারে কিংবা আপনার ব্যক্তিগত তথ্য (যেমন: আপনার ফোনে সেইভ থাকা আপনার ফেইসবুক/ইমেইলের লগইন ডিটেইলস) চুরি করে নিয়ে নিতে পারে। তাই ডার্ক ওয়েবে ঘোরাঘুরির ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

ডার্ক ওয়েবের কোনো সাইটে রেজিস্ট্রেশন করার ইচ্ছা জাগলে আসল তথ্য দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করবেন না, ফেইক ইমেইল বা ফেইক তথ্য দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করবেন।

প্রশ্ন: পৃথিবীর অনেক দেশেই ডার্ক ওয়েব নিষিদ্ধ। বাংলাদেশেও কি নিষিদ্ধ?
উত্তর: বাংলাদেশে ডার্ক ওয়েব নিষিদ্ধ নাকি নিষিদ্ধ নয়, এরূপ কিছুই বলা হয়নি। তাই ডার্ক ওয়েব চালাতে পারেন, সমস্যা নেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনি ডার্ক ওয়েবে গিয়েই একটা পিস্তল কিনে ফেললেন, কেউ কিচ্ছু জানবে না, কিচ্ছু করতে পারবে না। সাবধান! কখনো কোনো অবৈধ কাজ করার চেষ্টা করবেন না। অবৈধ কাজ কারবার চলে এমন কোনো সাইটেও ঢুকবেন না।

ডার্ক ওয়েব আর ডিপ ওয়েব কি একই জিনিষ?
- না। দুটো আলাদা। ডার্ক ওয়েবে ঢুকতে হলে আলাদা সফটওয়্যার লাগে, কিংবা আলাদা ভিপিএন কানেকশন লাগে। কিন্তু ডিপ ওয়েবের ক্ষেত্রে শুধু একটা সাধারণ ব্রাউজার হলেই হয়।

প্রশ্নঃ ডিপ ওয়েবে ঢুকবো কী করে? ডার্ক ওয়েব বাদ দ্যান। আগে ডিপ ওয়েবের খবর বলেন। শুনছি ডার্ক ওয়েবের থেকেও গভীরের বিষয় হলো ডিপ ওয়েব। এখানে না জানি কত কিছু হয়! তাই ডিপ ওয়েবে কীভাবে যাব তা-ই বলেন।
উত্তর: যদি আপনি এরকমই মনে করে থাকেন যে ডার্ক ওয়েব থেকে ডিপ ওয়েবে যাওয়া কষ্ট বেশি, সেখানে আরও অনেক গোপনীয় কাজ হয়, তাহলে আপনি পুরাই আজাইরা তথ্য জানেন। মনে রাখবেন, যেহেতু আপনি ফেইসবুক ব্যবহার করেন, সেহেতু অলরেডি আপনি হয়তো লাখো-কোটিবার ডিপ ওয়েব ব্যবহার করে ফেলেছেন।

কি? আশাহত হলেন?
ডিপ ওয়েব হলো সেই বস্তু, যেগুলো সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ করে পাওয়া যায় না। ধরেন, আপনি ফেসবুকে একটা পোস্ট "Only Me" করে রাখছেন। এই পোস্টটি আপনি গুগলে হাজারবার সার্চ করেও পাবেন না। কেননা সেটা Only Me করে রাখা, আর only me করা কোনো পোস্টই সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ করে পাওয়া যায় না। এটাই ডিপ ওয়েব। কিন্তু Public করে রাখা পোস্ট গুগলে সার্চ করে দেখুন, পেয়ে যাবেন। এটাই হলো সারফেস ওয়েব।
আবার ধরেন, আপনার ইমেইল অ্যাকাউন্টে গিয়েছেন। পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করলেন, এখন আপনার সামনে যে হোমপেইজটা আছে, এটাই ডিপ ওয়েবের অংশ, কেননা এই পেইজটি কখনোই গুগলে সার্চ করে পাওয়া সম্ভব না।
দেখলেন ডিপ ওয়েব কত সহজ একটা জিনিস?

- ভাই এবার থামেন। এই দুই দিনে অনেক জ্ঞান দান করেছেন, এবার আসল কথায় আসেন। ডার্ক ওয়েবে ঢুকবো কীভাবে?

- আচ্ছা ভাই থামলাম। এত করে যখন বলছেন তখন শেষমেশ বলেই দিই কীভাবে ঢুকবেন। তবে এটা যেহেতু কোনো টিউটোরিয়াল না, তাই চোখে আঙুল দিয়ে সব দেখিয়ে দেব না আমি। মেইন বিষয়গুলো বলব।
আর হ্যাঁ, যেহেতু আমার কম্পিউটার নেই, তাই শুধুমাত্র অ্যান্ড্রয়েডের পদ্ধতিটা বলে দেব। কম্পিউটার দিয়ে কীভাবে ঢুকবেন সেটা একটু কষ্ট করলেই খুঁজে নিনে পারবেন।

প্রথমে গুগল প্লে স্টোরে ‘Tor Browser” লিখে সার্চ করুন। ‘Tor Browser: Official, Private, & Secure’ নামের অ্যাপি ইনস্টল করুন।

অ্যাপটি ওপেন করুন। এরপর Connect এ ট্যাপ করুন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। এরপর সিকিউরিটি লেভেল সেট করুন। Standard রাখতে পারেন। তারপর Start Browsing এ ট্যাপ করুন। ব্যাস কাজ শেষ

[৭]
কিন্তু কথা তো এখনো শেষ হয়নি! কানেক্ট না হয় করলাম, এবার ডার্ক ওয়েবের সাইটের লিংক তো লাগবে। লিংক না হলে চালাব কীভাবে?

আচ্ছা ঠিক আছে, যেহেতু আপনার কাছে ডার্ক ওয়েবের কোনো সাইটের লিংক নেই, তাই আমি এখানে কয়েকটা লিংক দিয়ে দিচ্ছি। যদি আপনি সাধারণভাবে এইসব লিংকে ঢোকার চেষ্টা করেন, তো ব্রাউজার আপনাকে এরর মেসেজ দেবে। তবে ধৈর্যহারা হবেন না। ডার্ক ওয়েবের কোনো পেইজ লোড হতে সাধারণের থেকে বেশি সময় লাগে।

1. The Hidden Wiki
এই সাইটে ডার্ক ওয়েবের হাজারো সাইটের লিংক পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দরভাবে ক্যাটাগরি আকারে সাজানো রয়েছে সব লিংক।
লিংক: http:// zqktlwi4fecvo6ri.onion

2. Torch
এটা একটা সার্চ ইঞ্জিন। বিভিন্ন বিষয়ে সার্চ করতে পারেন এখানে।
লিংক: http://xmh57jrzrnw6insl.onion

3. Duck Duck Go
এটাও সার্চ ইঞ্জিন।
লিংক: https://3g2upl4pq6kufc4m.onion

4. Facebook
এটা ফেইসবুকের অফিশিয়াল Onion ওয়েবসাইট।
লিংক: https://facebookcorewwwi.onion

5. Hidden Answers
ফোরাম টাইপের সাইট। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন লিখে পোস্ট করতে পারেন, আবার অন্যদের প্রশ্নের উত্তর জানা থাকলে তাদের উত্তরও দিতে পারেন।
লিংক: http://answerstedhctbek.onion

6. Imperial Library
লাইব্রেরি। বিভিন্ন বই ডাউনলোড করতে পারবেন এখান থেকে।
লিংক: http://xfmro77i3lixucja.onion

7. Calibre Library
এটাও লাইব্রেরি
লিংক: http://wis45idjhhbgemez.onion

8. ParaZyte
এটাও একটি লাইব্রেরি
লিংক: http://kpynyvym6xqi7wz2.onion

সবশেষে আরেকটা কথা বলি, কখনো অবৈধ কাজ-কর্ম হয় এরূপ সাইটে যাবেন না। এতে আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।
আর হ্যাঁ, আপনার কোনো পদক্ষেপের জন্য ব্যাঙাচি কিংবা ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান দায়ী থাকবে না।

SURFACE WEB
Only 4% of Web content is available via searh
GOOGLE
WIKIPEDIA
BING
YAHOO

DEEP WEB
Contain 90% of the information on the internet, but not accesible by Surface Web crawlers
AKADEMIC INFORMATION
LEGAL DOCUMENTS
MEDICAL RECORDS
SCIENTIFIC REPORTS
GOVERNMENT RESOURCES
MULTILINGUAL DATABASE

DARK WEB
A part of the Deeb Web accessible only through certain browser such as Tor designed to ensure anonymity
TOR-ENCRYPTED SITES
DRUG TRAFFICKING SITES
ILLEGAL INFORMATION
PRIVATE COMMUNICATIONS

ফিঙ্গারপ্রিন্ট কী এবং কেন?

রওনক শাহরিয়ার

কোনো কিছুই পুরোপুরি নিরাপদ নয়। তালার চাবি বানানো যায়, সেফ লক ভেঙে ফেলা যায় এবং অনলাইন পাসওয়ার্ডও আগে বা পরে অনুমান করা যায়। তবে আমাদের জিনিসপত্র সুরক্ষিত রাখার উপায় কী? বর্তমানে সবচেয়ে সুরক্ষিত পদ্ধতির একটি হলো বায়োমেট্রিক পদ্ধতি। যেমন – ফিঙ্গারপ্রিন্ট, রেটিনা স্ক্যান ও ফেইস লক যা ব্যক্তিগত ডেটা জালিয়াতি করা আরও কঠিন বানিয়েছে। কিছুকাল আগেও ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হতো অপরাধী শনাক্তকরণের জন্য। এখন সাধারণ মানুষ তা নিজের প্রাইভেসি রক্ষার্থে ব্যবহার করে। ফিঙ্গারপ্রিন্টের অনন্যতা একে আরও জনপ্রিয় করে তুলছে, সাধারণ স্মার্টফোন, এটিএম, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং কম্পিউটার-ল্যাপটপেও ব্যবহার করা হচ্ছে। চলুন, এই প্রযুক্তির পিছনের দৃশ্যগুলো একটু দেখে আসা যাক।

স্যার এডওয়ার্ড হেনরি ১৯ শতকের শুরুর দিকে লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশে ফিঙ্গারপ্রিন্টের আধুনিক সংস্করণ ব্যবহার করা শুরু করেন। কিন্তু মজার বিষয় হলো, এই ফিঙ্গারপ্রিন্টের আবিষ্কারক 'আজিজুল হক' নামের একজন বাংলাদেশি! গণিত বিষয়ে দক্ষতা দেখে এডওয়ার্ড হেনরী আজিজুল হককে সাব-ইন্সপেক্টর হিসেবে নিয়োগ দেন আঙ্গুলের ছাপ গবেষণার জন্য। তখন ফ্রান্সিস গ্যালটনের পুরোনো পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ হতো, যা সময়সাপেক্ষ ও অকার্যকর ছিল। আজিজুল হক তার গাণিতিক দক্ষতার মাধ্যমে আঙ্গুলের ছাপের কিছু বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করে ৩২×৩২=১,০২৪টি খোপের মাধ্যমে শ্রেণিবিন্যাস করেন, যা অজানা আঙ্গুলের ছাপ বের করতে বেশ কার্যকরী ছিল। হেমচন্দ্র বোস কাজে পূর্ণতা দিতে সাহায্য করেন এবং পদ্ধতির জানাজানি হলে হেনরি একে ইংল্যান্ডে গিয়ে নিজের নামে চালিয়ে দেন। যদিও পরে বিষয়টি প্রকাশ পায়। বর্তমানের ফিঙ্গারপ্রিন্টের কৃতিত্ব পুরোপুরি এই দুই বাঙালির।

ফিঙ্গারপ্রিন্ট কী?

প্রকৃতি প্যাটার্নে পরিপূর্ণ। সেটা এককোষী জীব হোক বা বহুকোষী প্রাণী বা অনন্ত মহাবিশ্বের কিছু। ফিলোসোফার ও বিজ্ঞানীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন প্রকৃতির প্যাটার্ন জানার ও বোঝার জন্য। এই ন্যাচারাল প্যাটার্নগুলোকে গাণিতিক রূপ দেওয়া যায়, আবার কখনও নির্দিষ্ট নিয়ম, বিশদ বর্ণনা এবং চিহ্নিত করা যায়। প্রাকৃতিক বিষয়গুলো সার্বজনীন মৌলিক নীতি মেনে চলে এবং নীতি থেকে কখনও বিচ্যুত হয় না।
ফিঙ্গারপ্রিন্টের ক্ষেত্রেও এই তত্ত্বটি প্রযোজ্য। কারণ:

১. ফিঙ্গারপ্রিন্টের প্রথম মৌলিক বিষয়টি হলো, এর ইউনিকনেস বা অনন্যতা। একটি ফিঙ্গারপ্রিন্টের বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র এবং দুইটি আঙুলের ছাপ কখনও এক হবে না। এই বৈশিষ্ট্য এতটাই স্বতন্ত্র যে জমজদের মধ্যেও আলাদা হয়। ফিঙ্গারপ্রিন্ট ভ্রূণের ষষ্ঠ মাসে গঠিত হয় বলে জানা যায়।

২. আরেকটি মৌলিক বিষয় হলো, মানুষের সম্পূর্ণ জীবনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট একই থাকে বা পরিবর্তন হয় না। বয়সের সাথে আকারে বড়ো হতে পারে, তবে প্যাটার্ন একই থাকে। তবে আঙ্গুলের ক্ষতি হলে এর গঠন আলাদা হতে পারে। আবার কিছু মেডিক্যাল কনডিশনে ব্যক্তির ফিঙ্গারপ্রিন্ট থাকে না বা বদলে যায়। যার হার খুবই কম।

৩. ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেখতে জটিল মনে হলেও এর মাঝে ইউনিক কিছু প্যাটার্ন রয়েছে। ফিঙ্গারপ্রিন্টে রিজে (ফিঙ্গারপ্রিন্টের উঁচু ঢাল) প্যাটার্ন লক্ষ করা যায়, যাকে নিয়মতান্ত্রিক শ্রেণিবিন্যাস করা সম্ভব। এটা এর তৃতীয় মৌলিক বিষয়।

ফিঙ্গারপ্রিন্টের তিনটি মৌলিক রিজ প্যাটার্ন আছে –

১. Arche (আর্ক):
এই টাইপের প্যাটার্নে রিজ এক দিক দিয়ে শুরু হয় এবং অন্য দিকে শেষ হয়। পৃথিবীর মাত্র ৫% মানুষের ফিঙ্গারপ্রিন্ট এমন প্যাটার্নের।

২. Loop (লুপ):
এই টাইপের প্যাটার্নে রিজ যে দিক দিয়ে শুরু হয়েছে সেদিক দিয়েই শেষ হয়। পৃথিবীর ৬০-৬৫% ভাগ মানুষের ফিঙ্গারপ্রিন্টের প্যাটার্ন এমন।

৩. Whorl (ঘূর্ণি):
বৃত্ত দিয়ে গঠিত, একটার বেশি লুপস অথবা প্যাটার্নের মিশ্রন থাকে। পৃথিবীর ৩০-৩৫% মানুষের এমন ফিঙ্গারপ্রিন্ট রয়েছে বলে মনে করা হয়।
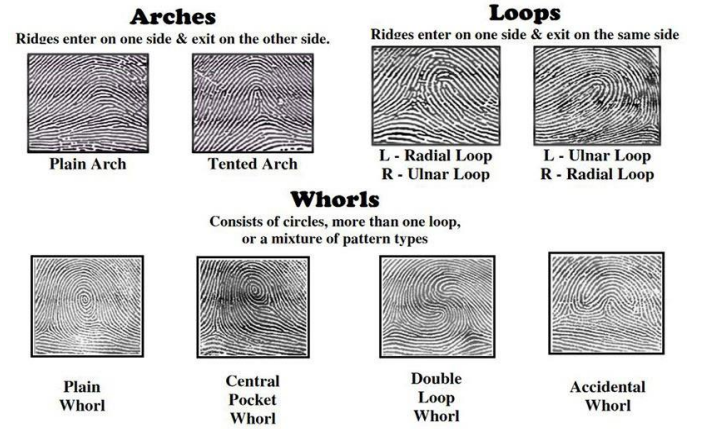
ফিঙ্গারপ্রিন্টের প্যাটার্নের ভিতরে অনেক ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। তবে অ্যালগরিদম কীভাবে তৈরি করা হয়?
এর সহজ উত্তর হলো রিজ (ফিঙ্গারপ্রিন্টের ঢালের উঁচু অংশ) ও ভ্যালি (ঢালের নিচের অংশ) দিয়ে।
ফিঙ্গারপ্রিন্ট শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ স্ক্যানারে Minutiae (ক্ষুদ্র অংশ) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
এই পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পয়েন্টের ছবি তোলা হয়। এই ক্ষুদ্র পয়েন্টগুলো ফিঙ্গারপ্রিন্টের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখে।
একটি ভালো কোয়ালিটির ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছবিতে ২৫–৮০টি পয়েন্ট ধরা হয় যা স্ক্যানারের রেজ্যুলেশন ও আঙুলের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে।
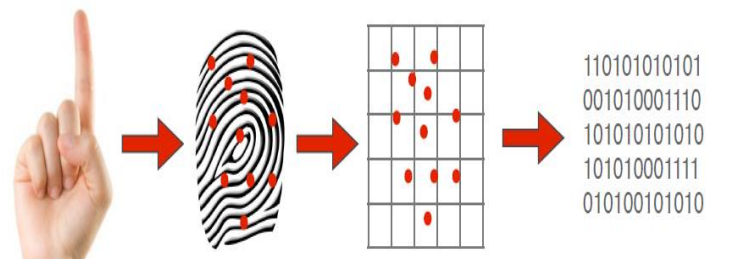
ক্ষুদ্র পয়েন্টগুলো রিজের লাইন বা শাখার ওপর নির্ভর করে। পয়েন্টের সংখ্যা অনেক রকমের হতে পারে, তবে সব পয়েন্টের ভিত্তি মূলত এই তিনটি –

১. Bifurcation:

রিজ চলতে চলতে দুই ভাগে ভাগ হলে সেখানে একটা পয়েন্ট ধরা হয়।

২. Ridge Ending:

রিজ যদি শেষ হয়ে যায় তখন সেখানে একটা পয়েন্ট ধরা হয়।

৩. Island:

যদি ফিঙ্গারপ্রিন্টে ছোটো রিজ থাকে তবে তাকে একটা পয়েন্ট ধরা হয়।
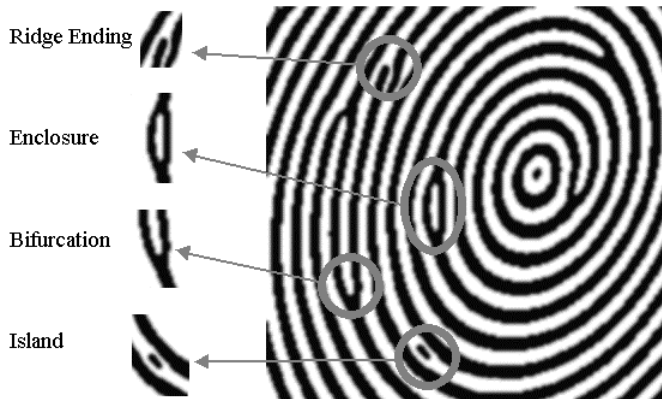
প্রসেস:

বেশিরভাগ ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার একই ধরনের হার্ডওয়্যার নীতির ওপর তৈরি করা হয়। তবে অতিরিক্ত ফিচার ও সফটওয়্যার প্রোডাক্টের পারফরম্যান্স-এ বড়ো ভূমিকা রাখে এবং গ্রাহক পর্যায়ে কী সুবিধা পাবে তাও নির্ধারণ করে।

স্ক্যানারের সাথে সংযুক্ত থাকে একটি/অনেকগুলো IC, যা স্ক্যান করা ডেটা বাইনারিতে রূপান্তর করে এবং মূল প্রসেসরে তা প্রেরণ করে। একেক ম্যানুফেকচার একেক রকমের ডেটা ব্যবহার করে ফিঙ্গারপ্রিন্টের মূল পয়েন্টগুলো শনাক্ত করতে, যা স্পিড ও অ্যাকুরেসিতেও প্রভাব ফেলে।

স্মার্টফোনে Minutiae বা ক্ষুদ্র পয়েন্টগুলোর বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি তুলে একটা ম্যাপ তৈরি হয়।
ম্যাপে পয়েন্টগুলো আকার, আকৃতি, এক পয়েন্ট থেকে অন্য পয়েন্টের দূরত্ব, অবস্থান থেকে অ্যালগরিদম তৈরি করে।
যার ফলে প্রতিবার পুরো ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানের দরকার হয় না। আঙ্গুলের কিছু পয়েন্টের স্ক্যান তার পূর্বের ম্যাপের সাথে কতটা সঙ্গতিপন্ন তা দেখা হয়। এর ফলে প্রসেসিং-এ পাওয়ার সেইভ হয়, আঙ্গুলে ময়লা থাকলেও ভুল রিডিং এর সংখ্যা কমায় এবং স্ক্যানারের সঠিক স্থানে আঙ্গুল না রাখলেও বেশ ভালোভাবে শনাক্ত করতে পারে।

আবার অ্যালগরিদম ডিভাইসে সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজন হয় এবং যেসব ডেটা এই অ্যালগরিদমের ক্ষতি করতে পারে সেগুলো থেকেও। ইউজার ডেটা অনলাইনের আপলোড করার চেয়ে ARM প্রসেসরে অ্যালগরিদমকে চিপে এনক্রিপ্ট রাখা হয় TEE (Trusted Execution Environment) ভিত্তিক ট্রাস্ট জোন টেকনোলোজির মাধ্যমে। এর ফলে অ্যালগরিদম OS বা কোনো অ্যাপস হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। TEE অংশটি অন্যান্য ক্রিপ্টোগ্রাফিক প্রসেসের জন্যও ব্যবহার করা হয় এবং সরাসরি প্রসেসর থেকে হার্ডওয়্যার বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিডারের সাথে ডেটা আদান প্রদান করে।
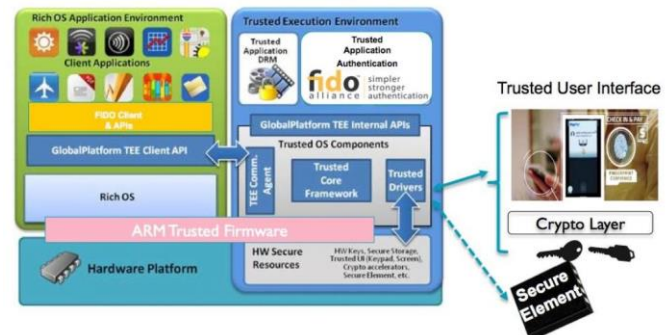
Fig 4. TrustZone based TEE with FIDO Trusted App, Trusted User Interface & encrypted channel to a secure element

স্ক্যানার:

একটি স্ক্যানারের কাজ দুইটা, প্রথমে আঙুলের ছবি তোলা, এবং রিজ ও ভ্যালির প্যাটার্ন পূর্বে স্ক্যান করা ম্যাপিং এর সাথে মিল খোঁজা।

অনেক উপায়ে আঙ্গুলের ছবি তোলা যায়, তবে স্মার্টফোনগুলোতে অপটিক্যাল স্ক্যানার ও ক্যাপাসিটিভ স্ক্যানার ব্যবহার খুবই কমন। বর্তমান স্মার্টফোনগুলোতে তিন প্রকারের স্ক্যানার ব্যবহার করা হয়। নিচে স্ক্যানারগুলো নিয়ে আলোচনা হলো।

ইন ডিসপ্লে অপটিক্যাল স্ক্যানার (In-display Optical scanner):

অপটিক্যাল স্ক্যানারের মূল অংশটি হলো Charge Coupled Device (CCD)। এটা একই সেন্সর যা ডিজিটাল ক্যামেরায় ব্যবহার করা হয়।

এতে থাকা photosites আলোর ফোটনের বিপরীতে ইলেকট্রিক সিগন্যাল তৈরি করে এবং প্রতিটা Photostites এর প্রাপ্ত সিগন্যাল সম্মিলিতভাবে ছবি তুলে।

অপটিক্যাল স্ক্যানার মূলত OLED ডিসপ্লেতে কাজ করে, কারণ শুধু OLED ডিসপ্লেতে ব্যাক প্লেইনের পেছনের ফাঁকা থাকে। যখন ডিসপ্লেতে আঙুল রাখা হয় তখন আলো জ্বলে ওঠে, যার প্রতিফলন নিচে থাকা স্ক্যানারে যায় এবং ছবি তোলে। বর্তমানের ফোনগুলোতে ০.৭ সেকেন্ড বা তার কম সময়েও ফিঙ্গারপ্রিন্ট ভেরিফাই করা সম্ভব।

এই পদ্ধতিতে মূলত 2D ছবি তোলা হয়।

বর্তমানে প্রায় সকল OLED প্যানেলে এই ধরনের সেন্সর ব্যবহার করা হয়।

Figure 2

ক্যাপাসিটেন্স স্ক্যানার (Capacitance scanner):
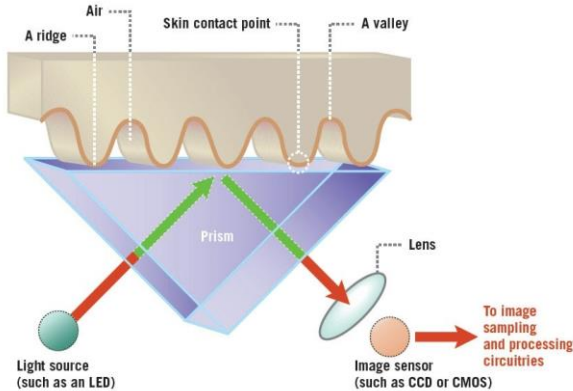
ক্যাপাসিটিভ স্ক্যানার অপটিক্যাল স্ক্যানারের মতোই ছবি তোলে, তবে এই পদ্ধতিটা বেশি নিরাপদ।

স্ক্যানার হিসেবে কোনো ক্যামেরা এর বদলে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয়, যার আকার ফিঙ্গারপিন্টের রিজের চেয়ে ছোটো।

ফিঙ্গারপ্রিন্টের রিজ যখন কনড্রাকটিভ প্লেটের ওপর রাখা হয় তখন রিজের স্পর্শ করা ক্যাপাসিটরের চার্জ চেইঞ্জ হয়, আর ভ্যালি অংশ স্পর্শ করে না করাই ক্যাপাসিরের চার্জ চেইঞ্জ হয় না। একটি অ্যাম্পলিফায়ার ইন্টিগ্রেটর সার্কিট এই পরিবর্তন চিহ্নিত করে যা অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টারে রেকর্ড হয় এবং ডেটা অ্যানালাইজ হয়। এই উপায়ে মূলত 2D ম্যাপিং হয়।

কনড্রাকটিভ প্লেটে যত বেশি ক্যাপাসিটর থাকবে, ম্যাপিং তত ভালো হবে এবং অ্যাকুরেসি ও সিকিউরিটি তত বেশি হবে। ০.৫ সেকেন্ডের কম সময়ে এই সেন্সর ভেরিফাই করতে পারে। আর স্ক্যানার ফিঙ্গারপ্রিন্ট বাদেও অন্যান্য ফাংশনেও ব্যবহার করা যায়।

ফোনের ব্যাকপ্যানেল ও ডিসপ্লের নিচে এই সেন্সর ব্যবহৃত হয়।
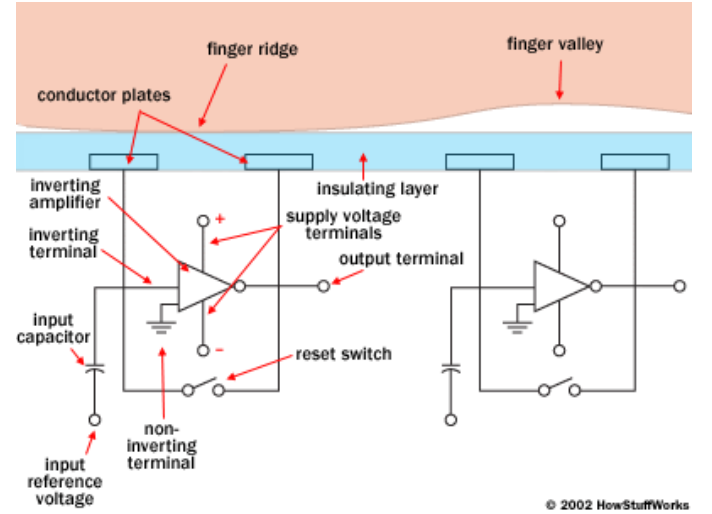
আল্ট্রাসনিক স্ক্যানার (Ultrasonic scanners):

এটি সর্বশেষ প্রযুক্তির স্ক্যানার যা মূলত শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে কাজ করে। Qualcomm ২০৬৫ সালে প্রথম ঘোষনা করে। এটিও OLED ডিসপ্লেতে কাজ করে, তবে আল্ট্রাসাউন্ড ফিঙ্গারপ্রিন্টের 3D ম্যাপ তৈরি করে যা অন্য স্ক্যানার থেকে অনেক বেশি সিকিউরড।

ফিঙ্গারপ্রিন্টের ডিটেইলস তোলার জন্য ডিসপ্লের নিচে সেন্সর থাকে, যাতে আল্ট্রাসাউন্ড ট্রান্সমিটার ও রিসিভার থাকে। যখন ডিসপ্লেতে আঙুল রাখা হয়, আল্ট্রাসাউন্ড তরঙ্গ আঙুলের দিকে প্রেরণ করা হয়। কিছু তরঙ্গ শোষণ হয় এবং কিছু সেন্সরের দিকে ফিরে আসে। ফিরে আসা তরঙ্গ থেকে রিজ, ভ্যালি নির্ণয় করা হয় এবং প্রথম দিকে বার বার স্ক্যান করার ফলে ডেটা থেকে ম্যাপিং 3D করা হয়।

স্যামসাংয়ের সর্বশেষ Note এবং S সিরিজে এই ধরনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহার করা হয়েছে।

ফিঙ্গারপ্রিন্টের অসুবিধা:

ফিঙ্গারপ্রিন্টের অনেক সুবিধা থাকলেও কিছু সেন্সরে বড়ো সমস্যা রয়েছে। যেমন – অপটিক্যাল স্ক্যানার ছবি ও আঙ্গুলের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। যার ফলে ছাঁচে ব্যক্তির ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়েও আনলক করা সম্ভব হয়।

এমনও হয়েছে অপরাধীরা ব্যক্তির আঙ্গুল কেটে নিয়েছে সিকিউরিটি সিস্টেমে সমস্যা না হওয়ার জন্য। কিছু স্ক্যানারে পালস ও হিট সেন্সর থাকলেও বিশেষ ছাঁচেও একে বোকা বানানো সম্ভব। আবার কখনও আঙ্গুলের ক্ষতি হলে, ভেরিফাই জটিলতায় পড়তে হয়। ফিঙ্গারপ্রিন্ট কেউ চুরি করলে তা যে-কোনো জায়গাতে আজীবন ব্যবহার করতে পারবে।

কিছু দুর্বলতা থাকলেও বায়োমেট্রিক সিস্টেম অনেক বেশি সিকিউরড মাধ্যম। ভবিষ্যতে এর ব্যবহার মানুষ প্রতিটা ক্ষেত্রে করবে, যেমনটা এখন চাবি, এটিএম কার্ড ও পাসওয়ার্ডের ব্যবহার করে। গবেষকদের ধারণা মতে, ২০৪০ সালে প্রতিটা ক্ষেত্রেই আমরা বায়োমেট্রিক পদ্ধতির ব্যবহার করব।

জিপিএস আমরা বিনামূল্যে ব্যবহার করি, তবে সেটা কিন্তু ফ্রি না। প্রতিমাসে ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হয় এর পেছনে, যেটি আমেরিকার কর রাজস্ব থেকে আসে।

অ্যালগরিদম

মো: আহনাফ সাদিক ইনান

ছোটোবেলায় যখন 'Algorithm' শব্দটা প্রথম শুনেছিলাম, ধরেই নিয়েছিলাম যে এটি 'Algebra'-এর সাথে সম্পর্কিত কিছু একটা হবে। কোনো এক সেন্সে হয়তো হতেও পারে। কিন্তু সেটি নিয়ে ভাবতে চাইছি না। যা চাইছি তা হলো, এই অভিজাত ভাবসম্পন্ন একটি শব্দ 'Algorithm' কী এবং প্রোগ্রামিং-এর সাথে এর সম্পর্কটাই বা কী তা বুঝতে।

তো Algorithm হচ্ছে মূলত কিছু series of steps বা ধাপে ধাপে কিছু করা। হ্যাঁ, এটুকুই। আপনার, আমার কাছে ব্যাপারটা প্রথম শুনলে খুবই সহজ মনে হলেও হতে পারে, কিন্তু এটাই হলো সেই ভুলটা, যেটা আমাদের প্রোগ্রামিং বা অ্যালগরিদম সহজে লিখতে বা বুঝতে দেয় না। আমরা এই সহজ ব্যাপারটার সাথে এতটাই সংযুক্ত যে সেই সহজ বিষয়গুলো নিয়ে ভাবি না। একটা উদাহরণ দিই।

ধরুন আপনি একদিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে কোথাও যাচ্ছিলেন, আর আমি আপনাকে ডেকে বললাম, "ভাই, আপনি কি আমায় একটু হাঁটা শেখাবেন?"

আমি নিশ্চিত যে আপনি অবাক হয়ে বলবেন, "এটা আদৌ জিজ্ঞেস করার কিছু না কি?" খুব সম্ভবত বিশ্বাস না করে পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন। কিন্তু চিন্তা করুন, ব্যাপারটা কি এতটাই সহজ?

প্রথমত আপনার মেরুদণ্ড ও পেশিতে আপনার শরীরের ওজন সহনের জন্য পর্যাপ্ত শক্তির ও কার্যকারিতার প্রয়োজন হবে। এরপর আপনাকে দুপায়ে সঠিকভাবে ভারসাম্য রক্ষা করা জানতে হবে। এক পায়ে সাপোর্ট ঠিক রেখে, অন্য পায়ের হাঁটু ভাঁজ করে, ঊরুর ওপরের পেশি প্রসারণ ও নিচের পেশির সংকোচন করে, মাধ্যাকর্ষণ

ব্যবহার করে, আপনার ভর সামনের দিকে পড়তে পড়তে আবারও সেই হাঁটু সোজা করে, ঊরুর পেশির সংকোচন ও নিচের পেশির প্রসারণ ঘটিয়ে সেই পায়ে সাপোর্ট নিয়ে এসে অন্য পায়ে এই পুরো প্রসেসটির রিপিট করতে হবে এবং এই পুরো ব্যাপারটি বারবার করা বা এর লুপ তৈরির মাধ্যমে আপনি হাঁটতে পারবেন। অথচ আপনি এত কিছু চিন্তা না করেই সিম্পলি হেঁটেই যাচ্ছেন।

না, আমি বলছি না যে এটা খারাপ কোনো কিছু। সত্যি বলতে আমাদের মানুষদের মাথা স্বাভাবিক রেখে চলার জন্য এবং অল্প বয়সে পাগল না হওয়ার জন্য একটা খুবই ভালো বৈশিষ্ট্য হলো, একটা সরল ব্যাপার নিয়ে বেশি না ভাবা। এরকম অনেক কিছুই শুধু একবার শেখার পর তা আমরা ইন্সটিঙ্কটের হাতে ছেড়ে দিই এবং জীবনেও তা নিয়ে আর ভাবি না, যদি না প্রয়োজন হয় তো।

এখন জন্মের পর এরকম কত ইন্সটিঙ্কট নিয়ে আমরা চলাফেরা করছি, একটু ভাবুন তো। হাঁটা, শ্বাস নেওয়া, কথা বলতে পারা, হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরা, সাঁতার কাটা, দেহের যে-কোনো নড়ন, চোখ দিয়ে দেখে বস্তুর দূরত্ব নির্ণয় ইত্যাদি। লিখতে গেলে কতই না লেখা যায়।

আচ্ছা, জৈবিক ছাড়াই চিন্তা করুন তো। প্রথম যখন সাইকেল চালাতে শিখেছেন, আর একবার শিখে যখন তা ইন্সটিঙ্কটের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, অথবা আমার কথাই বলি, 'Harry Potter'-এর থিমটা এখনও দিব্যি গিটারে বাজাতে পারি, কিন্তু একটা নোট বা সুর মনে নেই। পিওর ইন্সটিঙ্কট দিয়ে সুর উঠছে। আবার এই যে এই লেখাগুলো আপনি পড়ছেন,ভাবুন তো প্রতিটা অক্ষর কী তা কি আপনাকে আলাদা করতে চিন্তা করতে হচ্ছে?

তো এতক্ষণ বকবক করার সারমর্মটি হচ্ছে, আমরা এই প্রত্যেকটা ধাপ চিন্তা করে কোনো কিছু করাতে অভ্যস্ত না। আমরা যতটা সম্ভব কোনো অ্যালগরিদম একবার শিখে ওই ইন্সটিঙ্কট ব্যাপারটার ওপর ছেড়ে দিই বা দিতে চাই এবং এই কারণেই অ্যালগরিদমের মতো একটা বিষয়ের অতীব সরলীকরণ বুঝতে আমাদের সমস্যা হয়। ওটা মোটেও আপনার বোঝার অক্ষমতা নয়; শুধু আমাদের অভ্যাসের দোষ।

ওপরের আলোচনা থেকে কি অ্যালগরিদম ব্যাপারটা কী হতে পারে, সে সম্পর্কে একটু ধারণা পেয়েছি?

"সুসংজ্ঞায়িত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে যুক্তিযুক্ত ধাপে ধাপে কিছু করা।"

মনে করুন, একটা স্যান্ডউইচ বানানোর অ্যালগরিদম কেমন হতে পারে? সহজ, তাই না?

১. শুরু।
২. একটা পাউরুটি নিন।
৩. জ্যাম লাগান।
৪. অন্য কিছু পছন্দ হলে তা লাগান বা রাখুন।
৫. আরেকটি পাউরুটি তার ওপরে রাখুন।
৬. শেষ।

ব্যস, এই কয়েকটি ধাপ যে কখনো স্যান্ডউইচ দেখেনি বা চেনেও না তাকে দিন সে বানিয়ে নিতে পারবে! এটা একটি অ্যালগরিদম (সেই সেন্সে প্রতিটা খাবারের রেসিপিও একেকটি অ্যালগরিদম এবং তা সত্য)।

খেয়াল করুন, এখানে কিন্তু আমরা ধরেই নিয়েছি যে পাউরুটি, জ্যাম বা অন্য কিছু আগে থেকেই বানানো আছে বা এই অ্যালগরিদমের ইউজার জানে যে কী করে সেগুলো সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু এমন কোনো ইউজার যদি আসে যে এগুলোও জানে না তখন? সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যালগরিদমটা আরও বড়ো করতে হবে। কী করে রুটি বা জ্যাম বানায় সেগুলোও যোগ করতে হবে। তখন কিন্তু অ্যালগরিদমটি এত ছোটো বা সহজ হবে না। প্রতিটা স্টেপের জন্যে আরও সাব-স্টেপ থাকবে। কিন্তু তখন ব্যাপারটা আরও জেনেরাল হবে, অর্থাৎ সহজে না হলেও আরও বেশি সংখ্যক মানুষ কাজটি করতে পারবে।

আচ্ছা, এখন একটি ম্যাথেমেটিক্যাল উদাহরণ নিয়ে চিন্তা করি। আপনি কি ভাগ করতে পারেন? যদি বলি, পারেন না? তাহলে কি রাগ করবেন? খুব সম্ভবত আপনিও আমার মতো ব্যাপারটা মুখস্থ করেই এসেছেন। আমরা ভাগ করতে পারি, কারণ আমরা গুণ করতে পারি বা নামতাগুলো আমাদের মুখস্থ আছে। গুণ যদি না করতে পারতাম তাহলে কি ভাগ সম্ভব হতো? ভাগের নিয়ম চিন্তা করুন তাহলেই বুঝে যাবেন যে, না। গুণ ছাড়া ভাগ সম্ভব হয় না। এখন গুণ কী? গুণ হচ্ছে যোগের লুপ, মানে দশবার তিনকে যোগ করার নামই হলো 10×3, তাই না? তাহলে যদি আপনাকে বলি, আপনি এই যোগ ছাড়া কিছু পারেন না? অন্য কোনো মুখস্থ নিয়ম আপনার জানা নেই? আপনি শুধু এই ভাগ কী, গুণ কী তা জানেন

এবং আপনি শুধু যোগ করতে পারেন, আর কিছু না? এখন আমাকে একটি নিয়ম বের করে দিন, যার মাধ্যমে আমি ১৬কে ৩ দ্বারা ভাগ করতে পারি বা ছোটো ক্লাসের স্টাইলে বলি ১৬টি আম তিন জন বন্ধুর মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দিন।

থামুন এবং ভাবুন (না পারলে ক্ষতি নেই, এই ব্যাপারটাই আমরা ওভারকাম করতে চাইছি)।

চলুন, একসাথে চিন্তা করতে করতে এই নিয়মটা বের করার চেষ্টা করি।

প্রথমত আমরা যেটা করতে পারি তা হলো, চলুন-না তাস বাটি। মানে,
ধাপ ১: তিনজনকে একটা একটা করে আম দিতে থাকি, অর্থাৎ ম্যাথেমেটিক্যালি একটা একটা করে ১ যোগ করতে থাকি ৩ জনে।

এবার এক রাউন্ডে কতটি করে আম যাবে? ৩টি, তাই না? যেহেতু তিনজনকে একটি করে আম দিচ্ছি।

ধাপ ২: তাহলে এরকম কতটি রাউন্ড হলে আমার ১৬টা আম শেষ হবে? ৩ এর সাথে তিন যোগ করতে থাকি। দেখি, কত নম্বর রাউন্ডে তা ১৬ হয়।

০+৩=৩, রাউন্ড ১
৩+৩=৬, ১৬ হয়নি, রাউন্ড ২
৬+৩=৯, ১৬ হয়নি, রাউন্ড ৩
৯+৩=১২, ১৬ হয়নি, রাউন্ড ৪
১২+৩=১৫, এখনো ১৬ হয়নি, রাউন্ড ৫
১৫+৩=১৮, এটা ১৬ এর থেকে বেশি। তাই এই রাউন্ডটা ধরলাম না।

ধাপ ৩: ৫ম রাউন্ডে ১৫টি আম সমান ভাগে ভাগ হয়ে গেল। কিন্তু এর পরের রাউন্ডে ১৮ হওয়ার কথা কিন্তু ১৮টি আম তো আমাদের কাছে নেই। তার অর্থ হলো ১৬টি আম ৩ জনকে দিলে সর্বোচ্চ ৫ বারে সমান ভাগে ভাগ সম্ভব।

ধাপ ৪: তাহলে কয়টি আম সমান ভাগে ভাগ হলো? ওপরের হিসাবে ৫ম রাউন্ড দেখলে বুঝতে পারবেন ১৫টি (এটাকেই আমরা ব্যাসিক্যালি 3×5=15 বলি)। অর্থাৎ ১৬-১৫=১টি আম অতিরিক্ত থাকল, যেটি আমাদের ভাগশেষ।

হুহ, অনেক কিছু করে ফেললাম! ধাপ চারটি বোঝা শেষ। এখন এটাকে সহজে লিখে ফেলি,

যদি ১৬কে ৩ দিয়ে ভাগ করতে হয় তো,

ধাপ ১: ৩কে একটি রাউন্ড ধরব।

ধাপ ২: একটি একটি করে রাউন্ড বাড়াতে থাকব।

ধাপ ৩: যে তম রাউন্ডে ১৬ এর সমান আসবে, সেটি অথবা যে তম রাউন্ডে ১৬ থেকে বেশি আসবে, তার আগের রাউন্ডটিকে ভাগফল বহনকারী রাউন্ড হিসেবে নেব। রাউন্ড সংখ্যাটাই হবে ভাগফল (কারণ ওটাই ভাগের সংজ্ঞা)।

ধাপ ৪: ভাগফল বহনকারী রাউন্ডে প্রাপ্ত যোগফলটি ১৬ থেকে বিয়োগ করব। ওটাই হবে আমাদের ভাগশেষ।

ব্যস, ১৬কে ৩ দিয়ে ভাগ করার নিজের হাতে তৈরি অ্যালগরিদম আমরা পেয়ে গেলাম! মজার ব্যাপারটা কী, সেটা কি জানেন? এটা শুধু ১৬কে ৩ দিয়ে ভাগ করার না। ১৬ এবং ৩ এর জায়গায় যে-কোনো সংখ্যা বসিয়ে দিয়ে দেখুন। তার জন্যে সত্যি হবে।

অর্থাৎ, যে-কোনো সংখ্যা a কে b দিয়ে ভাগ করতে চাইলে (এটা না পড়লেও চলবে),

ধাপ ১: b কে একটি রাউন্ড ধরব।

ধাপ ২: একটি একটি করে রাউন্ড বাড়াতে থাকব।

ধাপ ৩: যে তম রাউন্ডে a এর সমান আসবে তা, অথবা যে তম রাউন্ডে a থেকে বেশি আসবে তার আগের রাউন্ডটি ভাগফল বহনকারী রাউন্ড হিসেবে নেব। তমটিই হবে ভাগফল (কারণ ওটাই ভাগের সংজ্ঞা)।

ধাপ ৪: ভাগফল বহনকারী রাউন্ডে প্রাপ্ত যোগফলটি a থেকে বিয়োগ করব। ওটাই হবে আমাদের ভাগশেষ।

অর্থাৎ, শুধু ১৬ এর স্থলে a এবং ৩ এর স্থলে b বসিয়ে দিলাম।

হয়ে গেল আমাদের ভাগের অ্যালগরিদম। a ও b এর মান যাই বসান, ওই দুটো সংখ্যার একটিকে অপরটি দিয়ে ভাগ করতে পারবেন। জানি, একটু জটিলই ছিল, কিন্তু বুঝতে চেষ্টা করুন। এই গাণিতিক উদাহরণটির আগে কী কী আরও বলেছিলাম তা একটু ভাবুন। স্টেপগুলো লজিক্যালি ভেবে বের করাটাই হলো চ্যালেঞ্জ। এই কাজটা করতেই কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামাররা এত আনন্দ পায়। যখন বারবার ভুল করে মাথা খাটিয়ে অনেকক্ষণ পর কাঙ্ক্ষিত ফলাফল চলে আসে, সেটায় যে কী তৃপ্তি! উদ্দেশ্য ও সংজ্ঞা আপনার সামনে, এখন রাস্তাটা খুঁজে বের করুন; যেন একটি জড় পদার্থ যার বিন্দুমাত্র ইন্সটিঙ্কটও নেই (যেমন কম্পিউটার), সেও অনায়েশে এই কাজটা করতে পারে। তাই অবশ্যই একটি ধাপের সাথে আরেকটি ধাপের লজিক্যাল সম্পর্ক থাকতে হবে।

এখন কি এই একটা কাজ করার উপায় একটাই? অবশ্যই না। খেয়াল করুন ওপরে যে ভাগ করার প্রক্রিয়াটা আমরা বের করলাম এটা অনেক অনেক স্লো। একটা বড়ো সংখ্যা নিন। হাতে হাতে করতে বারোটা বেজে যাবে। ২য় ধাপের এতগুলো যোগ। তার অর্থ হলো, অবশ্যই এটা করার আরও সহজ পদ্ধতি আছে। হ্যাঁ, আছে, একটা হতে পারে, আপনি এমনিতেই ক্লাসে যে পদ্ধতিটা শিখেছেন ওটাই। পুরো সংখ্যাটাকে ভাগ না করে প্রতিটা অঙ্ককে ভাগ করা। ওটার অ্যালগরিদম আপনি জানেনই। তাই বললাম না নিজে একবার খাতায় ধাপগুলো সাজানোর চেষ্টা করে দেখুন তো, পারেন কি না। তাছাড়াও আরও অনেক পদ্ধতি আপনি চিন্তা করেই হয়তো বের করে ফেলতে পারবেন।

আমি ওপরে 'প্রোগ্রামার' ও 'প্রোগ্রামিং' শব্দগুলো ব্যবহার করলাম। এগুলো আবার কী!? পৃথিবীতে কত শত ভাষা আছে, জানেন কি? গুগলে একটা সার্চ দিয়েন। হতবাক হয়ে যাবেন। আমি যদি কোনো একটা কাজকে ওপরের উদাহরণের মতো করে উপস্থাপন করতে চাই, তবে তা কোন ভাষায় করব? ওপরে তো বাংলা ও সামান্য ইংরেজিতে করলাম, আর এটা আবার কম্পিউটারকেও বোঝাতে হবে। শুধু আপনি আমি বুঝলেও হবে না। সেই জন্যেই চলে আসে আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ ভাই। তিনি নিজে এমন একটি সিম্পলিফাইড ভাষা যিনি কোনো অতিরঞ্জনকরণে বিশ্বাসী না। অর্থাৎ আপনি আমি হয়তো বাংলায় কম্পিউটারকে ১৬ কে ৩ দিয়ে ভাগ করতে বলার জন্য এভাবে বলতে পারেন, "হে আমার প্রিয়তমা কম্পিউটার, সাড়া দাও। ১৬ কে ৩ দ্বারা ভাগ করে স্ক্রিনে দেখাও।"

কিন্তু এত শব্দের অপব্যবহার প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ করতে চাইবে না। যেমন পাইথন কাঠখোট্টা ভাই সোজাসুজি বলে দেবে,
"Print (16/3)."

এটাই। অন্য ল্যাংগুয়েজে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সুবিধার কথা চিন্তা করে বিভিন্ন syntax হতে পারে।

এখন ভাগের সব থেকে সহজ অ্যালগরিদম পাইথনে সেট করাই আছে। তাই ১৬/৩ বললেই সে অটোমেটিক সেই অ্যালগরিদম এক্সেকিউট করে অথবা ওপরে আমাদের নিজেদের আবিষ্কৃত অ্যালগরিদম দিয়েই ভাগ করার চেষ্টা করতে পারি।

এখানে একটা মজার কথা বলে রাখি। ধরুন একটি কম্পিউটার ১ বিলিয়ন কোডের লাইন ১ সেকেন্ডে এক্সিকিউট করতে পারে। অর্থাৎ আমাদের ওপরের ভাগের অ্যালগরিদমটি ৩ বিলিয়ন সংখ্যাটিকে ৩ দিয়ে ভাগ করার জন্যে ১ বিলিয়ন বার যোগ অপারেশন করবে, যাতে তার ১ সেকেন্ড সময় লাগবে। চিন্তা করুন, যদি এরকম ১ বিলিয়ন বিলিয়ন বার যোগ করতে হয় তখন? (বিশ্বাস করুন, আধুনিক তথ্যবহুল জগতে এটা খুবই নগণ্য সংখ্যা) সামান্য একটা ভাগের অঙ্ক করতে তার ১ বিলিয়ন সেকেন্ড (প্রায় ৩১ বছর লেগে যাবে)। তাই অবশ্যই আমাদের ওপরের অ্যালগরিদমটি সব থেকে এফিসিয়েন্ট নয়।

প্রোগ্রামিং হলো অ্যালগরিদমের কার্যকর ব্যবহার। কম্পিউটার এমন একটি যন্ত্র, যা আমাদের কাছে আপাতদৃষ্টিতে কঠিন কাজ অতীব দ্রুত করে ফেলতে পারে। ওপরেই দেখুন-না আমাদের অ্যালগরিদমটিতেই ১ বিলিয়ন অবধি ক্যালকুলেশন ১ সেকেন্ডে করে ফেলছে। হাতে হাতে করতে শুরু করুন, পুরো জীবনেও শেষ করতে পারবেন না। তাই কম্পিউটারের এই মহান ক্ষমতা দ্রুত করতে পারাকে কাজে লাগিয়ে আমরা এমনও অসাধ্য সাধন করছি, যা আমাদের স্বপ্নেরও বাইরে ছিল এক সময়। আমি তো শুধু একটি ইনট্রো দিলাম।

অ্যালগরিদম লেখা একটা সিঁড়ি বেয়ে ওঠার মতো। কিন্তু সেই সিঁড়ির প্রতিটা ধাপও আপনাকে নিজে নিজে তৈরি করে নিতে হবে। অর্থাৎ, এই পুরো প্রসেসটাতেই একটা চরম মাত্রার নিজস্বতা

আছে। এটাই কোডিং-এর আনন্দ। আপনার নিজের সৃষ্টির সাফল্য নিজে দেখতে পারবেন, তা ইচ্ছামতো পরিবর্তনও করতে পারবেন। একটি ক্যারেক্টার বিল্ডিং আরপিজির মতো চিন্তা করা যেতে পারে। আর কীরকম জিনিস তৈরি করতে পারেন তা তো আপনাদের হাতের মুঠোতেই প্রতিদিন ঘোরাফেরা করছে।

শুরুতে কী বলেছিলাম, মনে আছে? আমরা ইন্সটিঙ্কট দিয়েই কাজ করতে পছন্দ করি। তো এতক্ষণ অ্যালগরিদম বলতে আমরা যা বুঝলাম, তা হতে কি আমরা এটা বলতে পারি যে, ইন্সটিঙ্কট হলো আমাদের নিজেদের মস্তিষ্কের অ্যালগরিদম ধারণের জায়গা যে একবার ওটা শিখে সেট করে দিই, এরপর সে নিজে নিজেই তা মেনে ওই কাজ সম্পন্ন করে। চিন্তা করুন, বস্তুজগৎও কিছু অ্যালগরিদমের সমন্বয়েই চলে, তা খুঁজে বের করার কাজটাই করছেন বিজ্ঞানীরা। যা-হোক, সেটা অন্য দিনের আলোচনার বিষয়।

প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ দিয়ে আমরা কম্পিউটারের বোধগম্য অ্যালগরিদম লিখি। প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ দিয়ে আমরা যা ইচ্ছা তাই নির্দেশনা দিই, সেটা আবার অ্যালগরিদম রিলেটেড নাও হতে পারে। কারণ অ্যালগরিদমের সুনির্দিষ্ট ফলাফল থাকতে হবে, কিন্তু প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ দিয়ে আপনি হিজিবিজি যা ইচ্ছা লিখতে পারেন। একটি প্রোগ্রামের একাধিক অ্যালগরিদম থাকা সম্ভব।

এই আলোচনার মূল টেইকওয়ে ছিল অ্যালগরিদমের মৌলিক সংজ্ঞাটা বোঝা এবং প্রোগ্রামিং সম্পর্কে সামান্য ধারণা লাভ করা। এটা প্রচণ্ড বিস্তর একটি বিষয়,, যা নিয়ে কাজ করতে আপনি আপনার পুরো জীবনটাই অতিবাহিত করতে পারবেন।

ইমেইলের অস্তিত্ব World Wide Web যুগের আগে ছিল। Ray Tomlinson ১৯৭১ সালের আগেই প্রথম মেইক প্রেরণে সক্ষম হয়েছিলের।
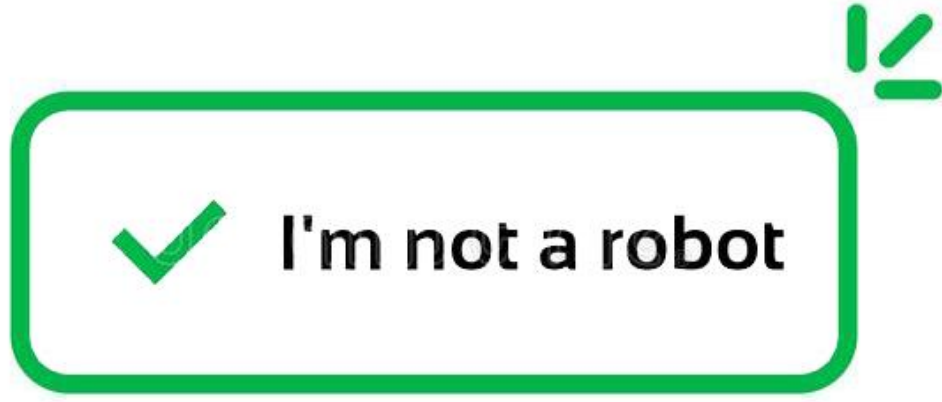
বিরক্তিকর “আমি রোবট নই”

তাজউদ্দিন আহমেদ

কিহ! “আমি রোবট নই” পরিক্ষা দিতে হবে?
নাহ,
কিছুতেই মানা যাবে না।
এত বড়ো অপমান!
মানুষ হয়ে আমাকে কিনা মানুষ হওয়ার প্রমাণ দিতে হবে!
টাকা দিয়ে ইন্টারনেট ডেটা কিনে কি এরকম হেনস্তা হবার জন্য ইন্টারনেট চালাই?
বিরক্তিকর!

ওয়েট, থামেন!
আপনি যেটাকে অর্থহীন অপমান ভাবছেন, সেটার আসলে গুরুত্ব আছে।
কীসের গুরুত্ব?

ক্যাপচার কথা বলছেন তো?
ইয়েস।
ইন্টারনেটে অনেক সময় আপনাকে যে বিরক্তিকর একটা টাস্ক দেওয়া হয় 'I'm not a robot' আর তা প্রুফ করতে বলে–সেটার কথাই বলছেন তো!
নানা ছবি, অক্ষর বা সংখ্যা–এগুলো মিলিয়ে আপনাকে প্রমাণ করতে হয় আপনি মানুষ, রোবট না – সেটার কথাই তো বলছেন, তাই না?

তাহলে শুনুন, মশাই।

এটার প্রয়োজনীয়তা কী, এটার ইতিহাস কী, সেটা জেনে আসি।

ইংরেজিতে CAPTCHA শব্দটির পূর্ণরূপ হলো: Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষ এবং কম্পিউটার এর মধ্যে পার্থক্য যাচাইকরণের প্রক্রিয়াকে বলা হয় ক্যাপচা।

এই যে নানা সাইটে আপনি ঘুরে বেড়ান, নানা ধরনের কাজ করেন, এগুলো কি আপনি করছেন না কি কোনো রোবট করছে সেটাই যাচাই করা হয় এটা দ্বারা।

কীভাবে এলো এই ক্যাপচা?
ইন্টারনেট যুগের প্রথম দিকে স্প্যামাররা বিভিন্ন ইন্টিলিজেন্ট প্রোগ্রাম দিয়ে নানা অপরাধমূলক কাজ করে বেড়াত।

এই ধরুন, কোনো ইন্টারেস্টিং মুভি রিলিজ হতে চলেছে। মানুষ খুব উৎসাহী সেই মুভি দেখার জন্য। তো একজন স্প্যামার কী করল, সে একটা শক্তিশালী বট প্রোগ্রাম ব্যবহার করে অনেকগুলো টিকিট এক রাতেই কিনে নিলো। তার উদ্দেশ্য হলো টিকিটগুলো কালোবাজারে বেশি দামে বিক্রি করে সে প্রচুর টাকা আয় করবে। একা একা তো আর বসে বসে এই বোরিং কাজ করতে পারবে না, তাই সে বট ব্যবহার করল।

আবার ধরুন, কোনো এক ওয়েবসাইটে একটা অনলাইন জরিপের আয়োজন করা হয়েছে। একদল লোক চায় নির্দিষ্ট একটা পক্ষকে জেতাতে। তাই তারা করল কী, একটি বুদ্ধিমান প্রোগ্রাম ব্যবহার করে কয়েক হাজার ভোট সেখানে দিয়ে দিলো। ব্যস!

ইন্টিলিজেন্ট প্রোগ্রাম ব্যবহার করে এই ধরনের অসৎ কাজ আটকানোর জন্যই এই ক্যাপচার জন্ম হয়েছে।

ক্যাপচা সর্বপ্রথম কে বা কারা ব্যবহার করেছেন, সেটা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।
দুটি দল ক্যাপচাকে তাদের নিজেদের সৃষ্টিকর্ম বলে দাবি করে। প্রথম দলটি হলো মার্টিন অ্যাবাডি, কৃষ্ণ ভরত এবং আন্দ্রেই ব্রোডার এর। ইনারা ১৯৯৭ সালের দিকে Altavista -তে তাঁদের সার্চ ইঞ্জিনে বট প্রোগ্রাম দ্বারা URL যুক্ত করাকে আটকানোর জন্য ক্যাপচা ব্যবহার করেন।
একই সাথে লুইস ভিন অ্যান, ম্যানুয়েল ব্লুম ও নিকোলাস হপারের অন্য একটি টিমও দাবি করেন যে, তাঁরাই প্রথম গ্রাফিক্যাল ক্যাপচা ব্যবহার করেছিলেন। দুটি টিমই যথাক্রমে ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালে তাঁদের পেটেন্ট পাবলিশ করেন। অনেক জায়গায় লুইস ভিন অ্যানকেই আধুনিক ক্যাপচার জনক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
এরপর থেকে বিভিন্ন সাইটে বট প্রোগ্রাম আটকানোর জন্য বহুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ক্যাপচা পদ্ধতি।

ক্যাপচা কীভাবে কাজ করে?
ক্যাপচায় সাধারণত ব্যবহারকারীকে কিছু বিশেষ ছবি, অক্ষর বা সংখ্যা শনাক্ত করতে দেওয়া হয়। অক্ষরগুলো সাধারণত আঁকাবাঁকা থাকে এবং ছবিগুলোতেও অনেকগুলো বস্তু থেকে একটা নির্দিষ্ট বস্তু শনাক্ত করতে হয় যেটা বট প্রোগ্রাম সহজে বুঝতে পারে না কিন্তু একজন মানুষ সহজেই বুঝতে পারে। এভাবেই ক্যাপচার সাহায্যে বট প্রোগ্রাম দ্বারা অপরাধ সংগঠিত করাকে আটকানো হয়।

ক্যাপচার নানা ধরনের প্রকারভেদ রয়েছে।

টেক্সট ক্যাপচা:
টেক্সট ক্যাপচাতে সাধারণত কিছু আঁকাবাঁকা অক্ষর দেওয়া থাকে যা একজন মানুষ বুঝতে পারে। এই অক্ষরগুলো একটি নির্দিষ্ট ঘরে লিখে সাবমিট করতে হয় কিংবা 'I'm not a robot' লেখাযুক্ত বক্সে টিক চিহ্ন দিতে হয়। অক্ষরগুলো সাধারণত 7ƒ⫫ ⧺乂 ধরনের নানা ফন্টের আঁকাবাঁকা অক্ষর হয়।

গাণিতিক অপারেশন:
এ ধরনের ক্যাপচায় সাধারণত কোনো গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে দেওয়া হয়। যেমন: 2×2=? বা 3+5×6=? ইত্যাদি দেওয়া থাকে। সমস্যাটি সমাধান করে এর নির্দিষ্ট উত্তর যথাস্থানে লিখে ক্যাপচা পূরণ করতে হয়। অক্ষরগুলো সাধারণ নিউমেরিক ফন্টে থাকে না, অনেক সময় আঁকাবাঁকা টাইপের থাকে।

সাউন্ড আইডেন্টিফিকেশন:
এ ধরনের ক্যাপচায় আপনাকে শব্দ শোনানোর ব্যবস্থা থাকবে। শব্দটি শুনে তা সঠিক স্পেলিং সহকারে নির্দিষ্ট স্থানে লিখে ঘর পূরণ করতে হয়।

হানিপট:
আধুনিক ক্যাপচাগুলোর মধ্যে মোটামুটি নিরাপদ ও উন্নত ক্যাপচা হলো হানিপট।
আগের তিনটি ক্যাপচা পদ্ধতিকে ওভারকাম করার মতো বটও তৈরি হয়েছে। কিন্তু ক্যাপচা পূরণ করার মতো ইন্টিলিজেন্ট বটও এখানে এসে ধরা খেয়ে যায়।
এ পদ্ধতিতে কিছু দৃশ্যমান শূন্যস্থানের পাশাপাশি কিছু অদৃশ্য শূন্যস্থানও দেওয়া থাকে। কোনো মানুষ যখন ক্যাপচাটি পূরণ করবেন তিনি শুধু দৃশ্যমান শূন্যস্থানগুলো পূরণ করবেন কারণ তার চোখে অদৃশ্য শূন্যস্থানগুলো ধরা পড়ে না। কিন্তু একটি বট

অদৃশ্য শূন্যস্থানগুলোও পূরণ করে ফেলে কারণ সে সেগুলোকে চিহ্নিত করতে পারে। ফলে বট ধরা পড়ে যায়।

পিকচার আইডেন্টিফিক্যাশন:

এ ধরনের ক্যাপচাই বর্তমানে আমাদের বেশি চোখে পড়ে। এতে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক কিছু ছবি দেওয়া হয়। অনেকগুলো ছবি থেকে সেই বিষয় সম্পর্কিত সঠিক ছবিগুলো বাছাই করতে হয়। যেমন আপনাকে ছয়টি ছবি দেওয়া হলো। এখানে তিনটি মোটরসাইকেলের ছবি রয়েছে এবং তিনটি ভিন্ন কোনো বস্তুর ছবি রয়েছে। আপনাকে সঠিক ছবি অর্থাৎ মোটরসাইকেলের ছবিগুলো বেছে নিতে হবে। ভুল কোনো ছবি গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ধরনের ক্যাপচাকে আরও নিরাপদ করার জন্য খুব ছোটো অবজেক্ট বা একটি অবজেক্টকে কয়েকভাগে বিভক্ত করে শুধু নির্দিষ্ট কিছু অংশ বেছে নিতে বলা হয়। যেমন: একটি রোড থেকে শুধু ক্রসওয়াকের ছবিগুলো বেছে নিতে দেওয়া হয়। অনেক সময় খুব ছোটো ও লো কোয়ালিটির ছবি দেওয়া হয় যেটা বট তো বটেই, মানুষেরও বুঝতে অসুবিধা হয়। তাই এটি মোটামুটি একটি সুবিধাজনক ও আধুনিক ক্যাপচা পদ্ধতি।

নো ক্যাপচা রিক্যাপচা:

এটি গুগল দ্বারা উদ্ভাবিত খুবই অত্যাধুনিক একটি ক্যাপচা পদ্ধতি। এক্ষেত্রে কোনো আলাদা টাস্ক নয় বরং শুধু 'I'm not a robot' লেখাযুক্ত একটি সাধারণ চেক বক্স থাকে। কিন্তু এতেই রয়েছে এর কেরামতি। কোনো বট সাধারণ চেকবক্সের মাঝখানে পার্ফেক্টলি ক্লিক করে যেটা মানুষের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। তাই এই পদ্ধতির সাহায্যে সুনিপুণভাবে বটের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়।

ইনভিজিবল রিক্যাপচা:

এটি আরও অত্যাধুনিক একটা ক্যাপচা পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ব্যবহারকারীকে কিছু আইডেন্টিফাই করতে হয় না, বরং ক্যাপচাই ব্যবহারকারীকে চিহ্নিত করে। কোনো সাইটের কোনায় বা নির্দিষ্ট স্থানে ছোট্ট করে এই ক্যাপচার একটি লোগো থাকে। এর কাজ হলো ব্যবহারকারীর গতিবিধির ওপর নজর রাখা। অর্থাৎ, এটি এমনভাবে প্রোগ্রাম করা যাতে ওয়েবসাইট নিজেই বটকে পাকড়াও করতে পারে।

ধরুন, কেউ বট দিয়ে কোনো মুভি টিকিট বিক্রয়ের সাইটের সবগুলো টিকিট একসাথে কেনার পরিকল্পনা করেছে। বট খুব দ্রুতই সে কাজগুলো সম্পন্ন করে ফেলবে, যা মানুষের পক্ষে অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তখন এই ক্যাপচা তার মুভমেন্ট ট্র্যাক করে তাকে পাকড়াও করে ফেলবে।

সুইট রিক্যাপচা:

এ ক্যাপচা ব্যবস্থা অনেকটা পিকচার পাজল মেলানোর মতো। আপনাকে একটি ছবির কিছু এলোমেলো অংশ দেওয়া হবে, সেখান থেকে অংশগুলো নাড়াচাড়া করে আপনাকে ছবিটি মেলাতে হবে।

মজার না? এটিও একটি উন্নত ও আধুনিক ক্যাপচা।

তাহলে বুঝলেন তো, মশাই?

যে জিনিসটাতে আপনি এত্ত বিরক্ত হন, সেটার প্রয়োজনীয়তা কতখানি? এই বোরিং ক্যাপচাই অনেক ওয়েবসাইটকে স্প্যামারদের হাত থেকে রক্ষা করে। আটকে দেয় অনেক অপরাধ। যদিও স্প্যামাররাও আজকাল দুর্ধর্ষ হয়ে উঠছে। এরা ক্যাপচা সলভ করতে পারে এমন ইন্টিলিজেন্ট বট প্রোগ্রাম তৈরি করছে। যদিও হানিবট, পিকচার আইডেন্টিফিক্যাশন, নো ক্যাপচা রিক্যাপচা, ইনভিজিবল ক্যাপচা, সুইট ক্যাপচা খুবই নিরাপদ এবং উন্নত ক্যাপচা। এসব বিরক্তিকর ক্যাপচাই বটকে আটকিয়ে আপনার ওয়েবসাইটকে নিরাপদ রাখে।

তাহলে মশাই, আজকের পর আশা করি আর বিরক্তি থাকবে না আপনার। হাসিমুখে ক্যাপচাগুলো পূরণ করবেন আর এর উপকারের কথা ভাববেন।

হ্যাপি ব্রাউজিং!
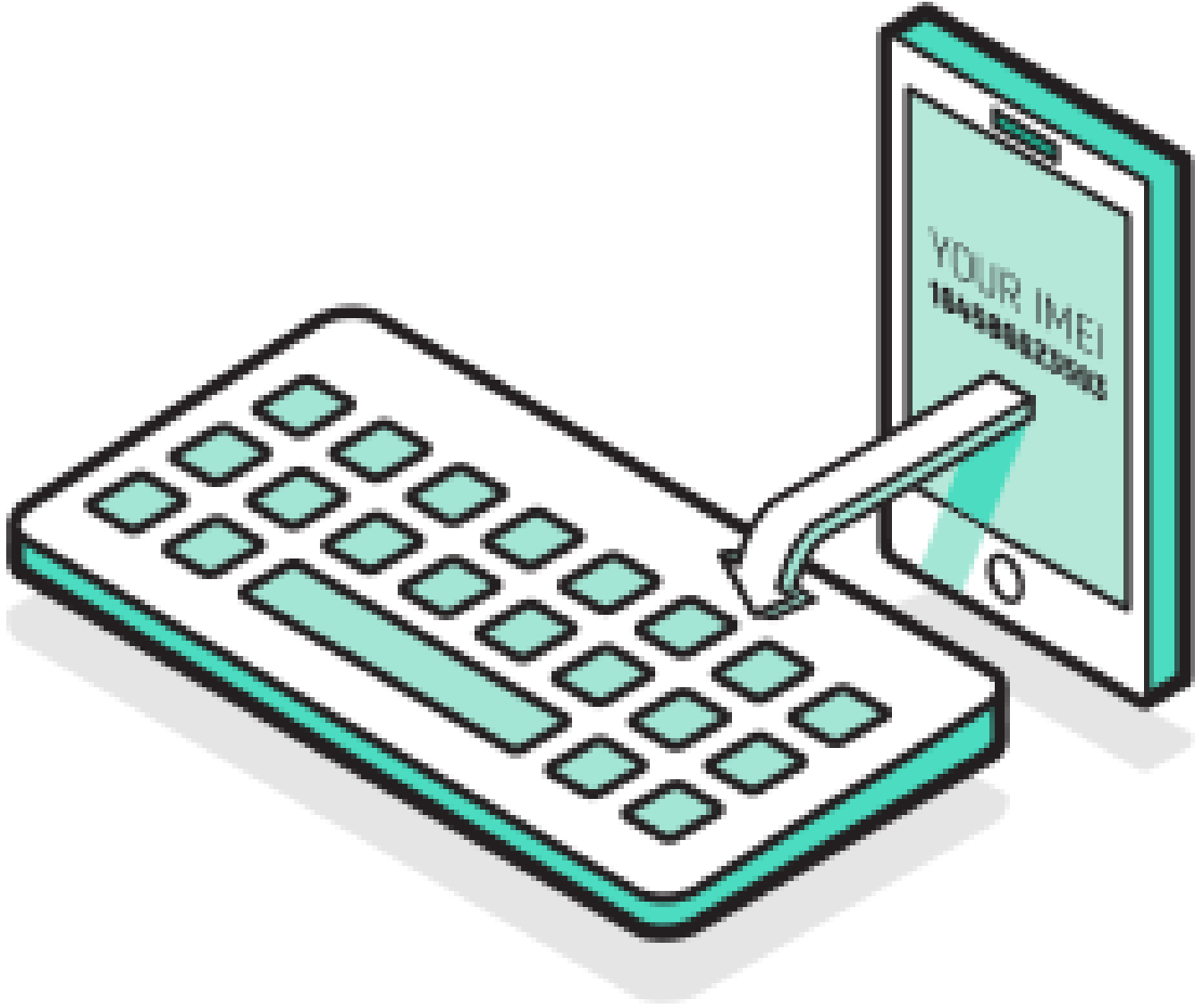
IMEI নম্বর কী এবং কেন?

রওনক শাহরিয়ার

দেশের অবৈধ মোবাইল অচল হবে–এমন প্রস্তাবনা আসার পর থেকে IMEI নম্বরের কথা কমবেশি সবাই শুনে থাকবেন। এপ্রিলের মধ্যে সেলুলার নেটওয়ার্ক থেকে অনিবন্ধিত সকল মোবাইল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। শুধু দেশের এবং দেশের বাইরে থেকে আসা BTRC-তে নিবন্ধিত হওয়া ফোনের সংযোগ অব্যাহত থাকবে। সেটা কতটুকু কার্যকর করা হবে সেদিকে না গিয়ে আমরা IMEI নম্বরেরই থাকবো। তো যদি বন্ধ করা হয় তাহলে এই পুরো ব্যাপারটা IMEI নম্বরের ওপর নির্ভর করে হবে। এই IMEI নম্বর এলো কীভাবে এবং এর কাজই বা কী?

মোবাইল ডিভাইস মানুষের মাঝে প্রচলন ঘটার পর একটা প্রশ্ন এলো, কীভাবে মোবাইল ব্যবহারকারীদের শনাক্ত করা যায়। সিম কার্ড দিয়ে তা করা যায় বটে। কিন্তু সিম কার্ড বের করে ফেলা যায় বলে পরবর্তীতে আর তা শনাক্ত করা সম্ভব হয় না। পুলিশ ও বিভিন্ন দেশের সরকারি পর্যায়ের লোকজন এই ইস্যু সমাধানে উদ্যোগ নেন এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যে ডিভাইস নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত থাকবে তার নির্দিষ্ট নম্বর থাকবে এবং এই নম্বর দিয়ে ডিভাইসটি শনাক্ত করা যাবে সিম কার্ড পরিবর্তন করার পরেও।

IMEI নম্বর কী?

IMEI এর পূর্ণরূপ হলো International Mobile Equipment Identity. এটি একটি ইউনিক নম্বর যা শনাক্ত করে GSM, WCDMA এবং iDEN (সহজে ২জি, ৩ জি, ৪জি ব্র্যান্ড) মোবাইল আর স্যাটেলাইট ফোন। বেশিরভাগ সময়ই একটি ডিভাইসের একটি IMEI নম্বর থাকে, তবে ডুয়েল সিমের ডিভাইসগুলোতে থাকে দুটো IMEI নম্বর।

IMEI ব্যবহার শুধু ডিভাইস আইডেন্টিফাই এর জন্য ব্যবহার করা হয়, ব্যবহারকারী সম্পর্কে কোনো প্রকার তথ্য দেয় না। এই নম্বর GSM নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সঠিক ডিভাইস শনাক্তের জন্য এবং এটি দ্বারা চুরি হওয়া ফোন দ্বারা সে দেশের নেটওয়ার্কে অ্যাক্সেস বন্ধ করে দেওয়া যায়। তবে অন্যান্য দেশে ডিভাইসটি কাজ করবে।

নম্বর কীভাবে কাজ করে?

IMEI নম্বর সাধারণত ১৭ ডিজিট বা ১৫ ডিজিটের সংখ্যা হয়। এই কোড ডিক্রিপ্ট করা সহজ, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিশেষ দরকার হয় না। কিন্তু কিছু দেশে IMEI নম্বর চেক করে দেখা যায় নম্বরটি ব্লক বা ব্ল্যাকলিস্টে আছে কি না এবং IMEI নম্বর দিয়ে ফোনের মডেল ও স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে জানা যায়।

নাম্বার ফরমেটের ধরন কিছুটা এমন: AA-BBBBBB-CCCCCC-D বা D এর জায়গায় EE হয়।

A ও B বা প্রথম ৮টি সংখ্যাকে বলা হয় Type Allocation Code বা TAC। এই TAC অংশ থেকে ফোন কোম্পানি এবং ফোনটির মডেল নম্বর সম্পর্কে জানা যায়।

AA বা প্রথম দুই সংখ্যা দিয়ে মূলত কোন GSMA সংস্থা থেকে ডিভাইসটি রেজিস্ট্রার হয়েছে তা বোঝায়। যেমন: প্রথম দুই কোড 86 হলে ডিভাইসটি চীনে রেজিস্ট্রার হয়েছে। তবে এটি কান্ট্রি কোড নয়, বরং সংস্থার কোড।

BBBBBB বা পরের 6টি নম্বর হলো ডিভাইস কোড। অর্থাৎ, কোন ম্যানুফেকচারার এই ফোনটি বানিয়েছে এবং তার মডেল উল্লেখ করা আছে। ধরা যাক, অ্যাপল নতুন একটি ডিভাইসের জন্য আবেদন করল এবং সেই ডিভাইসের জন্য স্পেসিফিক একটি কোড দেওয়া হলো। ধরা যাক, আবেদন করার পর তারা যে কোডটি পেল তা নিচের 949302 বা এটি দিয়ে তাদের নতুন ডিভাইসকে বোঝাবে।

আর CCCCCC বা পরের ছয়টি সংখ্যা হলো সিরিয়াল রেডিয়ো মডিউল নম্বর। একে SNR বলা হয়। এসএনআর একটি পৃথক সিরিয়াল নম্বর যা TAC-এ থাকা ডিভাইসের প্রতিটা স্পেসিফেশন স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করে।

D-এ থাকা নম্বরটি পুরো IMEI নম্বরকে ভেরিফাই করে। আর EE হলো সফটওয়্যার ভার্সন নম্বর যা ডিভাইস ম্যানুফেকচারার ফোনের সফটওয়্যার ভার্সনটি শনাক্ত করতে বরাদ্দ রেখেছে।
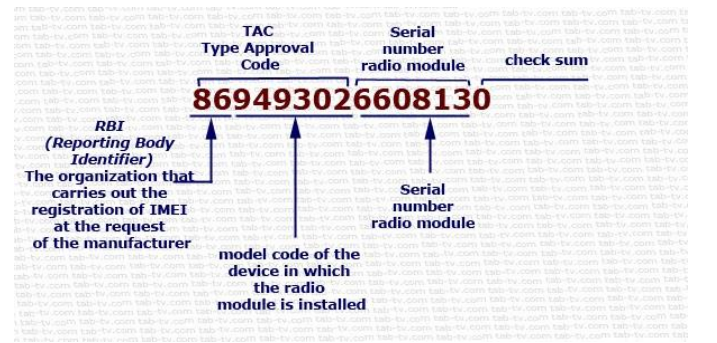
IMEI নম্বর দেখার উপায়:

১. অ্যান্ড্রয়েডে *#06# ডায়াল করলে স্ক্রিনে শো করবে অথবা সেটিংসে গিয়ে এই সিকুয়েন্স ফলো করলেও পেয়ে যাবেন–

About device > Status > IMEI information

২.ফিচার ফোনগুলোতে IMEI নম্বর মূলত ব্যাটারির নিচে লিখা থাকে।

৩.

অ্যাপল ইউজাররা সিম ট্রে বা ব্যাকে IMEI নম্বর পেয়ে যাবে অথবা সেটিংসে গিয়ে নিচের সিকুয়েন্স ফলো করতে পারেন–

Settings > General > About

ফোনের IMEI নম্বরটি আসলে ফোনের কি না তা যাচাই করা দরকার। কারণ অসদুপায়ে এটি পরিবর্তন করা যায়। এক্ষেত্রে অ্যান্ড্রয়েড হলে IMEI নম্বরটি এই সাইটে চেক করবেন।

এবং তথ্য যদি ডিভাইসের সাথে মিল থাকে তবে IMEI নম্বরটি আসল।

আইফোন ইউজার হলে এখানে চেক করতে পারেন।

আর আপনার ফোনটি বাংলাদেশে নিবন্ধন আছে কি না তা বোঝার উপায়:

ম্যাসেজ অপশনে গিয়ে KYD লিখে স্পেস দিয়ে IMEI নম্বরটি লিখবেন এবং 16002 নম্বরে পাঠিয়ে দিবেন। ফিরতি ম্যাসেজ এ রেজিস্টার্ড বা আনরেজিস্টার্ড তা জানা যাবে। আনরেজিস্টার্ড হলে বিটিআরসির পরবর্তী নির্দেশনার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

ফোন হারালে যেভাবে কাজ করে:

যদি ফোন হারিয়ে যায় তবে পুলিশ ফোনের লোকেশন ট্রেস করতে পারে যদি ফোনে কোনো সিম থাকে তবে। এক্ষেত্রে IMEI নম্বরটা স্থানীয় স্টেশনের কাছে পাঠানো হয় এবং সহজে ডিভাইস শনাক্ত করা যায়। আর একটা জিডি করে সিম কোম্পানিতে দেখালে তারা IMEI নম্বর দেশ থেকে অফ করে রাখবে বা কোনো সিম ডিভাইসে চলবে না।

ফোনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি খুব একটা কার্যকর না, কারণ এখানে লোকেশন বের করা ও ট্রেস করা কঠিন।

অ্যান্ড্রয়েড ফোনের ক্ষেত্রে সহজে লোকেশন বের করা সম্ভব।

যদি অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ডেটা কানেকশন থাকে তবে https://www.google.com/android/find সাইটে গিয়ে লগইন করে এক ক্লিকেই লোকেশন দেখা যাবে।

যদি এতে সম্ভব না হয় তবে সাইটে ফোন লক অপশন সিলেক্ট করা বেটার। আর একেবারে হারানোর ভয় থাকলে Erase all data অপশনে গিয়ে ফোনের সকল ডেটা ইরেজ করা যাবে।

আর ঘরের আশেপাশে হলে সাইটে রিং অপশন আছে, যা সাইলেন্ট করা থাকলেও উচ্চ ভলিউমে বেজে উঠবে।

আর আইফোন ডিভাইস হলে iCloud এ সেম অপশন পেয়ে যাবেন।

এবং যদি কোনো সময় IMEI নম্বর মনে না থাকে, তবে গুগল একাউন্টে লগ ইন ইনফেকশন দেখা যায় যেখানে ডিভাইসের IMEI নম্বরও থাকে।

Hyperbolic Multilateration Positioning
১৫১
Cell Phone
Listening
Post 3
Driver's
Cell
Phone
Cell Phone
Listening
Post 2
Cell Phone
Listening
Post 1
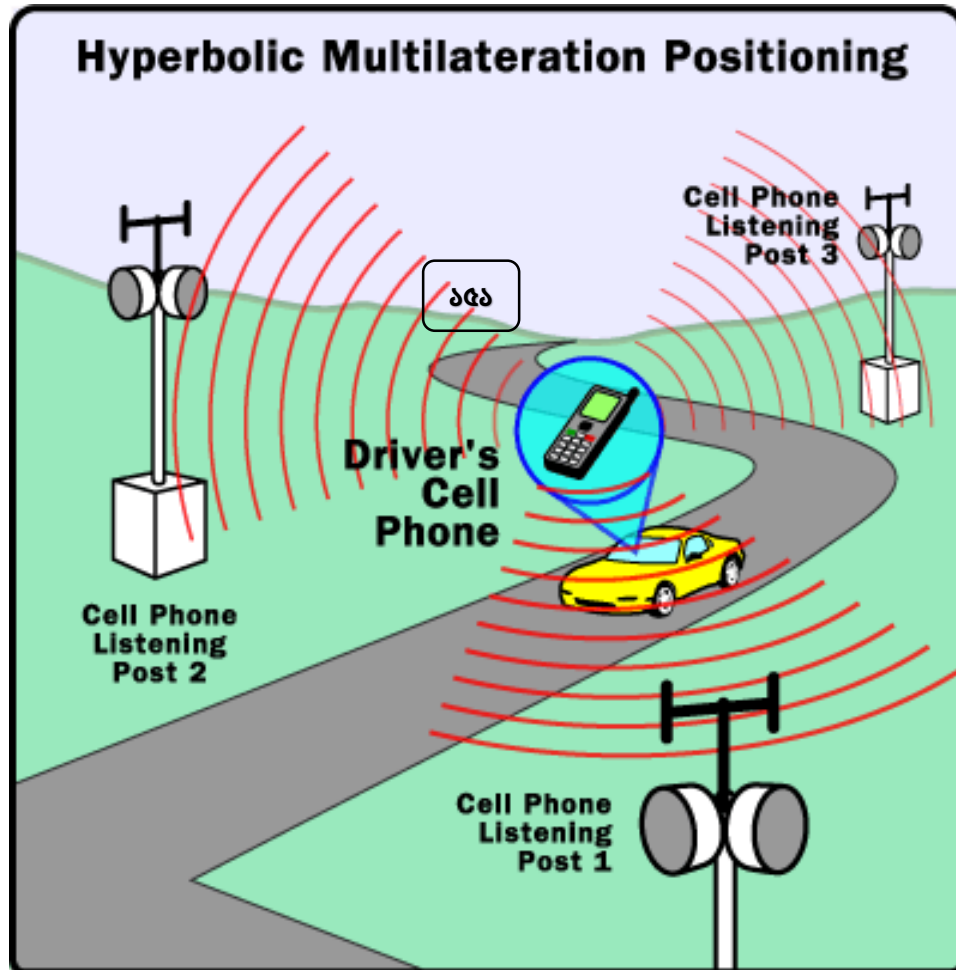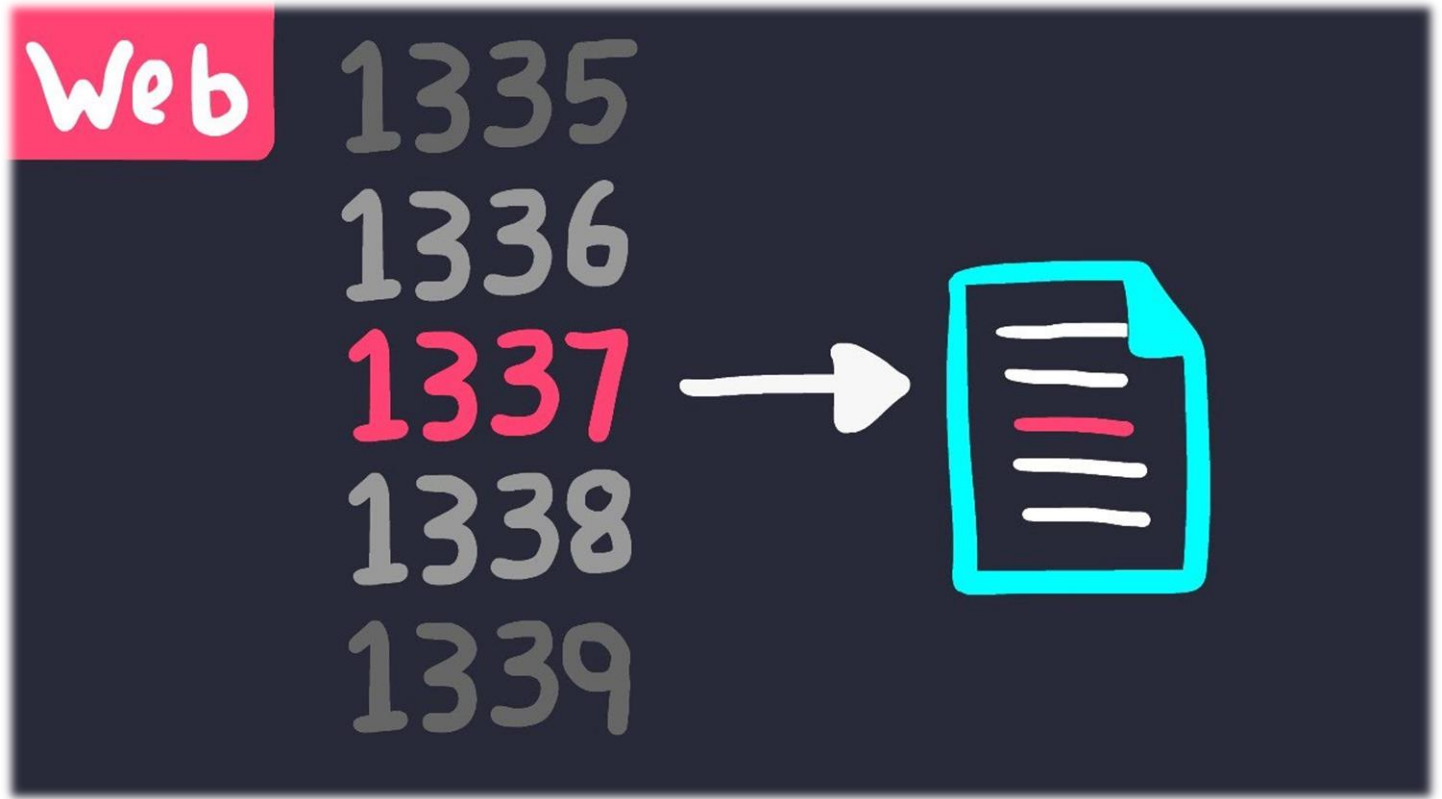
আইডর বাগ কী?

সাইফুল ইসলাম

ইন্টারনেট সিকিউরিটি, প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ দুর্বলতা নিয়ে কথা বলা যাক।

আইডর কী?

Insecure Direct Object References-কে সংক্ষেপে IDOR বা আইডর বলা হয়। একজন ইউজার যখন তাদের তথ্য ইনপুট করে, তখন তা একটি লিস্ট আকারে থাকে। যেমন:

১. সৈকতের তথ্য
২. মেহেরের তথ্য
৩. আহসান হাসিবের তথ্য
৪. কোনো এক কানাডা প্রবাসী এক্সাম্পল নাম আরোহীর তথ্য ইত্যাদি।

তো এখানে প্রত্যেকের তথ্য এক-একটা লিস্ট আকারে সেইভ হচ্ছে। যখন কোনো হ্যাকার তার নিজ লিস্ট নাম্বার পরিবর্তন করে অন্যের লিস্ট নাম্বার দিয়ে অন্যের তথ্য দেখতে পারে বা কিছু পরিবর্তন করতে পারে, তখন সেটাই হলো আইডর।

উদাহরণ: ধরুন, লিস্ট ১-এর সৈকতের তথ্য। সে নোয়াখালীতে কোনো এক স্কুলে পড়ে, এখন সে যদি তার লিস্ট ১ পরিবর্তন করে লিস্ট ২ এর তথ্য অর্থাৎ মেহেরের তথ্য ডেমরা থেকে ধানমন্ডিতে পরিবর্তন করে শুধু নাম্বার পরিবর্তন করে তাহলে সেটি হবে আইডর।

আবার, আরেকটা উদাহরণ দিই। ধরুন, হাসিবের বান্ধবী কানাডা প্রবাসী আরোহী। আরোহী এমন একটা পোস্ট করল ফেইসবুকে যা হাসিবের ভালো লাগেনি। এখন সে নিজে একটা টেম্প পোস্ট দিলো। তখন সেই পোস্টের একটা লিস্ট নাম্বার হবে। যখন হাসিব সেই পোস্ট ডিলিট করতে যাবে, তখন সে তার পোস্টের জন্য রিকুয়েস্ট করে আরোহীর পোস্টের লিস্ট নাম্বার দেয়। তাহলে দেখা যাবে হাসিব আরোহীর অ্যাকাউন্টে লগ ইন না করেই আরোহীর পোস্ট ডিলিট করে ফেলল শুধু লিস্ট নাম্বার পরিবর্তন করে। আর এটিই হলো আইডর বাগ।

ব্লাইন্ড আইডর

ব্লাইন্ড অর্থ অন্ধ। অর্থাৎ অন্ধ আইডর। এখন মনে প্রশ্ন জাগতে পারে – ব্লাইন্ড আইডর বা অন্ধ আইডর কী? তাই তো? আমি বলছি অন্ধ আইডর আসলে কী। প্রথমত, বলতে চাচ্ছি আইডর বাগ সবসময় একটা লিস্ট নাম্বার দিয়েই হবে। সেটা হতে পারে পোস্ট আইডি, হতে পারে ইউজার আইডি ইত্যাদি যে-কোনো কিছু হতে পারে। তবে সবসময় লিস্ট গণিতের নাম্বারের মতো থাকবে না, কিছু কিছু সময় এনক্রিপ্টেড কোডের মতো-ও থাকতে পারে। যা-হোক, যে টপিকে ছিলাম। মাঝে মাঝে কিছু সাইটে সরাসরি লিস্ট নাম্বার বা ইউজার আইডি ইত্যাদি দেখা যায় না, কিন্তু তাদের প্রত্যেকের একটা আইডি নাম্বার আছে। তখন কী করবেন? সরাসরি আইডি নাম্বার না থাকলে তখন আপনি অন্ধভাবে কাজ করছেন। কারণ এখানে আপনার লাইট হচ্ছে আইডি নাম্বার, যা আপনি পাচ্ছেন না। তখন আপনি সাইটে কিছু ইনপুট করে রিকুয়েস্ট ক্যাপচার করবেন। তখন সেখানে আইডি নাম্বার দেখা যাবে, কিংবা সেখানেও না দেখা গেলে আপনি রিকুয়েস্টের রেসপন্স দেখবেন। সেখানে আপনি আইডি নাম্বার পেয়ে গেলেন, পেয়ে গেলেন আপনার লাইটও (আইডি নাম্বার)। এরপর আপনি সেই আইডি নাম্বারের সূত্র ধরে বাগ ট্রাই করবেন। এখন, যদি প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ দুর্বলতা থাকে তাহলে তা হয়ে আপনাকে দেখাবে যে আপনি সাকসেস। এবার আসুন আপনাদের কিছু লাইভ দেখাই।

ধরুন, আপনি site.com সাইটে একটা আইডি খুললেন। সেখানে আপনি যখন আপনার নাম বা তথ্য পরিবর্তন করতে যাবেন তখন সেখানকার লিঙ্কটা https://www.site.com/edit/1234 এরকম থাকতে পারে।

এখানে ১২৩৪ হচ্ছে আপনার ইউজার আইডি। এখন আপনি রিকুয়েস্ট ক্যাপচার করবেন বার্প সুইট নামক একটি টুলে। তখন দেখবেন আপনি এই রকম একটা রিকুয়েস্ট পেয়েছেন: (user: 1234), (name: linux)

এখন আপনি চাচ্ছেন আপনি আপনার অন্য অ্যাকাউন্টের তথ্য পরিবর্তন করতে সেই অ্যাকাউন্টে লগ ইন না করেই। তাহলে রিকুয়েস্ট থেকে শুধু আপনার অন্য অ্যাকাউন্টের ইউজার আইডি দিবেন। তাহলেই দেখবেন আপনি সেই অ্যাকাউন্টে লগ ইন না করেই সেখানকার তথ্য পরিবর্তন করতে পারছেন। আর এটিই হলো আইডর।
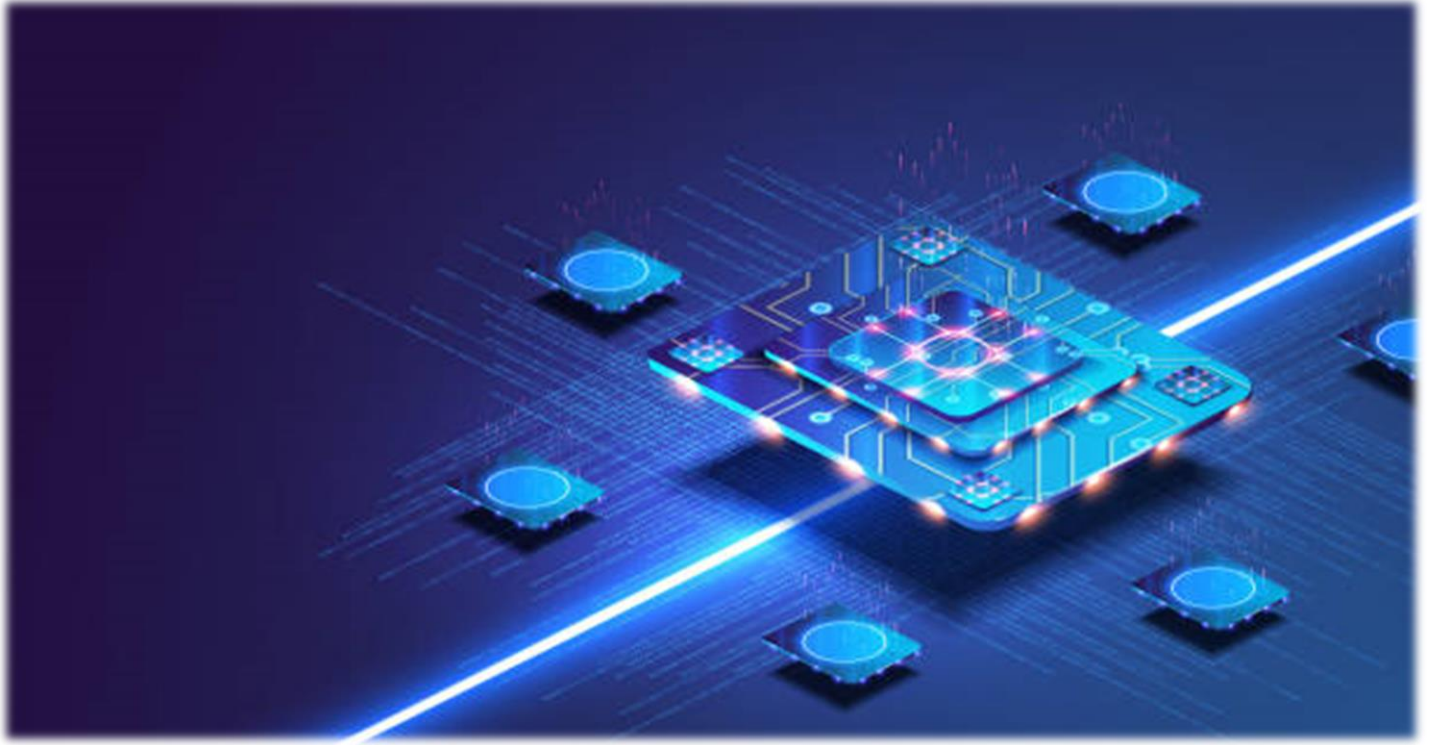
কোয়ান্টাম কম্পিউটার

সাব্বির হাসান মুন্না

গুগল একটা বিশাল কাজ করে ফেলেছে! ওরা তো জায়ান্ট গুগল, ওরাই তো করবে। ওরা নাকি কোয়ান্টাম সুপ্রিমেসি (উচ্চারণ করাই কষ্ট, Quantum Supremacy) না কী একটা অর্জন করছে। বিশাল ব্রেকথ্রু। যাহোক, ভাবছিলাম Quantum Supremacy নিয়ে ছোটো মাথায় যা ঢুকছে তাই লিখব। তারপর ভাবলাম আগে কোয়ান্টাম কম্পিউটারটাই একটু বুঝা যাক।

যাহোক, আপনি যে যন্ত্রটা দিয়ে ফেসবুকে আমার এই লেখাটা দেখছেন ওটা ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার। আর ওই টাইটান আর তিয়েনহাও ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার। আপনার ফোন বা পিসিটা আর টাইটান সুপারকম্পিউটারটা একই সিস্টেমে কাজ করে। শূন্য আর এক (0 1) বাইনারি–এটা তো সবাই জানেন। এই শূন্য আর এক, এদের বলে বিট(BIT)। এর মাধ্যমেই ১+১ = ২ থেকে বিটকয়েন পর্যন্ত হয়। এখন কথা হচ্ছে, তাহলে কোয়ান্টাম কম্পিউটার কীভাবে কাজ করে!? কোয়ান্টাম কম্পিউটারে এরকম বিট আছে তবে সেগুলোকে বলে কিউবিট (QUBIT)।
এবার দেখা যাক এই কিউবিটগুলো কেমন।

কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার দুটি সেই মাপের কঠিন জিনিস হলো সুপারপজিশন (Superposition) আর এন্ট্যাংগেলমেন্ট (Entanglement)। এখন এই কিউবিট এর একটা ধর্ম হলো এটি সুপারপজিশনে থাকে। কেমন? নরমালি বিট হয় 0 অথবা 1, কিন্তু কিউবিট 0 ও হতে পারে আবার 1 ও হতে পারে। সব থেকে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো এটি জিরো বা ওয়ান এর মাঝামাঝি থাকতে পারে। মানে ৩০% জিরো আর ৭০% ওয়ান হতে পারে।
আর এন্ট্যাংগলমেন্ট (বিস্তারিত নাইম ভাই) দুই বিট কতভাবে সাজানো যায়?
0,1 আর 1,0
কিন্তু কিউবিট যেহেতু একাই একশ মানে, একাই দুই ভ্যালু ধারণ করে সেজন্য দুই কিউবিট এভাবে সাজানো যায়:
1,1
1,0
0,1
0,0
অর্থাৎ দুই কিউবিট একই সাথে এই সবগুলো কম্বিনেশন (কম্বিনেশন বুঝলে বুঝপাতা, না বুঝলে তেজপাতা)

যাহোক এবার আপনি হিসেব করেন ৩ কিউবিট হলে কতভাবে সাজানো যায়!
এ হিসাবটা এক্সপোনেনশিয়ালি বাড়ে।

কোয়ান্টাম কম্পিউটার আপাতত/মূলত দুই প্রকার:
১. ইউনিভার্সাল কোয়ান্টাম কম্পিউটার:
গেট মডেল (Gate Model)
ক. সুপারকন্ডাক্টিং কিউবিট (Superconducting Qubit)
i. Google (72 Qubits)
ii. IBM (50 Qubits)
iii. Rigetti (8 Qubits)
খ. টপোলজিক্যাল কিউবিট (Topological Qubit)
i. Microsoft
ii. Intel (2 Qubits)
২. Not-Universal কোয়ান্টাম কম্পিউটার :
ক. Quantum Annealing
i. D-wave (2048 Qubits) এরা তো বস!
ii. Google (2 Qubits)
খ. Ion Trap
i. MIT (51 Qubits)
ii. Harvard
iii. University Of Maryland (53 Qubits)

ইউনিভার্সাল কোয়ান্টাম কম্পিউটার মূলত সাধারণ সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য উন্নত করা হচ্ছে। আর অন্য ক্যাটাগরিরগুলো কোয়ান্টম মেকানিকস এর সমস্যার জন্য।
.
এই কোয়ান্টাম কম্পিউটার যদি ঠিকঠাক কাজ করে তাহলে ব্লকচেইন এর কপালে দুঃখ আছে। অর্থাৎ ক্রিপ্টোকারেন্সি, যেমন: বিটকয়েন, এগুলোর নিরাপত্তা থাকবে না। আর এর নিরাপত্তা থাকবে না মানে কোনো কিছুরই নিরাপত্তা নেই। (3Blue1Brown এর SHA265 এনক্রিপশন ব্রেকিং এর ভিডিওটা দেখেন সময় থাকলে)

আর সিমুলেশন দেওয়া হবে পানির মতো সহজ।

এখন সমস্যা হচ্ছে কোয়ান্টাম কম্পিউটার সিমুলেশনের জন্য ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। ৫৪ কিউবিট সিমুলেশন দেওয়ার জন্যই পৃথিবীর সব থেকে বড়ো সুপার কম্পিউটার দরকার। (আমি বলি নাই, ইন্টেল বলছে)
আর ২৬০ কিউবিট সিমুলেশনের জন্য ক্লাসিক্যাল কম্পিউটারের কত বিট লাগবে জানেন? মহাবিশ্বে যে পরিমাণ পরমাণু আছে!
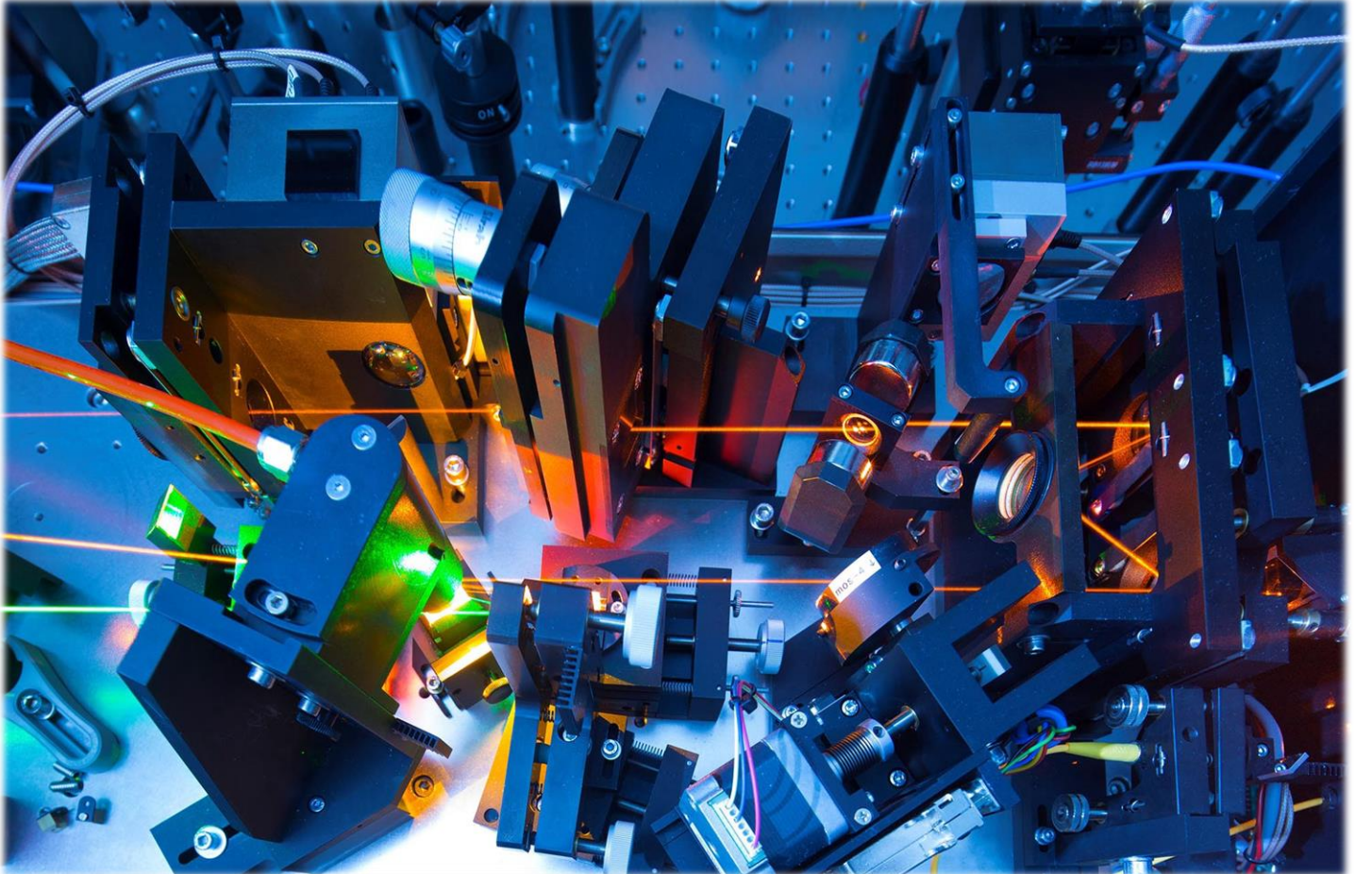
তথ্যসূত্র

হস্তচালিত নলকূপ

১. ডায়রিয়া ও বিভিন্ন পানিবাহিত রোগে বিশ্বব্যাপী আক্রান্ত ও মৃতের সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান। বিশ্বব্যাপী বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তি, পাবলিক হেলথ ও পানি প্রাপ্তির সম্পর্ক ইত্যাদি। https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
June, 2019

২. বাংলাদেশে কলেরা নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ ও সামগ্রিক অবস্থার মূল্যায়ণ।
https://academic.oup.com/jid/article/218/suppl_3/S171/5085578
August, 2018

৩. প্যাসকেলের সূত্র : একটা আবদ্ধ পাত্রে তরল বা বায়বীয় পদার্থে বাইরে থেকে চাপ দেওয়া হলে, সেই চাপ সমানভাবে সঞ্চালিত হয়ে পাত্রের সংলগ্ন গায়ে সব দিকে সমানভাবে লম্বভাবে কাজ করে।

মেমোরি কার্ড বা এসডি কার্ড

https://en.m.wikipedia.org/wiki/SD_card
https://spectrum.ieee.org/semiconductors/memory/flash-memory-survives-100-million-cycles
https://www.sdcard.org/developers/index.html
https://www.ntfs.com/fat_systems.htm
https://www.explainthatstuff.com/flashmemory.html
এবং ইউটিউব

ওয়াই-ফাই: একবিংশ শতাব্দীর সেরা ইন্টারনেট অ্যাক্সেস গেটওয়ে

https://www.statista.com/statistics/802706/world-wlan-connected-device/
https://www.digitaltrends.com/computing/what-is-wi-fi-6/
https://en.avm.de/guide/everything-about-wifi/
https://www.digitaltrends.com/computing/what-is-wi-fi/
https://computer.howstuffworks.com/wireless-network.htm
https://www.digitaltrends.com/computing/wi-fi-6-tested-how-much-faster-is-it/

ব্রাউজার কুকি কী এবং কেন?

১. https://tools.ietf.org/html/rfc৬২৬৫
২. https://webcookies.org/faq/#Directive
৩.https://www.theverge.com/২০২০/৩/২৪/২১১৯২৮৩০/apple-safari-intelligent-tracking-privacy-full-third-party-cookie-blocking
৪.https://venturebeat.com/২০২০/০৫/১৯/google-chrome-83/

২.৪ গিগাহার্টজ এবং ৫ গিগাহার্টজ ওয়াই-ফাই

https://www.centurylink.com/home/help/internet/wireless/which-frequency-should-you-use.html
https://www.tanaza.com/blog/5ghz-vs-2-4ghz/

https://www.extremetech.com/computing/179344-how-to-boost-your-wifi-speed-by-choosing-the-right-channel
https://www.ekahau.com/blog/channel-planning-best-practices-for-better-wi-fi/#:~:text=The%202.4GHz%20band%20is,20%20MHz-160%20MHz
https://youtu.be/hM8gZzSDKrw
https://youtu.be/mGwQ2RrAUmA

মোবাইলে থাকা সেন্সর

https://source.android.com/devices/sensors/sensor-types#step_detector
https://medium.com/jay-tillu/mobile-sensors-the-components-that-make-our-smartphones-smarter-4174a7a2bfc3
https://m.gsmarena.com/glossary.php3?term=sensors
https://gizmodo.com/all-the-sensors-in-your-smartphone-and-how-they-work-1797121002/amp

আইপি অ্যাড্রেস: ওয়েব-জগতের ঠিকানা

১. https://tools.ietf.org/html/rfc৭৬০
২. https://www.apnic.net/
৩. https://tools.ietf.org/html/rfc791
৪. https://tools.ietf.org/html/rfc৮২০০
৫.https://www.socallinuxexpo.org/sites/default/files/presentations/Why%২০IP%২০Versions%২০and%২০Why%২০do%20I%20care.pdf
৬. https://tools.ietf.org/html/rfc৪৯৯৩
৭. https://archive.org/details/htmlgeolocation00iiia_202

VoIP কী এবং কেন?

https://www.dummies.com/education/internet-basics/understanding-what-voip-means/
https://www.fcc.gov/general/voice-over-internet-protocol-voip#:~:text=Voice%20over%20Internet%20Protocol%20(VoIP)%2C%20is%20a%20technology%20that,(or%20analog)%20phone%20line.
https://www.nextiva.com/blog/what-is-voip.html
https://computer.howstuffworks.com/ip-telephony.htm

দ্যা মিস্টিরিয়াস মেইল

https://rb.gy/xw5bdk
https://rb.gy/4sh5c4
https://rb.gy/4xpuif

বারকোড কী এবং কেন?

https://www.explainthatstuff.com/how-data-matrix-codes-work.html
https://www.qr-code-generator.com/qr-code-marketing/qr-codes-basics/
https://youtu.be/qYvqFV4Rf8c

https://youtu.be/e6aR1k-ympo
https://www.lightspeedhq.com/blog/how-do-barcodes-work/amp/
https://www.google.com/amp/s/m.jagranjosh.com/general-knowledge/amp/what-is-barcode-and-how-is-it-made-1522059273-1
https://www.explainthatstuff.com/barcodescanners.html#:~:text=Light%20reflects%20back%20off%20barcode,the%20black%20and%20white%20stripes.
https://www.scandit.com/blog/types-barcodes-choosing-right-barcode/#:~:text=One%2Ddimensional%20(or%201D),referred%20to%20as%20linear%20barcodes

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

Book Artificial Intelligence : A modern Approach.
link: https://www.pdfdrive.com/a-modern-approach-e34763688.html
2. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence
3. https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/06/19/7-types-of-artificial-intelligence/
Example of Ai
https://builtin.com/artificial-intelligence/examples-ai-in-industry
https://www.datamation.com/artificial-intelligence/examples-of-artificial-intelligence.html

MAC Address কী এবং কেন?

https://www.geeksforgeeks.org/introduction-of-mac-address-in-computer-network/amp/
https://whatismyipaddress.com/mac-address
https://www.computernetworkingnotes.com/ccna-study-guide/mac-addresses-explained-with-examples.html

ফান্ডামেন্টাল অফ কোডিং অ্যান্ড প্রোগ্রামিং

১. গুগল ডিজিটাল গ্যারেজ (https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage)
২.Techterms (https://www.google.com/amp/s/techterms.com/amp/definition/high-level_language)
৩. ComputerHope (https://www.computerhope.com/jargon/l/lowlangu.htm)
8.CodeMentor (https://www.codementor.io/@edwardbailey/coding-vs-programming-what-s-the-difference-yr0aeug9o)
৫.Devskiller (https://devskiller.com/how-many-programming-languages/)

ডিলিটিং কীভাবে কাজ করে?

১। https://en.m.wikipedia.org/wiki/Not_safe_for_work
২। https://en.m.wikipedia.org/wiki/Seven_Wonders_of_the_Ancient_World
৩। https://en.m.wikipedia.org/wiki/Censorship_of_images_in_the_Soviet_Union
8। https://books.google.com/ngrams
৫। https://en.m.wikipedia.org/wiki/Agbogbloshie
*বিশেষ অবদান :

https://youtu.be/G5s4-Kak49o
আরও দেখুন :
https://www.reddit.com/r/YouShouldKnow/comments/1e4p7g/ysk_how_deletion_works_on_a_computer_and_why/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Data_erasure
http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_sector
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Data_remanence

কারদাশেভ স্কেল এবং আমাদের ভবিষ্যৎ
https://en.wikipedia.org/wiki/Kardashev_scale
https://futurism.com/the-kardashev-scale-type-i-ii-iii-iv-v-civilization
https://en.wikipedia.org/wiki/Dyson_sphere
https://en.wikipedia.org/wiki/Matrioshka_brain

পিজোইলেকট্রিক গ্যাস স্টোভ লাইটার
১.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Piezoelectricity#:~:text=Piezoelectricity%20is%20the%20electric%20charge,from%20pressure%20and%20latent%20heat
২. https://www.engineersgarage.com/insight/insight-how-piezoelectric-gas-lighter-igniter-works/
৩. https://www.explainthatstuff.com/piezoelectricity.html
৪. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gas_lighter
৫. https://youtu.be/wcJXA8IqYl8

ব্লুটুথ
http://large.stanford.edu/courses/2012/ph250/roth1/
https://anusoron.blogspot.com/2019/03/blog-post.html?m=1
https://learn.sparkfun.com/tutorials/bluetooth-basics/all
https://www.androidauthority.com/bluetooth-5-gary-explains-703734/
https://www.explainthatstuff.com/howbluetoothworks.html
https://electronics.howstuffworks.com/bluetooth.htm
https://www.lifewire.com/what-is-bluetooth-2377412
https://www.google.com/amp/s/www.maketecheasier.com/uses-of-bluetooth/%3famp

ERROR!
(1) https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status
(2) https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes
(3) https://kinsta.com/blog/http-status-codes/
(4) https://httpstatuses.com

নাইট ভিশন চশমা

1.https://en.wikipedia.org/wiki/Night_vision
2.https://edition.cnn.com/2017/06/05/health/colorscope-green-environment-calm/index.html#:~:text=We%20see%20green%20with%20ease,waves%20of%20light%20into%20color.&text=The%20retina%20in%20a%20human,known%20as%20the%20visible%20spectrum.
3.https://northernwoodlands.org/outside_story/article/night-vision-how-animals-see#:~:text=Many%20nocturnal%20animals%20have%20a,second%20chance%20to%20sense%20it.
4.https://www.smithsonianmag.com/innovation/seeing-dark-history-night-vision-180963357/

এলডিআর (LDR) সেন্সর

1. Light Sensor including Photocell and LDR Sensor
https://www.electronics-tutorials.ws/io/io_4.html
2.Simple LDR Circuit to Detect Light - Circuit Digest
https://circuitdigest.com/electronic-circuits/light-detector-ldr-circuit
3.How to Make an LDR (light-dependent Resistor) Circuit ...
https://www.instructables.com/How-To-Make-An-LDR-light-dependent-resistor-Circui/

SSD কী এবং কেন?

1.https://youtu.be/bfGQiTtCVT8
2.http://www.qdpma.com/Storage/SSD.html
3.https://computer.howstuffworks.com/solid-state-drive.htm#:~:text=Known%20as%20a%20solid-state,comes%20with%20chips%2C%20of%20course.&text=The%20chips%20used%20in%20a,located%20on%20the%20motherboard%2C%20either.
4.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive
5.https://www.extremetech.com/extreme/210492-extremetech-explains-how-do-ssds-work
6.https://www.google.com/amp/s/www.businessinsider.com/what-is-ssd%3famp
7.https://www.digitaltrends.com/computing/what-is-an-ssd/?amp

কোয়ান্টাম কম্পিউটিং: প্রযুক্তি খাতে নতুন জায়ান্ট

১.আইবিএম (https://www.ibm.com/quantum-computing/what-is-quantum-computing/)
২. সাইন্স এলার্ট (https://www.google.com/amp/s/www.sciencealert.com/quantum-computers/amp)
৩.ন্যাচার সাময়িকী (https://www.nature.com/articles/d41586-020-03237-w)
8. এনালিটিক্স ইনসাইট (https://www.analyticsinsight.net/top-10-countries-leading-quantum-computing-technology/)
৫.গুগল রিসার্চ (https://research.google/teams/applied-science/quantum/)
৬.লাইভসাইন্স(https://www.google.com/amp/s/www.livescience.com/amp/google-hits-quantum-supremacy.html)
ছবি: গুগলের কোয়ান্টাম কম্পিউটার 'সিকোমা'

ডায়োড

https://youtube.com/playlist?list=PLxSt9YDBipm6B2e0qlu_2mEvTu-7NuTCb

আসছে নতুন ইন্টারনেট

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9138303/REUTERS-NEXT-Father-Web-Tim-Berners-Lee-prepares-over.html
https://inrupt.com/
https://techcrunch.com/2020/11/08/tim-berners-lees-startup-inrupt-releases-solid-privacy-platform-for-enterprises/

মিয়াও! বিড়াল ও রসায়ন

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1398-9995.2005.00895.x
https://aacijournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13223-018-0239-8
https://pediatrics.aappublications.org/content/116/Supplement_2/542.1
https://www.jimmunol.org/content/early/2013/07/21/jimmunol.1300284.abstract?sid=9a723f52-94fe-4cac-8ab3-a958b5e3ede1
https://europepmc.org/article/med/25329784
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ffj.3216
https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-017-0987-6

হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hard_disk_drive
https://www.explainthatstuff.com/harddrive.html
https://computer.howstuffworks.com/hard-disk.htm
youtube.com
https://searchstorage.techtarget.com/definition/hard-disk?amp=1
https://searchstorage.techtarget.com/definition/hard-disk?amp=1

বুলবুল আর সেরিনার বাচ্চা কী উড়ন্ত মাছ হবে?

1. CF in wikipedia- https://en.wikipedia.org/wiki/Cystic_fibrosis
2. CF এর যত সমস্যা- https://www.cysticfibrosis.org.uk/what-is-cystic-fibrosis/how-does-cystic-fibrosis-affect-the-body
3. CRISPR-Cpf1 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6507119/
4. সত্যি সত্যি জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার করা বাচ্চা-
https://en.wikipedia.org/wiki/He_Jiankui_affair#Experiment_and_birth
5. মানুষের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর সম্ভাব্য খারাপ দিক- https://ghr.nlm.nih.gov/primer/therapy/ethics

ফিঙ্গারপ্রিন্ট কী এবং কেন?

ইতিহাসের অংশটুকু রাগিব হাসানের লেখার সারসংক্ষেপ—
.https://m.facebook.com/groups/bcb.science/permalink/3027633130653669/

https://www.bayometric.com/3-fundamental-principles-fingerprints/

https://www.bayometric.com/minutiae-based-extraction-fingerprint-recognition/#:~:text=Minutiae%20points%20are%20the%20major,uniqueness%20of%20a%20fingerprint%20image.&text=on%20the%20sensor.-,Minutiae%20points%20are%20the%20major%20features%20of%20a%20fingerprint%20image,in%20the%20matching%20of%20fingerprints.
https://computer.howstuffworks.com/fingerprint-scanner.htm#pt4
https://www.google.com/amp/s/www.androidauthority.com/how-fingerprint-scanners-work-670934/amp/
https://www.explainthatstuff.com/fingerprintscanners.html
https://www.arrow.com/en/research-and-events/articles/how-fingerprint-sensors-work
http://www.bioelectronix.com/what_is_biometrics.html
https://youtu.be/2W9LIcHzq-w

বিরক্তিকর "আমি রোবট নই"

https://www.pandasecurity.com/en/mediacenter/panda-security/what-is-captcha/
https://en.wikipedia.org/wiki/CAPTCHA
https://dynomapper.com/blog/514-online-captcha-solving-services-and-available-captcha-types

IMEI নম্বর কী এবং কেন?

GSMA এবং IMEI সম্পর্কে বিস্তারিত:
https://tools.ietf.org/html/rfc7254#section-4.2.2
https://en.tab-tv.com/?p=18840

https://www.androidauthority.com/what-is-imei-923061/amp/

https://www.ittefaq.com.bd/national/199337/%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%A7-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2-%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8

https://www.imei.info/faq-what-is-IMEI/

https://youtu.be/PnnfhuHr6Lg

https://en.m.wikipedia.org/wiki/International_Mobile_Equipment_Identity

https://m.jagranjosh.com/general-knowledge/amp/what-is-imei-number-and-how-does-it-work-1498712022-1

কোয়ান্টাম কম্পিউটার

১. ডোমেইন অফ সায়েন্স

২. ড. টালিয়া গ্রেসন (আমার ক্রাশ, উনি IBM এর Strategic Director and Head of Q Research maybe